মরিয়ম

৭, ওয়েস্ট রো :: কলিকাতা-১৭

বাঙালী-অবাঙালী মিলনের প্রতীক

কবি পারভেজ শাহেদীকে

ন, ও রকম খারাপ

লেখকের অন্যান্য বই

বিদীর্ণ (কাব্যগ্রন্থ)
বাঁদী (উপন্যাস)
ইলা মিত্র (কাব্যগ্রন্থ)
একসঙ্গে (রম্যরচনা)

রেল কোয়ার্টারে আশ্বিনের সোনালী রোদে ভেজা চুল মেলে দিয়ে মরিয়ম সদ্য ঘুমন্ত ছেলের দোলনার দড়িটা মৃদু টান লাগাচ্ছিল মাঝে মাঝে, আশঙ্কা হচ্ছিল দোলা থামলেই বুঝি ছেলে জেগে ওঠে।

আনিস ধপ করে বারান্দায় রেশনের ধামাটা নামিয়ে রেখে বলল, নাও, অতিকষ্টে এইটুকু পাওয়া গেল। তেল নেই, ডাল উধাও! একটা হেস্তনেস্ত না করলে হবে না।

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মরিয়ম বলল, খুব হয়েছে! যাও এবার গোসল করে এস। ভাত হয়ে গেছে।

এত সকালে ভাত খাব না। আমাকে একটু চা ক'রে দাও না।

মিনতির সুরে গৃহিনীর মন গলল না, আবার চা? দশটার ট্রেন সেই কখন চলে গেছে! যাও, গোসল ক'রে এস বলছি।

বেশ, আমি বাইরে থেকে খেয়ে আসি তবে। ড্রাইভার লোক, ট্রেণ চালাতে পারি, কিন্তু বৌকে নড়াতে পারি নে!

মরিয়ম রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই আনিস দু'হাত তুলে পথ আটকে দাঁড়াল, না, চা আমি চাই না!

কী চাই তা'হলে!

তোমাকে! রাগলে তোমাকে ভারি ভালো দেখায়।

দুটি শক্ত বাহুর মধ্যে বন্ধ হয়ে মরিয়ম ভারি ফাঁপরে পড়ল, আহ কী কর! সোনা আর মনি এসে পড়বে যে!

না ওরা বাইরে খেলছে!

তিন ছেলেমেয়ের বাপ, লজ্জা করে না তোমার!

সত্যি তুমি আমার লজ্জাবতী লতা!

ঘরে চল, বলে মরিয়ম স্বামীকে মৃদু ধাক্কা দিল।

একদম শূন্যে তুলে ধরে আনিস বলল, তুমি কি হাল্কা! মালগাড়ীর মত ভারী হ'তে পারো নি এখনো।

মরিয়ম ঘরের মধ্যে এসে কুপিতকণ্ঠে বলল, খবরদার, ও রকম খারাপ কথা বলো না।

আনিসের তখন মার্জনা ভিক্ষারই সময়, লক্ষ্মীটি আর বলব না! গাড়ী চালাই, গাড়ীর উপমাই মনে আসে।

মরিয়ম কথা ঘুরিয়ে নিল, সমস্ত বৌকেই তো স্বামীদের ভার মনে হয়। আমাকে তোমার যদি কখনো ভার মনে হয়, তখন কী হবে?

তুমি আমার সেরকম বৌ নও!

ঈশ!

একটু পরে বন্ধ দরজায় দু'খানা কচি হাতের অস্থির আঘাত শোনা গেল, মা, মা, নানা এসেছে!

আরক্ত মুখে দরজা খুলতেই মরিয়মের চোখে পড়ল, মনির হাত ধরে বাপজান ঢুকছেন বাড়ীর মধ্যে। লজ্জা গোপনের জন্য সে দ্রুত গিয়ে তমিজ বিশ্বাসের পায়ের উপর নত হয়ে পড়ল সালাম করতে।

ঘন সাদাপাকা চাপ দাড়ির মধ্যে তমিজ বিশ্বাসের গোল মুখের ভাব পরিবর্তন বোঝা গেল না। কপালের যে জায়গাটা নামাজ পড়তে পড়তে বারবার ভূমিস্পর্শের আঘাতে কালো হয়ে গেছে, তারি পাশে শুধু কুঞ্চিত রেখা দেখা দিল। দিনেদুপুরে এ কী বেহায়াপনা করতে শিখেছে তার মেয়ে! পর্দা-পুষিদায় মরিয়মকে সে রেখেছে, কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেখানোর জন্য অল্প বয়সে বছর দুই মাত্র মরিয়মকে গ্রামের ইউ-পি স্কুলে পড়তে দেওয়া হয়েছিল। সেই মেয়ের আজ এই অবস্থা! দোষ যদি কারো থাকে সে ঐ আনিসের।

তমিজ বিশ্বাস গুড়ের ভাঁড়টা নামিয়ে রেখে বসে পড়ল বারান্দায়।

জামাই বেরিয়ে এসে সালাম করতে যেতেই শ্বশুর গদগদ সুরে বলল, বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, হায়াত দারাজ হোক, তোমাদের দু'দিন না দেখে থাকতে পারিনে তাই আসি।

ভক্তি দেখলে তমিজ বিশ্বাসের বড় ভালো লাগে। গ্যাংম্যানদের সর্দারীর কাজে যতটুকু তার সাফল্য হয়েছিল সেও নিজের ভক্তির জোরে। সাহেবসুবো থেকে সুরু করে তাদের আর্দালি পর্যন্ত যথাযোগ্য ভাগ পেয়ে তার উপর পরিতুষ্ট ছিল।

মরিয়ম তালপাখা এনে বাপজানকে বাতাস করতে বসল। একটু ঠান্ডা হয়ে তমিজ বিশ্বাস হাত বাড়াল, দে আমাকে দে। ঐ দ্যাখ

আমার নাতির গায়ে রোদ লাগছে, ঘরে নিয়ে যা। আচ্ছা, চার বছরের ছেলেকে দোলনায় শোয়ানো কেন? স্বভাব খারাপ হবে না?

মরিয়ম বলল, নইলে ও ভারি জ্বালাতন করে যে।

দোলনা থেকে ছোটকর্তাকে তুলতে যেতেই তিনি জেগে উঠলেন। প্রথমে হাই তুলে, পরে মুখ ব্যাজার করে, শেষে তমিজ বিশ্বাসকে দেখে খুশী হয়ে কলি নিজেই দোলনা থেকে নেমে নানার কোলে এসে বসল। আখের গুড়ের হাঁড়িটার দিকে নজর পড়তেই আব্দার জানাল, নানা গুড় খাবো।

মরিয়ম তাড়া দিল, না এখন গুড় খেতে হবে না!

সোনা আর মনিও এতক্ষণ ঐ গুড়ের ভাঁড়ের পাশে বসে শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা সকরুণ সুরে প্রার্থনা করল, মা, একটু করে শুধু দাও!

মরিয়ম ভাঁড় থেকে ছেলেদের হাতে দলা পাকিয়ে গুড় তুলে দিল।

গুড় খেয়ে হাতের তালুটা তারও চেয়ে বেশী খাওয়ার চেষ্টা করতে করতে তিন ভাই বোন যখন কোয়ার্টারের বাইরে আমের আঁটি নিয়ে খেলতে গেল, তখন তমিজ বিশ্বাস মেয়েকে বললেন, বকরঈদে তোকে নিয়ে যাব বলে এসেছি।

বাপের কথার উত্তর দেওয়ার আগেই মরিয়মকে বেশ বড় ঘোমটা টেনে দিতে হল মাথার উপরে। শ্বশুর এসে উপস্থিত!

রোগগ্রস্ত দানেশ খাঁকে দেখে তমিজ বিশ্বাস বলল, আরে বেয়াই যে! তা এত শুকিয়ে গেছেন কেন? অসুখ নাকি?

গামছায় শীর্ণ মুখখানা মুছে গুড়ের ভাঁড়ের পাশে আর একখানা গামছায় বাঁধা সের পাঁচেক চাল নামিয়ে রেখে দানেশ খাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আর বেয়াই রোগের জ্বালায় মরে গেলাম। কুইনানে কিছু ফল হয় না!

ইঞ্জিশ্যান নেন না কেন?

সেই জন্যেই তো ছেলের কাছে এলাম! আর বকরঈদে বৌকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনিসের মা জ্বালাতন করছে।

তমিজ বিশ্বাস মেয়ের মুখের দিকে তাকাল, নাও এবার তোমার

শ্বশুর এসেছে নিয়ে যেতে। দেখা যাক, বাপ বড়, না, শ্বশুর বড়!

মরিয়ম শ্বশুরকে বাতাস করতে যেতেই দানেশ খাঁ বলল, না মা আমাকে দাও! তা বেয়াই, মেয়ে বিয়ে দেওয়ার পর শ্বশুরের ঘরই মেয়ের আপন ঘর। কিন্তু সামনের ঈদে আপনিই মেয়েকে নিয়ে যাবেন, আমার আপত্তি নেই।

তমিজ বিশ্বাস বলল, না বেয়াই, জোর যখন আপনারই বেশী, তখন আপনিই এবারের মত নিয়ে যান।

মান-অভিমানের পালা চলতে লাগল—বিয়ে দিলে মেয়ে পর হয়, না ছেলে পর হয়! অধিকার ভাগাভাগির এই লড়াই দুই বেয়াই একত্র হলে আর থামতে চায় না। রেল লাইনের একপাশের গ্রামে থাকে মরিয়মের নিজের জন্মদাতা, আর অন্যপাশের গ্রামে বাস করে স্বামীর জন্মদাতা। দুটো রেললাইন হাজার মাইল চ'লে পরস্পরের সঙ্গে না মিললেও, দুই বেয়াই এই রেল কোয়ার্টারটিতে এসে মিলে যান মাঝে মাঝেই। কিন্তু মনের মিল আর হয় না।

মরিয়ম ঘরে এসে বাক্স থেকে একটা টাকা বের করে দিল আনিসের হাতে, শুধু মাছ এনো!

আচ্ছা। এই দেখ, তোমার চালের ভাবনা আর রইল না দুসপ্তাহ চলবে এখন!

শ্বশুর থাকতে আমার চালের ভাবনা কী!

তাই নাকি? আনিস মরিয়মের গালে একটা টোকা দিল।

মরিয়ম ঘাড় বাঁকাল, আবার!

হাজার বার!

বয়স হচ্ছে না?

বয়স। এদিকে এসো, বলে আনিস মরিয়মকে টেনে নিয়ে এলো জানালার পাশে টাঙানো উজ্জ্বল আর্শীটার কাছে।

চোখ বন্ধ করো না তাকিয়ে দেখ।

এত সুখে মরিয়মের পক্ষে চোখের পাতা খোলা অসাধ্য হল। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, চব্বিশ বছর বয়সে এখন ভরানদীতে বান ডেকেছে!

আনিস সুর করে বলল, আমার আঁধার ঘরের আলো।

মরিয়ম স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল, বাড়িয়ে বলা পুরুষ জাতের অভ্যেস।

মেয়েরা মেয়েদের বলে না হিংসায়।

হঠাৎ স্বামীর বুকে মুখ রেখে মরিয়ম বলল, আমি মরে গেলে তুমি আবার বিয়ে করবে!

না।

তোমাদের পুরুষ মানুষের না জানা আছে।

আনিস উত্তর দিল না।

আনিসের মুখটা তুলে ধরে মরিয়ম খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলল, সে তুমি পারবে না!

আর তুমি বুঝি পারবে?

চুপ!

মরিয়ম নিজেই চুপ করে রইল। তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুর ধারা!

তুমি এমন কাঁদ কেন?

কী জানি এমনিতেই আসে।

চেয়ে দেখ আয়নার মধ্যে, কী সুন্দর দেখতে তোমাকে। কাঁদলেও তোমাকে ভাল দেখায়, হাসলেও তোমাকে ভাল দেখায়।

কোঁচার খুঁট দিয়ে মরিয়মের চোখ মুছিয়ে আনিস বাজারে গেল।

আহারের সময় যখন দুই বেয়াই পাতের মাছ ভেঙে সোনা আর মনির থালায় চালান করে দিতে লাগল তখন মরিয়ম প্রতিবাদ করল, ওদের দেবেন না। মাছ তো ওরা রোজই খায়। আয় তোরা উঠে আয়, উঠে আয় এদিকে।

সোনা আর মনির উঠে আসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

তমিজ বিশ্বাসের আর্দ্রস্বর আরো ঘনিয়ে উঠল, না থাক, ওদেরই তো এখন খাওয়ার বয়স।

দানেশ খাঁ আফসোসের সুরে বলল, মাছের কি আমাদের আগে ভাবনা ছিল। বেয়াই, তোমার বড় জামাই বিলটা ইজারা নিয়েই আমাদের

মাছ খাওয়া ঘুচিয়ে দিল! সব বাইরে চালান যায়। নইলে বিলের মাছ তোমাদের এ মাছের চেয়ে অনেক সুস্বাদু।

তমিজ খাওয়া বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দেখ বেয়াই, ইসরাইলকে আর আমার জামাই বল না। আমার মেয়ে মরে যাওয়ার পর ও-জামাই আমার পর হয়ে গেছে। তার এখন কত টাকা কত পয়সা, পাটের আড়ত, মাছের ব্যবসা। তার কারবার এখন জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে। একই গ্রামে থাকে অথচ খোঁজ পর্যন্ত নেয় না। শুধু মা-মরা হাসমৎটা আছে বলে এখনো সম্পর্ক ঘোচেনি। আজ যদি জাহানারা বেঁচে থাকত!

তমিজ বিশ্বাস শেষ করতে পারল না, রুদ্ধ হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর। দানেশ খাঁ সঙ্কুচিত হয়ে বলল, বেয়াই দুঃখ করবেন না, বাঁচা-মরা আল্লার হাত। আমরা মানুষে কী করতে পারি। তা বেয়াই, আপনি এবার মেয়েকে নিয়ে যান। আমি পরেই না হয় বৌমাকে নিয়ে যাব।

দুধের বাটির মধ্যে পাটালি গুড় ভেঙে দিতে দিতে ঘোমটার মধ্যে মরিয়মের চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল, বহুদিন পরে মনে পড়ে গেল জাহানারার কথা। ধরতে গেলে তার হাতেই সে মানুষ হয়েছে। বিয়ের আগে জাহানারার বাড়ীতেই তার থাকতে হত বেশীর ভাগ সময়। কিছুতেই বড়বোন ছাড়তে চাইত না তাকে। দুলা ভাই ইসরাইলের কাছেও আদরের অন্ত ছিল না।

সোনা তার ধ্যানভঙ্গ করে দিল, মা ঐ দেখ কে এসেছে।

মরিয়ম ঘাড় তুলে বলল, বসির!

এতগুলো লোকের সামনে হাজির হয়ে ছেলেটার মুখ গেছে শুকিয়ে! বসিরের বাপ কফিলুদ্দিন রেলে চাকরী করত, আজমগড় থেকে এসেছিল পাকিস্তানে, দেড় বছর ছিল ওয়াগনে। কফিলুদ্দিন মারা গেছে ওয়াগনের মধ্যেই প্রায় বিনা চিকিৎসায়, তারপর থেকে বসিরের বড়ভাই রেলে চাকরী করা সত্ত্বেও বসিরকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওয়াগন থেকে। বসির মণিহারী জিনিষ ফেরী করার চেষ্টা করে।

তমিজ বিশ্বাস বসিরকে দেখে খুশী হল না, বলল, এখনো ওকে তোমরা ভাত দাও কী বলে? গ্রামে গিয়ে রাখালগিরি করতে পারে না?

আনিস জবাব দিল, ওর আত্মীয় স্বজন এখানে, ভাইবোন এখানে, বাংলা মুল্লুকের গ্রামে অতটুকু ছেলে কী একা থাকতে পারে !

তাই বলে চিরকাল ওকে খাওয়াবে না কি ?

মরিয়ম মুখ ম্লান করে বলল, সব দিন তো আসে না।

দানেশ খাঁ হেসে ফেলল, আসল কথা ওর উপর টান পড়ে গেছে !

বসির হঠাৎ বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

মরিয়ম ডাকতে লাগল, বসির ! বসির !

আনিস সান্ত্বনা দিল, থাক, একটু পরে ফিরে আসবে দেখো।

পান মুখে দিয়ে দুই বেয়াই বারান্দায় গিয়ে বসল হুঁকো হাতে। পাটের লাইসেন্স থেকে করগেট টিন পর্যন্ত আলোচনা করে দুই বেয়াই প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে, তিনকাল গিয়ে যখন এককালে ঠেকেছে, তখন কবরে যেতে পারলেই হয় ! কিন্তু মৃত্যু না এসে ধীরে ধীরে দুই-জনের চোখে নেমে এল তন্দ্রা !

এক সময় কড়ানাড়ার শব্দে দু'জনেই উঠে বসল। আনিস জানালা থেকে অভ্যাগত দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। জিজ্ঞাসা করল, এ অবস্থায় কোত্থেকে প্রসন্নদা ?

অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন এবং নাটকীয়। ঘর্মাক্ত কলেবর এবং কর্দমাক্ত পদযুগল নিয়ে দুইব্যক্তি বারান্দায় উঠে এলো। প্রসন্নদার পরণে লুঙ্গি, গায়ে ময়লা গেঞ্জি, হাতে হাটুরে লোকদের মত কেরোসিন তেলের বোতল। দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মাথায় এক ঝুড়ি লাল শাক, আর ময়লা এক তেল চটচটে সাদা টুপি !

প্রসন্নদা হেসে বললেন, কী করব, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আসতে হল। চল সুলতান, আমরা ঘরের মধ্যে যাই। আনিস, ও দু'জন কে ? ও, বুঝেছি ! কিছু ক্ষতি হবে না তো ?

আনিস উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসল।

দুই বেয়াইয়ের মধ্যে চোখাচোখি হল। তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদের অবকাশ না দিয়ে প্রসন্নদা এবং সুলতান পরমাত্মীয়ের মত আনিসের সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

তমিজ বিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দেখলেন তো বেয়াই !

দেখলাম বই কি !

দুইজনেই কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। দানেশ খাঁ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল, আমা-দের চেয়ে ওরাই যেন আপন লোক !

তমিজ বিশ্বাস তিক্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু বিপদ যখন আসবে কোনো আপনেই কূল পাবে না।

বেয়াই, তুমি মানা কর না কেন ? আমি কতবার বলেছি, কিন্তু কথা কানেই নেয় না। একমাত্র বৌমাই পারে ওকে ফিরাতে।

ও মেয়ে কি আর আমার মেয়ে আছে বেয়াই ! এক মেয়ে গেছে মরে, আর এক মেয়ে গেছে দূরে সরে। বয়স বাড়লে কি ছেলে মেয়ে নিজের থাকে।

দানেশ খাঁ বাধা দিল, কিন্তু এই বাজারে ছেলের চাকরী গেলে আমার কি হাল হবে বুঝতে পারছ বেয়াই, ওষুধ কেনার পয়সা দেওয়ার মত আর দ্বিতীয় একটা লোক নেই।

তমিজ বিশ্বাস আবার একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করল, কী করবে বেয়াই, নসিবে যা লেখা আছে তাই হবে। কিন্তু ওদের কাছে কথা বলতে গিয়ে আর আমি অপমান হ'তে পারব না।

ক্রমে রোদের তেজ কমে এল। বিকালের এক্সপ্রেস ট্রেণটা চলে গেল। মরিয়ম চায়ের কেটলীটা চুলোর উপর বসিয়ে দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াতে বসেছিল। আনিস এসে বলল, আমি বাজারে পাল্কিটার কথা বলে আসি। কিন্তু এ কী ! তুমি আবার রাঁধতে বসেছ বলে মনে হচ্ছে ? তোমার যাওয়ার সময় হয়ে গেল যে !

মরিয়ম সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, আমার এখন যাওয়া হবে না।

তার মানে ? বাপজান মা কি মনে করবেন ! যাওনা, দু'দিন পরেই নিয়ে আসব !

একবার গেলে তুমি আর নিয়ে আসবে না ! কিন্তু ওঁদের রাত্রে কে রেঁধে দেবে ? তুমি তো ডিউটিতে চলে যাবে।

আনিস হেসে ফেলল, ওদের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

সে ভাবনা বুঝি তোমার ? কিন্তু আমি যাব না।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আনিস বলল, বেশ তাই হোক। তোমার

কথার উপর কি আমি কথা বলতে পারি।

পারো বলেই তো বল না।

কিন্তু বাপজান যে বড় রাগ করবে।

বাপজানকে বুঝিয়ে বল তাঁর সঙ্গে গেলে আবার শ্বশুর মনে মনে রাগ করবে। কাজেই তিন যেন বেয়াইকে চটিয়ে মেয়েকে না নিয়ে যান। বরং সোনা আর মনিকে দু'জনে ভাগাভাগি করে নিয়ে যাক।

আনিস হেসে ফেলল, তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি।

আলুর খোসা ছাড়ানো এক মুহূর্ত বন্ধ করে দিয়ে মরিয়মকে কণ্ঠ-সংলগ্ন করে আনিস বলল, তোমাকে ছেড়ে আমার এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে হয় না।

আর আমার বুঝি খুব ইচ্ছে হয়।

সেদিন বিকালে সোনার হাত ধরে তমিজ বিশ্বাস এবং মনির হাত ধরে দানেশ খাঁ দুই জনে দুই গ্রামের দিকে রওয়ানা দিল।

২

সন্ধ্যার সময় রেলের কিছু লোকজন নিয়ে একটা আলোচনা বৈঠকের আয়োজনের জন্য আনিস বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। প্রসন্নবাবুর চায়ের নেশার কথা মনে রেখে মরিয়ম যখন আর এক বাটি চা এনে তাঁর কাছে হাজির করল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তুমি নিজেও বাপের সঙ্গে গেলে না, আবার ছেলেমেয়েকেও পাঠিয়ে দিলে, তুমি ঈদ করবে না ?

মাথায় ঘোমটা থাকা সত্বেও মরিয়ম চোখ নত করে বলল, ওরা ওখানে ভালো খাবেদাবে। আর আপনারা এলেন—

সুলতান বাধা দিল, দেখ ভাবি, আমরা তো তোমাকে ছেলে মেয়ে পাঠিয়ে দিতে বলিনি! আমরা কি রেঁধে খেতে পারতাম না, না, আমাদের হাত পা নেই ? আর যাই হোক এই ক'বছরে রন্ধনবিদ্যায় আমরা পটু হয়ে উঠেছি। চাই কি তোমাকে রেঁধে খাওয়াতে পারি!

মরিয়মের ইচ্ছে হল বলে, বেশ তো একদিন রেঁধে খাওয়ালেই হয়। কিন্তু এদের সামনে তার মুখে কথা বেধে গেল।

মরিয়মকে নীরব দেখে সুলতান বলল, কী, ভাবি, বোবা হয়ে গেলে

নাকি? আমাদের সঙ্গে কথা বলতেও দোষ?

অগত্যা মরিয়মের ভীরু কণ্ঠস্বর প্রকাশ পেল, ঈদ তো এবার আপনা-দেরও হল না।

সুলতান একটু চুপ করে থেকে বলল, শোনো ভাবি তোমাকে একজনের গল্প বলি। তার নাম ব্রজবর্মণ। একটা কৃষক মিছিলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার উপর। বাড়ীতে মরণাপন্ন ছেলে, তবু সে কর্তব্য ভোলেনি। মিছিলের মধ্যে এসে একজন খবর দিয়ে গেল, ছেলেকে দেখতে চাও তো এক্ষণি বাড়ী চল। ব্রজবর্মণ তবু মিছিল ছেড়ে যেতে পারল না। ঝামেলা চুকে গেলে যখন বাড়ী ফিরল, তখন সব শেষ। ছেলের লাশ বুকে নিয়ে ব্রজবর্মণের সে কী কান্না। এমন ভাবে আগে আমি কাউকে কাঁদতে দেখিনি। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে, ব্রজবর্মণ শ্মশানে ছেলেকে পুড়িয়ে আবার আমাদের সঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম হাঁটতে সুরু করল! সেই ব্রজবর্মন গত বছর গুলিতে মারা গেল!

মরিয়ম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। প্রসন্নবাবু বললেন, সুলতান তোমার এ গল্প বলা ঠিক হয় নি।

সুলতান বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন ঠিক হয়নি!

প্রসন্নবাবু মনে মনে ভাবছিলেন, ওতে নিজেদের সম্পর্কে সুলতানের অহঙ্কার প্রকাশ পেয়েছে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, মরিয়ম ও গল্প শুনে মনে ব্যথা পেয়েছে। হাজার হ'লেও মায়ের মন তো।

আনিস ফিরে এল। প্রসন্নবাবু জিজ্ঞেসা করলেন, কী, কেউ আসবে?

পুরনো লোকজন তো প্রায় কেউই নেই। যাও বা কয়েকজন ছিল ট্রান্সফার করে দিয়েছে, সবই তো জানেন। যাহোক কয়েকজনকে বলে তো এলাম।

আপাতত লোকের মনোভাবটা একটু জানতে পারা দরকার, দুই-এক-জন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলে তাদের সঙ্গে ঘোরা যাবে। তোমার সঙ্গে বেড়ান তো দুই দিক দিয়েই বিপজ্জনক।

আনিস বলল, আমার তো ডিউটির সময় হয়ে গেল। কাল সকাল আটটার সময় এসে পেঁাছাব।

রাত বাড়তে লাগল, নিঃঝুম হয়ে এল রেলকলোনী। এ-দিকে বিজলী

বাতির ব্যবস্থা নেই, লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় মশার ভনভনানি যেন আরো বেড়ে যায়। সুলতান হাই তুলল,—ফোরম্যানের মাথা ভেঙ্গে দিল, টি, এম-কে ঘেরাও করল, অথচ ডাকলে লোকজন আসে না! আশ্চর্য! কেন এমন হয় প্রসন্নদা?

প্রসন্নবাবু বিষণ্ণ সুরে বললেন, লোকজনের দোষ কি, আমরা কতকাল পরে আবার এখানে এলাম বল তো! দমননীতির মধ্যে সংগঠন বাঁচাতে এখনো আমরা শিখিনি।

অবশেষে জনচারেক লোক এসে ঢুকল কলরব করতে করতে। প্রসন্নবাবু ওষ্ঠে আঙুল স্পর্শ করলেন, আস্তে।

আগন্তুকদের মধ্যে খলিলই একমাত্র পুরনো এবং পরিচিত লোক। আগে জামালপুর ওয়ার্কশপে ক্রেনে কাজ করত, এখানে এসে হয়েছে ফিটার। বিয়ে থা করেনি, আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই, যাও বা আছে তারা ভারতেই রয়ে গেছে। প্রচণ্ড দৈহিক খাটুনি এবং নিয়মিত স্বল্পাহারের ফলে উজ্জ্বল গৌরবর্ণের উপর একটা রুক্ষ কঠিন আস্তরণ পড়েছে। মুখের উপর সব সময় তার একটা বেপরোয়া হাসির ভাব।

প্রসন্নবাবু তাকেই সম্বোধন করলেন, খলিল ভাইয়া, খবর কি? ভালো আছেন তো?

খলিল বলল, দুখতখলিফ বহুত বাড় গয়া। হামারা মালুম হোতা আদমীলোগ আভি সব তৈয়ার হ্যায়!

প্রসন্নবাবুর মুখের উপর দিয়ে কৌতুকের হাসি খেলে গেল, খলিল সব বিষয়ে বড় বেশী নিঃসন্দেহ।

একে একে পরিচয় হল। গ্যাংম্যান মজনু মিঞার জন্ম বর্মাদেশে, প্রায় কুড়ি বছর কাজ করেছে সেখানে, জাপানী আক্রমণের সময় পালিয়ে আসে। ঘোষপুর নামক ছোট্ট স্টেশনের পাশের গ্রামে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। ক্লিনার কাসেম আলীর বাড়ী চট্টগ্রামে, জাহাজে খালাসীর কাজ করত, দেশ বিভাগের পর ভয়ে কোলকাতায় যায়নি। কী ক'রে ক্লিনারের কাজ জোগাড় করে এখানে এসেছে। ড্রাইভার কোরবানের বাড়ী বাঁকুড়ায়, অপ্ট-আউট ক'রে এসেছে পাকিস্তানে, ছেলেপুলে নিয়ে রেলকোয়ার্টারে থাকে।

প্রসন্নবাবু এদের জীবনের এই সামান্য পরিচয় এবং এদের মুখাবয়ব একই সঙ্গে মনের মধ্যে গেঁথে নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দ্রুত ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে নতুন মুখ এসে পুরনো মুখকে অস্পষ্ট করে দিয়ে যায়, হাজার চেষ্টাতেও অনেকগুলি মুখ হারিয়ে যায় কোথায়। অথচ এযুগে প্রত্যেকটি মুখ স্মরণ করে রাখার বড্ড বেশী প্রয়োজন।

মরিয়ম দরজার আড়ালে কলিকে কোলে নিয়ে বসে পড়ল। সুলতান তাকে ডাক দিল, এসো না ভাবি ঘরের মধ্যে। মরিয়ম ক্ষীণকণ্ঠে কী বলল বোঝা গেল না।

মজনু মিঞা বলল, দেখুন আমি থাকি কুড়ি মাইল দূরে ঘোষপুরে। সেখান থেকে এসে প্রত্যেক সপ্তাহে রেশন নেওয়া যায় ?

কাসেম আলীর সমস্যা অন্যরকম—বেমারীতে লোক মারা পড়ছে,—ছুটী নেই, ওষুধের ব্যবস্থা নেই। ডাক্তারী-ঘুষ বন্ধ না করলে মানুষ বাঁচবে না।

কোরবান আপন মনে একটির পর একটি বিড়ি টানছিল। একে তো কালো চেহারা, তারপর আগুনের উত্তাপে আরো কালো হয়েছে, তদুপরি মুখে অন্তত আধহাত লম্বা কালো দাড়ি। তার বিশাল চেহারার দিকে তাকিয়ে সুলতানের বেশ ভাল লাগছিল। এরকম দু'চারজন লোককে না পাওয়া গেলে যেন মনে জোর পাওয়া যায় না। হঠাৎ লোকটী আশ্চর্য নরম সুরে ডাকল, বাবা কলি এদিকে এস।

কলি নির্বিবাদে মায়ের কোল থেকে নেমে কোরবানের কোলের উপর এসে ব'সে আব্দার করল, চাচ্য আমাকে গাড়িতে চড়াবে ?

পকেট থেকে এক ঠোঙ্গা চিনে বাদাম বের করে কোরবান মাথা ঝাঁকাল, নিশ্চয় চড়াব ! মাকে গিয়ে দাও !

কলি উঠে গেলে কোরবান বলল, আমি যা দেখছি গ্রেণ-শপের বিরুদ্ধেই মানুষ সব চেয়ে ক্ষ্যাপা। রোজ ঐ নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে। ওজনে ফাঁকি, তারপর আজ এটা নেই, কাল ওটা নেই, পিছন দরজা দিয়ে সব ব্ল্যাকে চালান হয়ে যাচ্ছে।

প্রসন্নবাবু মনের মধ্যে একটা গভীর সহানুভূতি বোধ করলেন। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এখানে এসে একত্র হয়েছে কয়েক

হাজার মজুর। সমস্যা প্রাণান্তকর, কিন্তু দ্রুত একত্র হওয়া এদের পক্ষে কঠিন। তার জন্য কেউই দোষী নয়। প্রসন্নবাবুর হাতে গড়া রেল সংগঠন দেশবিভাগের পর এ অঞ্চলে ভেঙ্গে গেছে। ভোজবাজির মত পুরনো লোক কোথায় চলে গেল, নতুন নতুন মজুর আর কেরাণী এসে উপস্থিত হল, সেই সঙ্গে সৃষ্টি হল ভাষার ব্যবধান, মনের ব্যবধান, ঐতিহ্যের ব্যবধান। প্রসন্নবাবুর একবার মনে হয়েছিল, এদেশ ছেড়ে চলে যাই, কিছু এখানে হবে না। অন্তত কবে হবে কিছু ঠিক নেই। গড়া জিনিষ ভেঙে গেলে আবার গড়ার মত মনের জোর পাওয়া কঠিন! তবু প্রসন্নবাবু থেকেই গেলেন।

কোরবানের কথার পর আরো খানিকটা আলোচনা করে স্থির হল, গ্রেণ-শপের দুর্নীতির বিরুদ্ধেই আপাতত প্রচার চালাতে হবে। প্রসন্নবাবু বললেন, সব জায়গাতেই শুনছি গ্রেণ-শপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কথা। কিন্তু একটা জিনিষ খেয়াল রাখতে হবে এবং রেল মন্ত্রীর বক্তৃতাতেও সেটা বোঝা যায়, তাঁরা দুর্নীতি দূর না করে দুর্নীতির অজুহাতে একেবারে গ্রেণ-শপগুলিই তুলে দিতে চান। আমাদের আন্দোলন এমন ভাবে হওয়া উচিত নয় যাতে এমনি ধরণের সুযোগ তারা পায়।

একে একে সবাই বিদায় নিয়ে যাবার পর মরিয়ম ঘরে ঢুকল। রাত অনেক হল, এবার খেতে দিই ?

প্রসন্নবাবু হাসি মুখে বললেন, দাও! নাড়িভুঁড়িশুদ্ধ হজম হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি না থাকলে রাত্রে হয়ত চিঁড়ি-মুড়িই বরাতে ছিল। আমরা এত কুঁড়ে যে তুমি ধারণাও করতে পারো না!

মরিয়ম ঘাড় নেড়ে নীরব প্রতিবাদ করে বাইরে যেতে গিয়ে দরজার কাছে একটি মানুষকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

ভয় পেয়ো না! ভাবি, আমি!

ঘরের মধ্যে রীতিমত ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা ব্যক্তিটি প্রবেশ করলে সুলতান ঠাট্টা করে বলল, এরসাদ সাহেব যে! এত আগে এলেন যে আপনি!

এরসাদ লজ্জিত হয়ে হাসল, একটু বেশী দেরী হয়ে গেছে আমার! আমাদের আবার একটা অন্য মিটিং ছিল কিনা।

প্রসন্নবাবু বিস্মিত হলেন, আপনার আবার কি মিটিং ছিল!

এরসাদ এ এলাকার ন্যাশনাল গার্ডের ক্যাপ্টেন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ভিতরের ও বাইরের নানা সংঘাতে অনেকে ন্যাশনাল গার্ড ছেড়ে দিচ্ছে। নতুন উৎসাহে এরসাদ প্রাণপণে চেষ্টা করছে কী করে পুরনো বন্ধুদের নব্য পথের পথিক করা যায়। সে প্রসন্নবাবুর প্রশ্নের জবাবে বলল, দল ভাঙলেও দলের লোকরা সবাই ছাড়তে চায় না, অনেক ভালো লোকও তো আছে। দেখি তাদের এদিকে নিয়ে আসা যায় কিনা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রসন্নবাবুর দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে এরসাদ যথাসাধ্য মুখ গম্ভীর করে বলল, যাই হোক, আমাকে একটা কাজ দিন এবার।

সুলতান হেসে ফেলল, উনি সিগারেট খান না। তা কাজের অভাব কি। কাজে একবার লাগলে দেখবেন নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছেন না। তার কারণ আপনাকে তো আণ্ডারগ্রাউণ্ড থাকতে হবে না, প্রকাশ্য কাজের ঠেলায় দেখবেন হাঁফ ধরে যাবে।

প্রসন্নবাবু বললেন, শুনুন এরসাদ সাহেব, আমার সঙ্গে আজ রাত্রিতে আপনাকে একটু যেতে হবে। আপনাদের ন্যাশনাল গার্ডের চোখ এড়াবার জন্য আপনার সঙ্গে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো।

এরসাদের কণ্ঠে ঘৃণাব্যঞ্জক সুর ফুটে উঠল, সব ব্যাটাকেই চিনি! এ এলাকার পুলিশ আই-বি সকলের সঙ্গেই এককালে ভাব ছিল তো!

প্রসন্নবাবু এরসাদের চোখে চোখ রাখলেন, কিন্তু এখন নেই তো! তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, অবশ্য আপনার কাজের পক্ষে সেটাও মন্দ হবে না! যাক আজ আমার সঙ্গে যেতে পারবেন তো?

কেন পারব না!

মরিয়ম খাওয়াদাওয়ার পর এক ফাঁকে প্রসন্নবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। ইতস্তত করল, শেষে বলে ফেলল, ভাইয়া, আমি একলা থাকতে পারব না!

প্রসন্নবাবু বিস্মিত হলেন, কেন সুলতান থাকছে তো!

না!

প্রসন্নবাবু এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, বেশ আমি

আজ যাব না। আনিস ফিরে আসুক। কিন্তু সুলতান তো তোমার ছোট ভাইয়ের মত!

মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, পান দেব আপনাকে!

পান তো আমি খাই না।

পরদিন রাত্রে আনিসের বুকে মুখ গুঁজে মরিয়ম বলল, প্রসন্নবাবু খুব ভালো লোক।

হ্যাঁ, খুব ভাল। কিন্তু কেন বল তো?

না এমনিই বলছিলাম।

রাত তখন অনেক। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আনিস টের পেল মরিয়ম কাছে নেই। পাশের বড় চৌকিটাতে তিন ছেলে মেয়ে বেঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। প্রত্যেকে কুন্ডলী পাকিয়ে আছে। ছেলেমেয়ের মাথার বালিশ ঠিক করে দিয়ে আনিস একটু অপেক্ষা করল। কাল সকালে ডিউটি। কিন্তু মরিয়ম গেল কোথায়!

আনিস ঘরের বাইরে এল।

বারান্দায় মরিয়ম বসে আছে দেয়াল ঠেস দিয়ে! স্বামীর হাত গায়ে লাগতেই দারুণ চমকে উঠল। উদ্বিগ্ন স্বরে আনিস জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হয়েছে।

না, কিছুই হয়নি তো।

তবে এখানে এসে বসে আছ কেন? কী, কথা বলছ না কেন?

ঘুম আসছিল না।

কেন ঘুম আসছিল না?

মরিয়ম হাসতে চেষ্টা করল, বাঃরে, সব সময় বুঝি ঘুম আসে!

কিন্তু আমার তো কোনো সময় ঘুম আসে না এমন হয় না। না, লক্ষ্মীটি বল, কী হয়েছে?

তোমার কথা আলাদা, পরিশ্রম করলে এমনিতেই ঘুম আসে।

আর তুমি বুঝি পরিশ্রম করো না। আমাকে মিথ্যা কথা ব'ল না।

মরিয়ম বলল, হয়ত গরমের জন্য ঘুম আসে নি।

আনিস আর কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে মাদুর নিয়ে এসে বিছিয়ে

দিল বারান্দায়। তারপর একটা বালিশ নিয়ে এল, মরিয়মকে বলল, তুমি শোও তো। আমি একটু বাতাস দি।

মরিয়ম প্রতিবাদ করল, তোমার সকালে ডিউটি, তুমি ঘুমোও। আমাকে পাখাটা দাও।

ভাল হবে না কিন্তু।

তখন বাধ্য হয়ে মরিয়মকে বালিশের উপর মাথা রেখে পাখার হাওয়া খেতে হল। শেষে আনিসের হাতটা টেনে নিয়ে বলল, একটা কথা বললে তুমি কিছু মনে করবে না ?

আনিসের বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, তোমার কথায় কবে আমি কী মনে করি। কিন্তু এইবার কথা বেরুচ্ছে দেখে আনিস বাধা না দিয়ে সায় দিল, না কিছু মনে করব না, বল।

আমার বড় ভয় হচ্ছে।

কেন!

তুমি আর ওর মধ্যে থেক না।

কিসের মধ্যে ?

আমি জানি না!

আনিসের মুখে হ্যাঁ না কিছুই এল না, নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল শুধু। কখন সে মরিয়মের মাথায় হাত বুলোতে শুরু করেছে। গুমোট রাত্রির আকাশে তারাগুলোও যেন আজ হাসতে পারছে না মিটমিট করে। জীবনীশক্তির অতি ক্ষীণ আলো কেবল ওদের বুক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে আলোতেও যেন বেদনার কাঁপুনি। এক সময় আনিসের বুকের মধ্যে মরিয়ম মাথা গুঁজে বলল, তোমার কাছে থাকলে আমার ভয় করে না।

কিন্তু অতি কর্কশ এবং অতি দায়িত্বপূর্ণ পৃথিবীতে এই নির্ভয় আত্মনিবেদনের মধুরতাকে আনিস কী দিয়ে রক্ষা করবে! মরিয়ম মৃদু অনুযোগ করল, তুমি একদম কথা কইছ না কেন!

আনিস একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। শেষে বলল, আচ্ছা শোন প্রসন্ন-দার একটা কাহিনী। উনি যখন সোনাপুকুরের জমিদারদের বিরুদ্ধে গ্রামের চাষীদের একত্র করলেন, তখন নায়েব রমনীবাবু গেলেন ক্ষেপে। প্রসন্নদাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করলেন রমনীবাবু। প্রসন্নদা এ কথা

জানতেন, কিন্তু চলাফেরার সময় খেয়াল থাকত না। একদিন দিনদুপুরে সোনাপুকুর খালের ধারে নায়েবের চার পাঁচশ লোক প্রসন্নদাকে ঘিরে ধরল সড়কী বল্লম নিয়ে। প্রসন্নদার হাতে ছিল শুধু একটা গুটানো ঝাণ্ডা। সেটা খুলে ধরে প্রসন্নদা বললেন, ভয় আমাকে দেখাতে পারবে না, অনেক খুনে লাল হয়েছে এটা, কিন্তু একে নামাতে কেউ পারেনি! এই কথার পর, বললে বিশ্বাস করবে না, লোকগুলো কী রকম যেন হয়ে গেল। তারা ওঁকে গালাগালি দিতে দিতে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গল্প শেষ হল, কিন্তু মরিয়ম নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে বুকের মধ্যে। সাড়াশব্দ না পেয়ে আনিস মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, ঘুমুলে নাকি? মরিয়ম ঘুমায় নি তবু একইভাবে চোখ বুজে পড়ে রইল। খানিক পরে সে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু এবার আর আনিসের চোখে ঘুম এল না। ভাবতে লাগল এমন সব কথা যা সে কোনদিন ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না। ঘরের মধ্যে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে আছে কলজের টুকরো ছেলে-মেয়ে, আর বুকের মধ্যে নির্ভয়ে নিদ্রা যাচ্ছে প্রেয়সী নারী, এদের হাতে সড়কী বল্লম নেই, সংখ্যায় এরা মাত্র চারটি, কিন্তু যাদের ব্যূহ ভেদ করে প্রসন্নদা ঝাণ্ডা উপরে তুলেছিলেন, তাদের চেয়ে এই কোমল বাহুলতায় ঘেরা ব্যূহের শক্তি কত বেশী! একে ভেদ করে মানুষকে ভালবাসা দুষ্কর, আর এর মধ্যে সম্পূর্ণ আটকে থেকে মানুষকে ভালবাসা আরো কঠিন। কী উপায়? অথচ প্রসন্নদার সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে গেলে আসবে পুলিশের নজর, পড়বে চাকরীতে টান, মরিয়মকে কী জবাব দেবে তখন? মরিয়মের ভয়টা কালোরাত্রির মতই এবার আনিসের বুকে চেপে বসল।

৩

বিনিদ্র রজনী যাপনের পর আনিস একটু আগেই চলেছিল ডিউটিতে। চোখ জ্বালা করছে, সমস্ত শরীরকে জড়িয়ে ধরেছে অবসাদ। স্নান করেও তা কাটেনি।

কোমল রৌদ্রে ঝলমল করছে সমস্ত ষ্টেশন ইয়ার্ড। ক্লান্তি জুড়ানো শীতল হাওয়া বইছে ঝির ঝির করে। আর এক কাপ চা খেলে হয়ত দেহটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে ভেবে আনিস ষ্টলের দিকে এগুতে লাগল।

একটু যেতেই নজরে পড়ল বিস্কুটের খোলা টিনের মধ্যে কয়েক প্যাকেট সিগারেট আর বিড়ির বাণ্ডিল সাজিয়ে বসে আছে বসির। আনিসের চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ নামিয়ে নিল।

তখন আনিসই তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন সেদিন খেয়ে এলি নে? আর দেখা নেই কেন?

মুখ কাচুমাচু করে বসির বলল, আম্মার বহুৎ বিমার আছে। দাওয়াই কে রুপেয়া কে লিয়ে গয়া থা।

অর্থাৎ বসির বলতে চায় সেদিন খেতে যায় নি, মায়ের গুরুতর অসুখে সাহায্যের জন্য গিয়েছিল, কিন্তু আনিসের বাপ-শ্বশুরকে দেখে এবং তাদের বাক্যালাপ শুনে কিছু বলতে সাহস না পেয়ে মনের দুঃখে আহারেও প্রবৃত্তি হয় নি। অথচ তারি বড় ভাই রেলের মেকানিক নাসির একই ওয়াগনের মধ্যে থেকেও মায়ের দিকে ভ্রুক্ষেপেও চেয়ে দেখে না।

আনিস জিজ্ঞাসা করল, আম্মা এখন কেমন আছে?

বহুত খারাপ। আপনাকে খুব দেখতে চায়!

আমাকে দেখতে চায়?

হ্যাঁ।

এই দেখতে চাওয়ার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। আনিস হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বসিরকে তাড়া দিল, চল জলদি চল, দেখে আসি আম্মাকে।

রেলওয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে নেমে দু'জন চলতে সুরু করল।

বহুদিন আনিস এ পথ মাড়ায় নি। আজ আবার নতুন করে এখানকার দুর্গন্ধ এবং বিভৎসতার মধ্যে পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। সে নাকে রুমাল চেপে এগুতে লাগল। রেলওয়ে ইয়ার্ড তো নয়, জাহান্নমের অদ্বিতীয় সংস্করণ। কম-সে-কম চার পাঁচ শ' ওয়াগন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'বছর ধরে। কোন কালে আর নড়বে বলে মনে হয় না। এরই মধ্যে মানুষ পেতেছে সাধের গৃহস্থালী। দু'বছর ধরেও এদের বাসস্থানের একটু ভালো বন্দোবস্ত হয় নি। অথচ এখানে যে মানুষগুলি থাকে তারা উদ্বাস্তুও নয়, বেকারও নয়। বিহার, ইউ-পি, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং সারা ভারতের রেলওয়ে থেকেই এরা অপ্ট-আউট করে এসেছে

পাকিস্তানের টানে।

আনিসের গা বমিবমি করে উঠল। এমন দুর্গন্ধ যে রুমালেও কুল পাচ্ছে না। যদি ওয়াগনের টিনের পাটাতন ফুটো করে ছিদ্রের ব্যবস্থা হয় এবং সেটা ব্যবহৃত হয় মাসের পর মাস মলমূত্র ত্যাগের প্রায় একমাত্র উপায় হিসাবে, আর এমনি ধরণের অর্ধসহস্র ওয়াগন যদি পাশাপাশি সাজানো থাকে, তা'হলে কার সাধ্য সে দুর্গন্ধের তীব্রতা নাকে রুমাল দিয়ে রোধ করে। আনিসের চোখে পড়ল, বাচ্চাসহ একপাল মুরগী নির্বিবাদে বিচরণ করছে মলমূত্রের মধ্যে। রাদের ঘাঁটাঘাঁটিতেই দুর্গন্ধ আরো প্রবল হয়ে উঠেছে।

আবার এ নরকের উত্তাপও সাংঘাতিক। দুই সারি ওয়াগনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আনিসের গায়ে ঘাম ঝরতে লাগল। ওয়াগনগুলির টিনের চালা, টিনের বেড়া এবং টিনেরই পাটাতন। একটু রোদ পড়তেই এর মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তবু তো এখনো অবস্থা ভালো। ভর দুপুরবেলা রোদে তেতে ওয়াগনগুলো যেন ফার্ণেস হয়ে ওঠে। আর পাশাপাশি অনেকগুলি ফার্ণেস সাজানো থাকলে মানুষ যে এর বাইরে খোলা জায়গায় গিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে আসবে তারও উপায় থাকে না। ওরই মধ্যে সিদ্ধ হতে হয়। অথচ ওয়াগনের দরজা খুলে বাইরে যে একটু মুখ বাড়াবে মেয়েদের সে উপায়ও নেই, তা'হলে যে আব্রু বাঁচবে না! মুক্তদ্বার ওয়াগনগুলি পর্যন্ত দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে।

আনিসের চোখে জল এসে পড়ল। সেটা করুণাপ্রসূতও নয়, রাত্রি জাগরণও তার কারণ নয়। আট দশ সারি ওয়াগনের মধ্যবর্তী অপ্রশস্ত পথগুলির উপর কয়লার চুল্লী নামিয়ে আগুন জ্বালার চেষ্টা হচ্ছে। মিলিত ধূম্রজালের আক্রমণে চক্ষুতো দূরের কথা বাসিন্দাদের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে উঠেছে। যক্ষ্মারোগের হিসাব নিতে এসে এখান থেকে একজন ডাক্তার পালিয়ে গেছে।

হঠাৎ আনিস বিস্মিত হয়ে থেমে গেল। লোহার চাকার সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ একটি ছাগলের বাচ্চা তাজা কাঁটালের পাতা চর্বন করছে মনের সুখে। আর একটি শিশু ওর মুখের মধ্যে হাত দিতে গিয়ে খলখল করে হাসছে! আবার এর মধ্যেই কোত্থেকে ভেসে আসছে হারমনিয়মের

শব্দ !

না, এই মৃত্যুর নরককুণ্ডের মধ্যে ওয়াগনে নতুন শিশুও জন্মাচ্ছে ! মরছে অনেক, তবু জন্মাচ্ছেও তো ! আবার মানুষও এক অদ্ভুত জীব, কেউ কেউ এরি মধ্যে গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য ঘাসের চাপড়াশুদ্ধ মাটির স্তূপ চাপিয়েছে ওয়াগনের মাথায় ! না, এরা মরতে চায় না, মরেও এরা বাঁচতে চায়, কিন্তু বাঁচার পথ জানে না, এদের কি না ভালবেসে পারা যায় ? মরিয়ম, আমার আদরের মরিয়ম, তোমাকেও আমি ভালবাসি, এদেরও আমি ভালবাসি ! মনে মনে এমনি ধরণের অনেক কথাই আনিস বলতে লাগল। মরিয়ম তুমি যদি এদের দেখতে পেতে, এদের তুমিও ভালবাসতে। দেখ, এরা পাকিস্তানের টানে ছেড়ে এসেছে পিছনের আজন্মের ঘর সংসার, পশ্চাতের স্মৃতি, ভালবাসা। অথচ এরা পেল কি জানো ? এই জঘন্য জীবন ! এদের চারপাশে নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন আবহাওয়া, আদবকায়দা, ভাষা। মরিয়ম, সব কিছুই এদের কাছে যেন প্রতিবন্ধকতা, প্রতিযোগিতা এবং প্রতিশোধে ভরা। আমরা যারা বাঙালী মজুর তাদের সঙ্গে এরা কাজ করে, কিন্তু প্রাণের টান অবাঙ্গালী অফিসারদের সঙ্গে। অথচ বিপদের বন্ধু হিসাবে এরা তাদেরও পায় না, তাদেরও এরা ঘৃণা করে। আবার তাদের কাছেও যায়। অদ্ভুত এদের জীবন, মরিয়ম ! লীগের উপর মহব্বত এদের কিছু গেছে, কিছু যায় নি, কিন্তু নিজেদের মধ্যে এখনো মহব্বত জন্মায় নি। ভারতের বিরুদ্ধে নানা কারণে এদের মনে বিদ্বেষ আছে, কিন্তু পাকিস্তানকে ভালবাসলেও আগের মত মুসলমান মাত্রকেই ভাই বলে আর ভাবে না। মরিয়ম, আমার মত এদের পশ্চাতের টান নেই, কিন্তু ভবিষ্যতের আশা অস্পষ্ট। জীবনে এদের ধর্মের অবকাশ নেই, কিন্তু মোহ প্রবল। জানো মরিয়ম, এদের মধ্যে চিরাচরিত অভ্যাস এবং নতুন পরিবেশ, চিন্তা এবং মোহ, বাঁচার তাগিদ এবং বিচ্ছিন্নতা, পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন এক কুণ্ডলী পাকিয়েছে যে সে জট ছাড়ায় সাধ্য কার ! অথচ মরিয়ম, তোমাকে এবং আমাকে, এদেরকে এবং আরো অনেককে একসঙ্গে মিলে তো বাঁচতেই হবে।

আনিসের চিন্তা ভঙ্গ হল বসিরের সম্বোধনে, ভাইয়া, আপ থোড়া

ঠাহরিয়ে।

আনিস ওয়াগনের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

বসির ভিতরে ঢুকে আর বের হয় না! আম্মার বাইরে আসার ক্ষমতাটুকুও অবশিষ্ট ছিল না, অথচ বসির আনিসকে ভিতরেও ডাকতে পারছিল না! কারণ ভিতরে ছিল বসিরের দুই বড় বোন এবং নাসিরের বৌ, তারা যে অসূর্যম্পশ্যা! অবশেষে কোনমতে মাকে বসির টেনে আনল দরজার পাশে।

আম্মা ফিসফিস করে বলল, মৌথ হামারা নজদিগ হ্যায়! হামি আর নিজের জন্যে কিছু ভাবি না। এই বসিরকে তোমরা দেখো!

আনিস আশ্বাস দিল, আপনি ভালো হয়ে উঠবেন! বসির আর একটু বড় হলে নিশ্চয় একটা চাকরী পাবে।

আম্মা কিন্তু শুনেও শুনলেন না, নিজের অসুখের কথার মধ্যে যেতে রাজী হলেন না, শুধু বললেন, আমার দু'টি লড়কীর সাদী হল না! আমার রাত্রে নিদ আসে না!

আনিস ভেবে পেল না এর কী আশু সমাধান। তবু তাকে বলতে হল, আমি চেষ্টা করে দেখব!

আম্মা যেটা লুকাতে চেয়েছিল সেটা অতঃপর বেরিয়ে পড়ল। সাদী তো দূরের কথা বোন আর মাকে পর্যন্ত নাসির খেতে দিতে চাইছে না! বলছে, বহার নিকালো! কিন্তু চারপাশে যে রকম বদমাস লোক ঘোরে! মেয়েদের ভাবনাতেই আমি মরে যাব।

এ সব কথা এই ওয়াগনের মধ্যে বসে জোরে বলা যায় না, নাসিরের বৌ কান পেতে আছে, আবার আস্তে বললে সে উর্দু আনিস ভালো বুঝতে পারে না!

আম্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আনিস বসিরের হাতে ক'টা টাকা দিয়ে ডাক্তার আনতে বলে এবং পরে দেখা করতে ব'লে বিদায় নিল। এবার যেন বন্ধ হয়ে আসছে তার নিঃশ্বাস। দুর্গন্ধ অনুভব করার শক্তি পর্যন্ত নেই তার, নাকে রুমাল দিতে ভুলে গেছে সে।

হাঁটতে হাঁটতে অতীতের কত কথাই তার মনে হতে লাগল। কী বিচিত্র অবস্থার মধ্যে এই বসিরের বাপ কফিলুদ্দিনের সঙ্গে তার পরিচয়

হয়েছিল। তখন সবেমাত্র পাকিস্তান হয়েছে, রেলের হাজার হাজার মজুর যারা বাইরে থেকে এসেছে, তারা তখন অনেকে ওয়াগন পর্যন্ত পায় নি, তাঁবু খাটিয়ে কিম্বা বিনা তাঁবুতেই তাদের ব্যবস্থা হয়েছিল গাছতলায়। একদিন ডিউটির পর পরিশ্রান্ত আনিস বাসায় ফিরছিল। হঠাৎ বুক ফাটা কান্নার শব্দে থেমে গিয়েছিল সে। সামনে এগুতেই দেখে বিরাট জটলা। কার এক কচি মেয়ে ধানের রুটী খেয়ে মারা গেছে, তাই নিয়ে উত্তেজনা। প্রথমে আনিস বিশ্বাস করতে চায় নি, ধানের রুটী আবার কী! কিন্তু এ দুনিয়ায় সবই সম্ভব। সেদিন অতি নিপুন শাসকেরা অবাঙালি মজুরদের রেশনে যখন গম দিতে পারল না, তখন চালের ব্যবস্থাও করে নি। রেশনে ধান নাও, আর সুখে সেটা গলাধঃকরণ করো। ছন্নছাড়া ঐ অবাঙালী মজুররা ঢেঁকি পাবে কোথায়। চালের কল পর্যন্ত অনেকে পৌঁছাতে পারে নি। অনেকে গম পেষা যাঁতায় ধান পিষে খেয়েছিল। কয়েকজন তাতে মারা গেল, কিছু লোক মরতে মরতে বেঁচে গেল, আর অনেকে দিব্যি হজম করে ফেলল। একটা কচি মেয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে হজম করতে না পেরে এত লোকের চাঞ্চল্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই উত্তেজনাকে লীগবিরোধী মনোভাব বলে ভুল করে হঠাৎ একটি সুদর্শন যুবক আধো-অন্ধকারে প্রায় আনিসের পাশে দাঁড়িয়েই সেদিন চিৎকার করে উঠেছিল, আপনারা এর জবাব দিন! ভালো রেশনের দাবি তুলুন! লীগ সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করুন!

শেষ কথাটায় উপস্থিত জনতা কৈফিয়ৎ তলবের পরিবর্তে অতি কর্কশ স্বরে ঘোষণা করল, মার শালা কো!

আনিস নিজের অজান্তেই বক্তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, খবরদার! মারামারি করো না! খারাপ কথা কি বলেছে!

তখন ঐ বসিরের বাপ কফিলুদ্দিন তার বিরাট মুষ্টি উঁচিয়ে আনিসের কপালে বিরাশীওজনের এমন ভার নিক্ষেপ করেছিল যে, নিতান্ত আনিস বলেই চোখে অন্ধকার দেখা সত্ত্বেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় নি। তার কানের মধ্যে একটি কথা ভেসে এসেছিল, হামলোগ পাকিস্তানকো খিদমত করনে কে লিয়ে আয়া! দেখো ভাই, ইয়ে লোক

পাকিস্তান কো দুষমন হ্যায়!

আনিস চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল, যে তাকে ঘুষি মেরেছে সে এই বক্তৃতা করছে না! করছে যে তার নাম নবী বক্স! তারই সঙ্গে এই নবী বক্স ড্রাইভারী করে! অথচ তাকে দুষমন বলতে নবী বক্সের মুখে একটুও আটকালো না! যাই হোক, আনিস সুদর্শন যুবককে ভীড়ের বাইরে টেনে এনে রক্ষা করেছিল। তরুণ যুবকের নাম আওলাদ। লালঝাণ্ডা ইউনিয়নকে দূর থেকে আনিস এতকাল দেখেছে এবার সাক্ষাৎ একজনের সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু রিক্তস্বরে সেদিন আওলাদকে আনিস বলেছিল, বৃথা! এদের মধ্যে আপনাদের কাজ করা বৃথা! এরা গাছতলায় পড়ে মরে যাবে, ধানের রুটি খেয়ে বেহস্তে যাবে, কিন্তু লীগের বিরুদ্ধে গেলে যে দোজখে যেতে হবে। আর ঐ নবী বক্স, ব্যাটা যে এতবড় হারামজাদা আমি জানতাম না।

আনকোরা নতুন লোকের কাছ থেকে আওলাদ এমন স্পষ্ট নির্ভিক উক্তিতে অবাক হয়েছিল। তারপর থেকেই কেমন করে আস্তে আস্তে আওলাদ আনিসের বন্ধু হল, আর আনিস লালঝাণ্ডার কর্মী হল! তখনও ইউনিয়ন বে-আইনী হয়নি, তার অফিসে তখনও জমতো আড্ডা।

সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে আজ এই ওয়াগনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে, দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল আনিসের বুক থেকে।

তারপরই দেখা হয়েছিল প্রসন্নদার সঙ্গে। তখন তাঁর চুল এতটা পাকে নি। ইউনিয়ন অফিসের কালিপড়া লণ্ঠনের আলোয় কতকগুলি শ্রমিকের সামনে প্রসন্নবাবু বক্তৃতা করছিলেন, শ্রমিকদের চেতনার স্তর অনুযায়ী আন্দোলনের ধারা ঠিক করতে হবে আমাদের। শ্রমিকদের মনে এখনো প্রচণ্ড মোহ আছে। তাই তাদের আমরা বলব, পাকিস্তান গড়তে চাও, বেশ, তাতেই আমরা রাজি! কিন্তু যারা গড়তে দেওয়ার মালিক তারা তোমাকে গড়তে দিতে রাজি কিনা দেখে নাও। তাই আজ থেকে আমরা গঠনমূলক কাজই সুরু করব। আজ আমরা প্রথমেই কী দেখছি? রেলের হিন্দু মেথররা পাকিস্তান থেকে চলে গেছে। তাই চতুর্দিক এত অপরিষ্কার। এসো যারা ঐ কাজ করতে রাজি আছ তারা ভলান্টিয়ার হও! আমরা জঞ্জাল পরিষ্কার করব। এটাই আমাদের

প্রথম গঠনমূলক কাজ হোক।

দলে দলে সেদিন মজুররা ভলান্টিয়ার হয়েছিল। আনিসের কাছে ক্ষমা চেয়ে ঐ কফিলুদ্দিন পর্যন্ত বলেছিল, আমিও কাজ করব!

কাজ করবে? কিন্তু কি দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করবে? চলো মেডিকেল অফিসারের বাসায়, দাবি করো আমাদের ঝাড়ু দাও, ব্লিচিং পাউডার দাও, ফিনাইল দাও!

দুই হাজার মজুর গিয়ে ঘিরে ফেলেছিল মেডিকেল অফিসার জালাল আহম্মদের বাসা। রোদে আর উত্তেজনায় জালাল আহম্মদের প্রশস্ত কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল। সেই সুযোগে কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলভরা কয়েকটা শাখা আনিস ভেঙেছিল সেদিন, বাড়ী নিয়ে এসে মরিয়মের হাতে দিয়ে বলেছিল, ব্যাটা ফিনাইল টেনাইল সবই দিবে।

কিন্তু সে সবের বদলে কয়েকদিন পর তিন চারজনের নামে এল চার্জসীট! তার মধ্যে কফিলুদ্দিন একজন! যে কফিলুদ্দিন পাকিস্তান রক্ষার নামে আনিসকে ঘুষি মারতে দ্বিধা করেনি, তার ভাগ্যে গঠন-মূলক কাজের এই পুরস্কার মিলল!

তারপর আর একটি ঘটনায় কফিলুদ্দিনের সংগে আনিসের জমে উঠল ঘনিষ্ঠতা।

একদিন সন্ধ্যার পর আনিস বাপের বাড়ী থেকে ফিরছিল বাসায়। রেল কলোনীর প্রায় কাছাকাছি এসে নারীকণ্ঠের একটা আর্তস্বর শুনতে পেল। আঁশশ্যাওড়ার জঙ্গল থেকে একটা শেয়াল প্রায় নিরীহ কুকুরের মত পাশ দিয়ে চলে গেল।

আর্তস্বর অনুসরণ করে এগিয়ে যেতেই আনিস দেখতে পেল, একটি নারী জ্ঞান হারিয়ে কলসী নিয়ে পড়ে আছে সেই ঝোপঝাড় সমাকীর্ণ একটা এঁদো পুকুরের পাশে। একটু ইতস্তত করে আনিস তার মাথাটি তুলে নিয়েছিল নিজের জানুর উপর। এমন সময়ে উল্টো দিক থেকে আরো কয়েকটি মেয়ে এসে দাঁড়াল পুকুর ঘাটে! এরা যেন সব নিশাচর। অথচ এই মেয়েগুলো দিনের বেলায় ওয়াগনের আগুনে পুড়ে মরবে তবু বাইরে বেরুবে না!

কফিলুদ্দিনের ওয়াগনে জ্ঞানহারা আম্মাকে সকলে মিলে টেনে

তুলেছিল। কফিলুদ্দিন আনিসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল, আমাদের দেহে আর কোন আব্রু নেই, আব্রু টিঁকে আছে শুধু চোখে।

সত্যিই তাই। একখানা ওয়াগনে বৌ, ছেলের বৌ, সেয়ানা মেয়ে, নাতনি নিয়ে বাসও করে এরা, নতুন সন্তানের জন্মও হয় সেখানে। আর আব্রু পালাবার পথও পায় না যখন দেখা যায়, মেয়েরা গাড়ীর আশেপাশে মলমূত্র ত্যাগের সময় শুধু নিজের চোখ দুটো আঁচলে ঢেকে নিয়ে বিশ্বসংসারকে লোপ করে দিয়ে নিজের ইজ্জতের কাছ থেকে নিজে খালাস পায়। তারা সারাদিন ঘামভেজা অদ্বিতীয় সাড়িখানা পরে থাকে। ঘামে আর ময়লায় দিনে দিনে সেটা পলেস্তারার মত পুরু হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা দূরে দূরে এঁদোপুকুর খুঁজে ডুব দিতে আসে। যাদের একখানা মাত্র সাড়ী, তারা সেটা ঘাটের উপর খুলে রেখে একটু কাদা-ঘোলা জলে দেহটা শীতল ক'রে আবার ঘামে ভেজা কাপড়টা শরীরে জড়িয়ে ওয়াগনে ফিরে আসে। এ ভাবে ওয়াগনে থাকলে আর কতদিন এরা বাঁচবে! এদের কোয়ার্টারের বন্দোবস্ত করতেই হবে। কিন্তু কী ক'রে? কে বানাবে কোয়ার্টার? টাকা দেবে কে?

সেদিন আওলাদ আনিসকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গ্রামের পর গ্রামে। কৃষকরা সানন্দে সাড়া দিয়েছিল, তারা বলেছিল, আমরা বাঁশ দেব, দড়ি দেব, হাত দিয়ে ঘর তৈরী করে দেব।

এরপর শুধু প্রয়োজন ছিল একটি জিনিসের। সেই জিনিসের দাবিতেই পাঁচহাজার শ্রমিক গিয়ে ডি-এম-ই'র বাংলো একদিন ঘেরাও করল। জিয়াউল হক নাচের এবং গানের মাষ্টার ও পরিষদবর্গসহ চার বছরের কন্যার কচি মুখের এবং দেহের আধোআধো সুর আর নৃত্যের রিহার্সেল দেখছিলেন। বিরক্ত হয়ে মুখের পাইপে নতুন তামাক গুঁজে বাইরে এসে দাঁড়ালেন, কী চাই?

টিন।

টিন?

হ্যাঁ, শুধু আমাদের টিনের জোগাড় করে দিন। বাকী আমরা ম্যানেজ করে নেব। কৃষকেরা আমাদের বাঁশ দেবে, দড়ি দেবে এবং হাত দিয়ে ঘর বানিয়েও দেবে।

দেখুন, আপনারা কনট্রাকটর দিয়ে বাড়ী তৈরীর প্ল্যান করছেন। প্ল্যান ধুয়ে কি আমরা পানি খাব? এদিকে ওয়াগনে লোক মরে ভূত হয়ে গেল! শুধু আপনারা টিন জোগাড় করে দিন! আমরা বাড়ী তৈরী করে দিচ্ছি। কনট্রাকটর লুটতে পারবে না, গবর্ণমেন্টের টাকা বেঁচে যাবে।

ধূম উদগীরণ করে জিয়াউল হক হেসেছিলেন, আর আপনাদের প্রভাবও বেড়ে যাবে, কি বলেন!

অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করে আওলাদ সেদিন আনিসকে বিস্মিত করে দিয়ে হেসেছিল, আমরা গঠণমূলক কাজে হাত দিতে গেলেও আপনারা বাধা দেবেন?

আচ্ছা, টিনের জন্য লিখব আমি।

জিয়াউল হক কী লিখেছিলেন জানা যায় নি, তা ছাড়া তাঁর কন্যাটির টনসিল অপারেশনের জন্য দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে হয়েছিল। উপরের লোকেরা কি আমাদের কথা মানে, বলেও তাকে বন্ধুদের কাছে প্রায়ই আপশোষ করতেও শোনা গেছে।

এইভাবে দ্বিতীয় গঠনমূলক কাজের পরিসমাপ্তি ঘটল। পূর্ব-বঙ্গের একুশ হাজার রেলের লোকের ছাঁটাই লিস্ট কাদের হুকুমে কোথায় যেন তৈরী হচ্ছে গুজব বেরুল। গুজব যখন সত্যে পরিণত হ'তে চলল তখন রইল ওয়াগন, রইল রেশন, রইল সব কিছু সমস্যা চাপা পড়ে, একটি মাত্র আতঙ্কে মানুষগুলো অস্থির হয়ে উপায় খুঁজতে বেরুল।

তারপর থেকেই বড় বড় সমাবেশের সূচনা।

তবু লোকের মনে দ্বিধা ছিল, সন্দেহ ছিল। সেটা আরো বেড়ে উঠতে লাগল যতই 'পাকিস্তানের সেবা' 'মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই' প্রভৃতি ধুয়া তুলতে লাগল নবী বক্সের দল। এভাবে এদের প্রভাব বাড়তে দিলে না করা যাবে রেলের লোকদের একত্র, না বন্ধ করা যাবে ছাঁটাই। অথচ যুক্তিপূর্ণ বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে দেখা গেছে তেমন ফল হচ্ছে না, অনেকে বুঝতে পারে না, চিরাচরিত চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খায় না বলে মানতেও পারে না।

এই সময় কফিলদ্দিন হয়ে উঠল এক দারুণ বক্তা। আসলে বক্তৃতা সে করত না, গল্প বলে যেত একটার পর একটা।

আজ এতদিন পর আনিসের এত ভাবনার মধ্যেও কফিলদ্দিনের ভূতের গল্পটা মনে পড়ে হাসি পেল।

এক স্ত্রী-পুত্র-পরিবারহীন বুড়ো কৃষক এক বেলা ভাত রাঁধত, দুইবেলা খেত। একদিন মাঠ থেকে ফিরে এসে দেখে হাঁড়িতে ভাত নেই! চোখে পড়ল সামনের তেঁতুল গাছের ডালে বসে একটা ভূত পা দোলাতে দোলাতে তার দিকে চেয়ে হাসছে। কৃষক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, ও ভূত তুমি গরীবের ভাত কেন খাও? কিন্তু কাকুতি মিনতিতে ভূতের মন গলল না, কৃষকটা রোজই এসে দেখে হাড়ির ভাত খেয়ে গেছে ভূত। শেষে মৌলভীর কাছে গেল সেই কৃষক। মৌলভী বলল, গাছটাই কেটে ফেলে দাও, ভয় দেখাতে এলে বলো আমি কিছু জানিনে, মৌলভী সাহেবের কাছে যাও! বুড়ো বাড়ী ফিরেই কুড়ুল নিয়ে বিসমিল্লা বলে দমাদম কোপ লাগাল গাছে। ভূত দেখল এ মহা জ্বালা, তেঁতুল গাছটি ছিল. এতদিন বেশ আরামেই ছিলাম, এখন যাব কোথায়! ভূত তখন বলল, আমি তোমার ভাত আর খাব না! কিন্তু কে শোনে কার কথা, বুড়ো আরো জোরে চালাল তার কুড়ুল। ভূত উপায়ান্তর না দেখে বলল. ও বুড়ো গাছ তুমি কেট না, আমি মুসলমান হয়ে যাচ্ছি! আর আমরা মুসলমানরা তো ভাই ভাই। কৃষক ভূতের ভয় দেখে এবার দরাজ গলায় হাসতে লাগল, ভাই না ছাই, তুই হচ্ছিস ভূত! তোকে আমি দেশছাড়া করবই! আমাদেরও ভাই পাকিস্তানের ঘাড় থেকে ভূত ছাড়াতে হবে, নইলে হাড়ির ভাত সব খেয়ে যাবে।

কফিলদ্দিনের এই রকম একটা গল্পে দশটা বক্তৃতার কাজ হত।

কিন্তু যতবড় কাজ ততবড় বাধা, যত বেশী আন্দোলন তত বেশী পুলিশ। আওলাদ আর কফিলদ্দিন গ্রেপ্তার হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে আরো অনেকের জেল হল। কয়েক মাস পরে অনেকের সঙ্গে মুক্তি পেল কফিলদ্দিন, কিন্তু সেই সঙ্গে চাকরী থেকেও পেয়ে গেল চরম মুক্তি। ছাঁটাই হল কয়েক হাজার। বাপের উপর নাসির খাপ্পা হল, কেন তুমি আন্দোলন করতে গেলে। কফিলদ্দিনকে ছেলের মুখ ঝামটা

বেশীদিন সহ্য করতে হয় নি। দু'দিনের জ্বরের পর আজরাইল এসে তাকে টেনে নিয়ে গেল বেহস্তে কিম্বা দোজখে, কে জানে।

শুধু কয়েদখানার মধ্যে পড়ে রইল আওলাদ। পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আনিসের সব চেয়ে কষ্ট হতে লাগল ঐ আওলাদের জন্য। আওলাদ কি যেন এক বন্ধনে বেঁধে রেখে গেছে তাকে। আনিস মনে মনে বলল, মরিয়ম, আমাদের ছেলে মেয়ে আর আমাদের সংসারের জন্য তুমি আমাকে টেনে রাখতে চাও, কিন্তু আওলাদের কাছে আমি কি জবাব দেব। জেলের অন্ধকারে সে যতদিন থাকবে ততদিন বিবেক যে শান্ত থাকতে চায় না, চুপ থাকতে যে পারিনে। তাকে জেলে রেখে সরে দাঁড়াব কোন মুখে? সে তো নিজের জন্য কয়েদখানায় গিয়ে বসে নেই।

কখনো কফিলুদ্দিন কখনো আম্মা কখনো আওলাদ, কখনো মরিয়মের কথা ভাবতে ভাবতে কিম্বা সব ভাবনা নিয়ে তালগোল পাকাতে পাকাতে আনিস এসে উপস্থিত হল রাণিং শেডের মধ্যে! ক্লার্ক নূর মহম্মদ বলল, আপ ফিফটিন মিনিট লেট!

আনিস হেসে উঠল, কিন্তু তার জন্য একদিন মারা পড়বেন আপনি। কতবার না বলেছি লেট হ'লে আপনি লিখে রাখবেন।

নূর মহম্মদও হাসল, আপনি কি ভেবেছেন আমি লিখে রাখি না! তারপরই আজমগড় জেলার এই প্রৌঢ় লোকটি খকখক করে কাশতে লাগল। শেষে দম নিয়ে স্বগতোক্তি করল, এই ধোঁয়া আমাকে শেষ করবে!

আনিস ইঞ্জিনে গিয়ে উঠেছিল ততক্ষণে। নূর মহম্মদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড় করালো ঐ মন্ত্রমুগ্ধ যন্ত্র দানবকে। লাফ দিয়ে নেমে নূর মহম্মদের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, কেন আপনি ডি-এম-ও'র কাছে যান না! একটা ভালো চিকিৎসার বন্দোবস্ত নিশ্চয় সে করে দেবে, সেও তো আপনাদের আজমগড়ের লোক!

নূর মহম্মদ মুহূর্তকাল নিশ্চুপ থেকে উত্তর দিল, জালাল আহম্মদ আমার দেশের লোক, কিন্তু আমরা যে বাস করি দুই ভিন্ন জগতে।

আনিস বলল, সেই হয়েছে জ্বালা!

৪

বিকালের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কোলের কাছে কলিকে নিয়ে মরিয়ম বারান্দায় হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল, উঠবে উঠবে করেও ঘুমের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। বসির তার মাথার কাছে বেশ কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করছিল। পাশেই তার সিগারেট বিড়ির টিনটা নামানো। সে মরিয়মের ঘুম ভাঙগাতে চায় নি। একখানা কাগজের উপর তার দৃষ্টি নিবন্ধ।

মরিয়ম ঘুম ভেঙেগ তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কখন এলি ?

অনেকক্ষণ !

ডাকিস নি কেন ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সিনেমার ইস্তাহারখানা এগিয়ে দিল মরিয়মের দিকে, ইসমে ক্যা লিখা হ্যায় ?

মরিয়ম কাগজখানা হাতে নিয়ে দেখল উর্দুতে লেখা। জিজ্ঞাসা করল, তুই একদম কিছুই পড়তে পারিস নে ?

লজ্জিত মুখে বসির উত্তর দিল, বহুত কম, থোড়া-থোড়া।

তোর লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে করে না ?

বহুত ! এই সিনেমার কাগজে কী লেখা আছে বুঝতে পারি নে।

দেখা যাচ্ছে চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন পড়ার জন্যেই বসিরের লেখাপড়া শেখার সখ ! মরিয়ম মনে মনে বলল, ছেলেটাকে একদিন কয়েক আনা পয়সা দিতে হবে সিনেমা দেখার জন্যে। মুখে বলল, তোর জামাটা খুলে ফ্যাল তো !

সত্যিই বসিরের শতছিন্ন জামাটা আর গায়ে দেওয়া দুঃসাধ্য। বসির হাসল, তা'হলে গায়ে দেব কী।

মরিয়ম ঘরের ভিতরে গিয়ে আনিসের একটা পুরনো জামা এনে বসিরের হাতে দিয়ে হুকুম করল, নে পর।

পরলে দেখা গেল তার মধ্যে বসির প্রায় তলিয়ে গেছে। তখন মরিয়ম আবার অর্ডার দিল, আচ্ছা খোল ! তোর আম্মা কেমন আছে ?

আচ্ছা নহি হ্যায় ! হামারা ভাইটো বহুত বদমাস আছে !

চুপ! বড় ভাই হয়, কিছু বলতে নেই। আচ্ছা তুই যা, হালিমা আপার কাছ থেকে সিঙ্গার মেসিনটা নিয়ে আয়। বলিস কালই ফেরত দেব।

হালিমা আপাটি হলেন আনিসের বাড়ীর সামনের বাসিন্দা অ্যাসিসটেন্ট ফোরম্যান ইউনুসের বিধবা বোন।

বসির বেরিয়ে যেতেই ছিটের খানিকটা কাপড় হাতে করে দুটি ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে এসে ঢুকল পাশের বাড়ীর টালিক্লার্ক মানু মিঞার বৌ জবেদা।

কী করছ আপা, বলে জবেদা বসে পড়ল।

কী আর করব, ঐ বসির ছেলেটার জন্য এই শার্টটা কেটে কুটে ছোট করে দেওয়া যায় কিনা দেখি।

আপা, সেই সঙ্গে আমার একটা ব্লাউজ তৈরী করে দিয়ো!

কেন শেলাই করতে শিখে নাও না? কতবার না তোমাকে বলেছি।

জবেদা কৈফিয়ত দিল, কি করব, একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে সময় পাই কখন?

থাম! তোমারও তো ঐ তিনটি! একপাল ছেলেমেয়ে বললে আমার বড় খারাপ লাগে।

জবেদার কণ্ঠস্বরে যেন মধু ঝরে পড়ল, তোমার মত তো আমি কাজ করতে পারিনে আপা! তোমার কাছে কি আমরা দাঁড়াতে পারি।

খুব হয়েছে! কাজ করিয়ে নেওয়ার সময় সবাই ও রকম বলে।

জবেদা এবার কথার সুরে বিষাদ ঢেলে দিল, তোমাদের মানু ভাইয়া যদি একটু আমাকে সাহায্য করত তা'হলে আমার কি ভাবনা ছিল! অফিস থেকে এসে সেই যে খাটের উপর শোবেন, আর নড়বার নামটি নেই। একটু ছেলেমেয়েকে ধরা, একটু পানি এনে দেওয়া, কোনো কাজই উনাকে দিয়ে হবার জো নেই।

থাম! তোমার মুখে আর মানু ভাইয়ার গুণকীর্তন শুনতে চাইনে।

সিঙ্গার মেসিনটা ঘাড়ে ক'রে বসির বাড়ীতে ঢুকল, আর তার পিছনেই হালিমা। বেশ মোটাসোটা চেহারা, চল্লিশ পার হয়ে গেছে, কিন্তু মুখের কোমল লাবণ্য লোপ পায়নি এখনো। হাতে তার হলুদের দাগ।

মরিয়ম অভ্যর্থনা করল, আপা এসো!

আপার আর এসে কাজ নেই! বাটনা বাটা ফেলে এসেছি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে! বলি নিজের সিঙ্গার মেসিনটা সারিয়ে নিতে পারিস নে? জানিস যখন ইউনুস আর তার বৌ প্রাণ গেলেও সিঙ্গার মেসিন আর গ্রামোফোন কাউকে দিতে চায় না, তবু আমাকে মুস্কিলে ফেলিস কেন? আমার কি নিজের সংসার, না, ভাইয়ের সংসার?

উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই হন হন করে চলে গেল হালিমা। সেই দিকে চেয়ে মরিয়মের মুখে ঈষৎ হাসি খেলে গেল। ঘাড় নীচু করে শার্টের সেলাই খুলতে সুরু করল সে।

তারপর মুখ তুলে বসিরের দিকে তাকিয়ে মরিয়ম ঘরের মধ্যে চলে গেল। চিড়ে ভিজিয়ে কলা দিয়ে মেখে একটু দুধ ঢেলে বাটিটা বসিরের সামনে এনে রাখল। জবেদা ছিটের টুকরো হাতে করে উঠে পড়ল, আপা আমি যাই!

উঃ মেয়ের রাগ দেখ না। কাপড়টা রেখে যা বলছি!

জবেদা তিরস্কারে খুশী হয়ে ব্লাউজের কাপড়টা রেখে চলে গেল।

একটু পরেই মনে হল কোত্থেকে প্রচণ্ড গর্জনের মত একটা শব্দ ভেসে আসছে।

মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, কীসের শব্দ বসির?

বসির মুখের মধ্যে চিড়ে কলার স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত ছিল, ঢোঁক গিলে পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, মিছিলের শব্দ না?

প্রকাণ্ড মিছিলটা এদিকেই এগিয়ে আসছিল। মরিয়ম সন্তর্পণে দরজা খুলে একটু কাৎ হয়ে কপাটের পাশ থেকে উঁকি মারল। সত্যি হাজার হাজার মানুষ! কোথায় চলেছে এরা!

মিছিলটা প্রায় দরজার কাছে এসে পড়ল। উদ্দাম ধ্বনি এসে পেঁৗছল মরিয়মের কানে, স্টাণ্ডার্ড ক্লথের দাম বাড়ানো চলবে না!

এর কোনো অর্থই বোধগম্য হল না মরিয়মের কাছে। দরজা ছেড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে জানালা খুলে দাঁড়াল সে। হঠাৎ আনিসের সঙ্গে চোখাচোখি! একেবারে সামনের লাইনে চলেছে আনিস। চোখ নামিয়ে নিল মরিয়ম, এত লোকের মধ্যে সঙ্কোচ হয়। একটা অজানা আশঙ্কায়

তার বুক ভরে উঠল। সে ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। মরিয়মের পক্ষে কোনো বাধা দেওয়ার আগেই, আমি আসছি, বলে বসির খাওয়া অসমাপ্ত রেখেই দরজা খুলে দৌড়ে চলে গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও সে যখন ফিরল না তখন তার ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য সিগারেট-বিড়ির টিনটা মরিয়ম তাকের উপর উঠিয়ে রাখল।

মরা গাঙে বান ডাকলে সে দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যায় চোখের পলকে। সেদিন শ্রমিকদের মনে লেগেছিল সেইরকম একটা জোয়ারের ঢেউ। তফাৎ এই, বন্যা আসে বাইরে থেকে, আবেগের উৎস মনের গভীরে।

গ্রেণসপের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুরু হয়েছিল প্রচার, কিন্তু উৎসাহের পালে জোর হাওয়া লাগে নি তাতে। কেমন যেন সওয়া হয়ে গিয়েছিল গ্রেণসপের গঞ্জনা। তবু ডি-এম-ই'র কাছে গিয়ে কয়েকজন প্রতিকার প্রার্থনা করেছিল।

কিন্তু অন্যান্য বারের মত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ব্যাপারে তিনি বিলম্ব করেন নি। তাঁর দোষও নেই, কেননা, কেউ যদি তাঁকে সজ্ঞান অপরাধী বলতে পারত, তা'হলে তিনিও দেখিয়ে দিতেন অ্যাসিসটেণ্ট ডি-এম-ই থেকে সুরু করে পার্শেল অফিস, ষ্টোর, ট্রাফিক প্রত্যেকে টাকা খাওয়া এবং টাকা মারার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে, তিনি কেন তাঁর চৌদ্দ পুরুষ এলেও হার মেনে যেত। কিন্তু সহ্যেরও সীমা আছে। আজ যখন রেশন দোকানে গিয়ে লোকে শুনল ষ্ট্যান্ডার্ড ক্লথে প্রতি পাঁচ গজে আট আনা বেশী দিতে হবে অর্থাৎ কিনা অঙ্কের হারে এবার ঘুষের ব্যবস্থা চাই, তখন এতদিনের সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। রেশনের দোকানে যারা কাপড় কিনতে হাজির হয়েছিল, তারা আকস্মিক জটলা সুরু করল, তারপর দেখতে দেখতে কয়েক হাজার লোক জমা হয়ে গেল। রাণিং সেডে ইঞ্জিনখানা রেখে আনিস সবেমাত্র বেরিয়েছে, এমন সময় মেকানিক জহুর ছুটে এল, আপনাকে সবাই খুঁজছে।

আমাকে খুঁজছে!

হ্যাঁ আপনাকে।

কেন কী বৃত্তান্ত শুনে আনিস, চলুন, বলে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

মনের মধ্যে খুশীও লাগছে, অথচ বুকে অস্বস্তি। মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খোঁজ করছে তাকে, মানুষ প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকে ভোলে নি! কিন্তু সেই ছাঁটাইয়ের দিনগুলিকেও মন থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না। পুলিসকে সে তখন ভালোভাবেই দেখেছে। তখনও সে ছিল অনেকের অন্তরালে দাঁড়িয়ে। আজ সকলের সম্মুখে মানুষ ঠেলে দিচ্ছে তাকে।

আওলাদকে যেমন পুলিশ আজও ক্ষমা করে নি, তেমনি তাকেও এখন থেকে করবে না। কোথায় থাকবে মরিয়ম. কি হবে তার সোনা মনি কলির?

জহুরের সূক্ষ্ম গোঁফজোড়ার দিকে তাকিয়ে আনিস জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ থেকে সুরু হয়েছে?

সেই সকাল দশটা থেকে।

ডি-এম-ই এসেছিল?

না! সেইজন্যেই তো সবাই বলছে তার বাংলো ঘেরাও করবে।

নবী বক্স কি করছে জানেন? ওখানে আছে সে?

জহুর উত্তর দিল, আমি তাকে চিনি নে।

আপনার হাতে ওগুলো কি? মারামারি করতে যাচ্ছেন না কি!

জহুর লজ্জিত হয়ে বলল, না, এগুলো পুরনো দোকান থেকে কিনে ফিরছিলাম এমন সময় গোলমাল শুনলাম।

ও সব পুরনো জিনিস দিয়ে কী করবেন?

জহুর আবার লজ্জিত হল, যন্ত্রপাতি আমার ভালো লাগে। যখন যেখান থেকে পাই জোগাড় করি!

আনিস হুকুম দিল, যান ও-গুলো বাড়ী রেখে আসুন! ও সব হাতে করে মিছিলে যাবেন না! জানেন তো পুলিশ সব সময় মওকা খোঁজে। যেতে হলে আমরা একেবারে খালি হাতে যাব।

বিষণ্ণ মুখে জহুর ফিরে গেল তার বাড়ীর দিকে। ঐ প্রাণবন্ত তরুণ ছেলেটিকে আগে কোথায় দেখেছে আনিস তা মনে করতে পারল না। সে অনেককে চেনে না, কিন্তু তাকে অনেকে চেনে। গড্ডালিকা প্রবাহে সময় যখন বয়ে যায় তখন তা অবশ্য টের পাওয়া যায় না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আনিসের অবশ হয়ে আসা দেহের সমস্ত ক্লান্তি যেন এক মুহূর্তে

ঝরে পড়ল। কখন যে মিছিল হয়েছে, কখন যে সে হাঁটতে সুরু করেছে, উত্তেজনায় কিছুই সে টের পায় নি।

বিকালে পড়ন্ত রোদে বারান্দায় ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে জিয়াউল হক ইংরেজি পত্রিকার স্তম্ভে মনযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মন বসছিল না কিছুতেই। অন্যদিন এমন সময় তাঁর গুলশন ক্ষুদ্র দু'টি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, আধআধ মিষ্টি সুরে কথা বলে, অকারণ নৃত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। আজ ক'দিন গুলশনের মা গুলশনকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে গেছেন। বেড়ানই তাঁর শখ। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে কোন প্রকার বাধাই দেন না জিয়াউল হক। তাঁর হাত খরচাতেও তিনি দিলদরিয়া। এখানে সমাজের অভাব বলে বিবিসাহেবা রাজধানীর কুটুম্বদের বাসাতেই কাটান বছরের কয়েক মাস। তখন নিঃসঙ্গ দিন কাটে জিয়াউল হকের। তবে একমাত্র সান্ত্বনা গ্লাসগোতে বিদ্যাশিক্ষার সময় থেকে আজ পর্যন্ত পানীয় বলতে কিছুই বাদ দেন না তিনি। নামাজও পড়েন সুবিধা পেলে। আগে যখন ছিলেন কানপুরে, তখন নামাজের বালাই একেবারেই ছিল না, এখন পাকিস্তানের সেবায় এসে কিছুটা ভান করতে হয়। বাঙালীদের তিনি কৃপা করেন, অবাঙালী অফিসারদের সঙ্গে খুব ভাব নেই, অনেককেই আনকালচার্ড বলে গালাগালি দিতেও তাঁর বাধে না, তবে তাঁদের অনেকের মত নিজেকেও তাঁর পাকিস্তান ট্যুরিষ্ট বলে মনে হয়। তাই প্রথম পক্ষের ছেলেকে এখনো ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে রেখেছেন ভালো লেখাপড়া হবে মনে করে। পুলিসের প্রতি তাঁর পরম বিতৃষ্ণা। কী এক খুনের মামলায় তাঁর আব্বাকে পুলিশ জড়িত করেছিল বলে তিনি তাঁর আম্মাকে দুঃখ করতে শুনেছিলেন।

আজ খবরের কাগজের পাতা ভেদ করে গুলশনের দুষ্টামিভরা মুখখানি যখন বারেবারে মনে উঁকি দিচ্ছিল, তখন তিনি চমকে উঠে কাগজ নামিয়ে রাখলেন। না, গুলশন নয়, পুলিশ! ডি-এস-পি আলি আকবর! প্রায় গোলাকার চর্বিবহুল মুখের উপরে চোখ দু'টি তার ঘন ভ্রূ আর নিচের স্তূপ মাংসপিন্ডের চাপে অদৃশ্য—এই রকম চেহারার

লোককে জিয়াউল হক ইডিয়ট বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু খাতির করে বসিয়ে বললেন, তসরিফ ফরমাইয়ে! আদমীলোগ ইধর আ রহা হ্যায় ?

তাই শুনে তো এলাম। কতকগুলো কমিউনিষ্ট হারামজাদার কাণ্ড।

জিয়াউল তিনটে দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে অবশেষে শান্ত সুরে বললেন, আপনার ফোর্সকে উইদড্র করে নিয়ে যান! আমার শ্রমিকদের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলব!

কিন্তু আপনার উপরই ওদের রাগ। আপনি নাকি বারে বারে প্রমিস ব্রেক করেছেন!

আমি! আমি ব্রেক করেছি! উপরে কতকগুলো ইডিয়ট বসে আছে। কিচ্ছু বোঝে না, কিচ্ছু শোনে না। আমি কি করব!

কিন্তু ওরা তো তা বোঝে না! আপনাকে সামনে পেয়েছে, ঝালটা ঝাড়বে আপনার উপর দিয়েই।

তাই নাকি। জানেন আপনাদের ঐ এ-ডি-এম-ই মতিউল ইসলাম আমাকে এখান থেকে সরাতে চায়। ঐ ব্যাটাই ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথের দাম বাড়িয়েছে পাকা ঘুষের লোভে! আপনি কিছু মনে করবেন না!...বয়! বয়! সাবকা লিয়ে চা লাও!

মিছিলটা পেঁছাতে না পেঁছাতে আলি আকবর তার হাতের রুল ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠল, পাঁচ মিনিট টাইম দিচ্ছি! ডিসপার্স না করলে আমি ষ্টেপ নেব! আমি আনহ্যাপি কিছু করতে চাই না! কিন্তু সাবধান!

কোত্থেকে ভেসে এল, শালা শুয়োরের মত দেখতে!

আনিসের কানের কাছে মুখ নিয়ে কোরবান বলল, লাঠিধারী পুলিশ, তার পাশেই আর্মড পুলিশ। আজ কিছু মতলব আছে মনে হচ্ছে! দেখছেন কী রকম তোড়জোড়!

আনিস উত্তর দিল, তাই তো, ভালো মনে হচ্ছে না!

মিছিলটা তখনো সম্পূর্ণ এসে পেঁছায় নি। তখনো ধ্বনি উঠছিল। কারো মুখে ছিল বিড়ি। নূর মহম্মদ কাশতে আরম্ভ করেছে। কেউ সামনে ঘাসের উপর বসব বসব মনে করছে। একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণের

ভেঁপু শোনা গেল। এমন সময় আলি আকবরের চিৎকারে স্তব্ধ হয়ে গেল সব কিছু।

কেন জানি আনিসের চোখে পড়ল, পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছের গুঁড়ি বেয়ে একদল কাঠ-পিপঁড়ে উঠছে দল বেঁধে। মুখে তাদের সাদা ডিম। আর গাছের গায়ে কারা যেন ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নাম লিখে রেখে গেছে। অনেকগুলি তার মধ্যে অস্পষ্ট, শুধু একটা নাম পড়া যায় রহমান। গাছটার পাশেই একটা ভাঙ্গা চায়ের কাপ উপুড় হয়ে আছে! ঠিক ঐ রকম একটা কাপ আনিস কয়েক বছর আগে মরিয়মের জন্য কিনে আনাতে মরিয়ম রাগ করেছিল, এত দামী জিনিস কিনে না-হক পয়সা খরচ করা। বাজে পয়সা খরচ করা মরিয়ম সহ্য করতে পারে না। কাপটা কাগজে মুড়ে তুলে রেখে দিয়েছে বাক্সে। আনিস চারপাশে তাকাল। শরৎ সন্ধ্যার আমেজ লেগেছে এই নির্জন অফিসারস কোয়ার্টারের সব কিছুতে।

হঠাৎ লোক দৌড়তে সুরু করল! লাঠি চার্জ সুরু হয়েছে!

একটা ইট আনিসের কান ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। তারপর কে পাশ থেকে চিৎকার করে উঠল, গুলি চলছে! হয়ত চলছে, হয়ত চলছে না, কে জানে! যখন সে একটু থামল, তখন পাশের একটি লোক ছুটে এল, ঈশ কী রক্ত পড়ছে।

পায়ের দিকে তাকিয়ে আনিস অবাক হয়ে গেল। সত্যি সত্যি তার নিজের পায়ে রক্তের দাগ! না, হাড় ভাংগে নি, বুকের মধ্য দিয়েও গুলি যায় নি, মাথার খুলিও আস্ত আছে। শুধু একটু চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে! তবু শেষ পর্যন্ত যে গুলি চলতে পারে বা সে গুলি তার দেহস্পর্শ করতে পারে তা যেমন কোনো মিছিলের মানুষ বিশ্বাস করে না, তেমনি সে-ও করে নি!

আনিস দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনো লোক দৌড়চ্ছে, পালাচ্ছে, ইট ছুঁড়ছে, চিৎকার করছে। সে আবার একটু এগিয়ে গেল। পিছিয়ে যেতে যেন লজ্জা হয়, কে যেন অদৃশ্যভাবে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। পিছিয়ে গেলে যেন কার প্রতি অপরাধ করা হয়।

লোক মরেছে! ক'জন? কেউ জানে না, অথচ সকলেই জানে।

পুলিশ লাস তুলে নিয়ে গেছে। আহত যারা পড়ে ছিল তাদেরও ছেড়ে যায়নি। হাসপাতালে সেবা যত্ন করে ভালো করে তোলা হবে!

হঠাৎ কোত্থেকে নাসির এসে আনিসকে জড়িয়ে ধরল, ভাইয়া বসিরকো মার ডালা।

বসির মারা গেছে গুলিতে!

লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে অনেক আগেই। শীতের সন্ধ্যা তাড়াতাড়িই আসে। এখন সমস্ত রেলকলোনীর উপর যেন বিষাদের মত চেপে বসল।

আনিসকে কোরবান জোর করে নিজের বাসায় টেনে নিয়ে গেল।

ব্যান্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছিল, তবু উপায় নেই। দুর্ভিক্ষের পর যেমন মহামারী, তেমনি গুলির পর গ্রেপ্তার যেন প্রাকৃতিক নিয়ম। তবু একবার মরিয়মের সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে।

আনিস যখন ঘরে ঢুকল তখন মরিয়মের মূর্চ্ছিতপ্রায় দেহটা ক্ষীণ লণ্ঠণের আলোকে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। তার বুকের তলায় বসিরের সেই ফেলে যাওয়া বিড়ি-সিগারেটের টিনের বাক্স! খাদ্যের উচ্ছিষ্টভরা পাত্রটা তখনও তাকের উপর তোলা ছিল।

হালিমা পাশেই ঘুমন্ত কলিকে কোলে নিয়ে বসেছিল। চুপিচুপি বলল জাগিয়ো না, হয়ত ওর তন্দ্রা মত এসেছে।

আনিস একটু অপেক্ষা ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

৫

কয়েকদিন পর রাত্রে দরজায় করাঘাত শুনে মরিয়ম ধড়ফড় করে উঠে বসল, কে? কে?

আমি! দরজা খোল।

দরজা খুলে দিতেই যে মূর্তিটা ঘরে প্রবেশ করল তাকে চেনা দায়। উস্কোখুস্কো চুল, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, শুধু চোখের দৃষ্টি প্রখরতর।

আনিস চোখ বুলিয়ে নিলে ঘরের চারদিকে। সোনা মনি ফিরে এসেছে, মশারীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ওদের। আলনায় তেমনিভাবেই সাড়ী ব্লাউজ কাপড়চোপড় সুন্দর করে সাজানো। বাক্স সুটকেসের

পিরামিডের মাথায় ছাইফেলার কৌটা আর তার পাশে তেমনিভাবেই দেশলাইটি বিরাজ করছে। দেয়াল ঘেঁষা ছোট টেবিলটির উপর ছেলে-মেয়েদের শ্লেটপেন্সিল ধারাপাত, আর আনিসের রাত্রের পানি খাওয়ার কাঁচের গেলাসটি। এ ঘরের স্নিগ্ধ পরিবেশ এবং পরিচ্ছন্নতা এমন করে আনিসের চোখে পড়েনি কোনদিন। তার তক্তাপোষটি আজ শূন্য! সেখানে অন্যদিন এতক্ষণে শয্যা পাতা হয় এবং মশারীর ছাউনি পড়ে। আনিসের বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস এলো। রেলকলোনীতে আজ অনেক-গুলি বিছানাই এমনিভাবে শূন্য পড়ে আছে। পঞ্চাশ জনের উপর মানুষকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

হ্যারিকেনের আলোটা উজ্জ্বল করে দিয়ে মরিয়ম বলল, দেখি তোমার পা।

ভয় নেই, সেরে যাবে।

ব্যান্ডেজের উপর হাত বুলিয়ে মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, খুব ব্যথা?

আনিস মৃদু হাসল, না! পুরুষ মানুষের ব্যথা লাগতে নেই।

সব ব্যথা বুঝি মেয়েদের?

হ্যাঁ!

দু'জনেই কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে রইল। কেউই উচ্চারণ করল না বসিরের নাম।

হঠাৎ মনি বিছানা থেকে নেমে এসে আনিসের গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, বাপজান, তুমি কোথায় ছিলে? তিন দিন ধরে আসনি কেন?

অনেক দূরে বেড়াতে গিয়েছিলাম কি না!

এবার কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

আচ্ছা তাই হবে। এখন যাও তো, শুয়ে ঘুমোও।

মনি বায়না ধরল, বাপজান, আমি আজ তোমার সঙ্গে শোব।

আনিসের বিপদগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মরিয়ম মেয়েকে তাড়া দিল, যাও শোও গিয়ে। উনার রাত্রে আজ ডিউটি।

মুখ ম্লান করে মনি গিয়ে ঢুকল মশারীর মধ্যে।

খানিক পরে আনিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সাবধানে থেকো। আর এ মাসটা হিসেব করে চালাও, সামনে মাসে দেখা যাবে।

মরিয়ম অদ্ভুত প্রস্তাব করল, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো!

কি বলছ, পাগল হ'লে নাকি?

কিন্তু আমি যে আর পারছি নে! সারাদিন ধরে কোয়ার্টারের যত মেয়ে আর বৌ আসছে, আর গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে! তুমিই নাকি তাদের সর্বনাশ করেছ!

এক মুহূর্ত আনিসের মুখের ভাষা লোপ পেল। সামলে নিয়ে বলল, ওদেরও অনেককে গ্রেপ্তার করেছে। মানুষের মনে ত একটু লাগবেই! সবাই কি সব কথা বোঝে।

মরিয়ম প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে আনিসের হাত ধরল, আর একটু বসো!

মরিয়মের গলার স্বরে বিস্মিত হয়ে আনিস বসে পড়ল তার পাশে। পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে বলো ত!

কই, কি আর হবে...আমার শরীর তেমন ভালো যাচ্ছে না।

কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আনিস নিজেই পরক্ষণে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, তাই নাকি!

নতুন অতিথি আসছে জননী জঠরে। আনিস প্রথমটা খুশী হতে গিয়ে শেষে হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। একি পুরস্কার না পরিহাস! নতুন মানুষকে অভ্যর্থনার এই কি সময়!

একটু পরে আনিসকে মরিয়ম ঠেলা দিল, আচ্ছা, এবার যাও!

না যেতে পারব না! প্রসন্নদা একদিন যদি অপেক্ষা করেন কোনো দোষ হবে না।

আনিস দুই বাহুর মধ্যে মরিয়মকে টেনে নিল।

সোনাকে দিতে এসে তমিজ বিশ্বাস যে গণ্ডগোলের ব্যাপারে আনিসকে ভর্ৎসনা এবং মেয়েকে গালাগালি করে গেছে, সে কথা মরিয়ম কিন্তু আনিসকে সারাক্ষণের মধ্যে একবারও বলতে পারল না।

অন্ধকার তখনো তরল হয়ে ওঠে নি, আনিস পথে বেরিয়ে পড়ল। রাত্রি শেষের বিরাট আকাশের নীরব শান্তির প্রলেপ আনিসের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির মনের মধ্যে পেঁৗছল না। সে রকম আশীর্বাদ গ্রহণের সময় বা মনের অবস্থা তখন তার ছিল না। সে হন হন করে এগিয়ে চলল।

মাইল দেড়েক হেঁটে সে যখন এরসাদের বাড়ীর কাছাকাছি এল তখন ভোরের অস্ফুট আলো দেখা দিতে সুরু করেছে। এরসাদের বাড়ীর সামনে শাকসব্জি আর বেগুন মরিচ তামাকের ক্ষেত। বেশ ঘন হয়ে শিশির পড়েছে ঘাসে। আনিসের জুতোটা ভিজে উঠেছে।

কয়েকটা টোকা দিতেই এরসাদ চোখ মুছতে মুছতে উঠে দরজাটা খুলে দিল। ঘুম জড়ানো চোখে বলল, ও আপনি! ভিতরে আসুন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আনিসের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে এরসাদ খবর দিল, জানেন এ-বাড়ীর উপরেও নজর পড়েছে! তবু হাজার হলেও এতকাল ন্যাশনাল গার্ডের ক্যাপ্টেন ছিলাম তো, সহজে হয়ত হাত দেবে না।

কাঠের পার্টিশনের অপর পার থেকে ভারী গলায় প্রশ্ন এল, এত সকালে কার সঙ্গে কথা বলিস?

না কেউ না, তুমি ঘুমোও!

ওরে ঘুম আমার আর ইহজন্মে হবে না। সারারাত একবার যদি চোখের পাতা বুজতে পারি!

এরসাদ ফিসফিস করে বলল, বাপের ভীষণ হাঁপানি।...কিন্তু উনাকে নিয়ে আর আমি পারিনে, কেবলি বলছেন ন্যাশনাল গার্ড ছাড়লি যখন, তখন এবার পড়তে যা আবার। যত বলি পড়ে কি হবে, কার কি হচ্ছে, আর আমার দ্বারা পড়াশোনা হবেও না, ততই বলেন শুধু ঘরে ধান থাকলেই কি লোকে আজকাল সম্মান করে রে! আমি বলি, তোমার ধান আমি চাই না। বাপ বলে, তোর যা মতিগতি তাতে আমি আগেই জানতাম চোখ বুজলে তুই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিবি। এ কথার উপর আমি কি বলব বলুন। এক একবার ইচ্ছে হয় বাড়ী ছেড়ে চলে যাই।

আনিসের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। যে কথা বলার জন্য সে মনে মনে ঠিক করে এসেছিল, এখন আর তা বলা যায় না। তার খুব আশা ছিল এরসাদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে মরিয়মের হাতে দিয়ে কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হবে।

আনিসের পায়ের দিকে তাকিয়ে এরসাদ জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন আছেন ভালোই? আচ্ছা, আমি কি কোনো কাজেই লাগতে পারিনে?

কথাটা এরসাদের দিক থেকে আসার ফলে আনিস খুশী হয়ে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বলল, এটা নিয়ে এক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবেন ?

কে দিয়েছে ? কার চিঠি ?

জিজ্ঞেস করতে নেই।

এরসাদ মনে মনে রোমাঞ্চিত হয়ে মুখে বিব্রত ভাব দেখালে, আমি জানতাম না !

আনিস হেসে ফেলল, আস্তে আস্তে সবই জানবেন। আচ্ছা, আমি এখন উঠি, ঘুরে এলে আবার দেখা হবে।

আনিস দ্রুততালে পা চালিয়ে ষ্টেশন ইয়ার্ডের কাছাকাছি এসে পড়ল। ক্রসিংটা পার হতে যাবে এমন সময় একখানা ট্রেণ বাঁশী বাজিয়ে ষ্টেশনে এসে থামল। দূর থেকে লুব্ধ দৃষ্টিতে আনিস ইঞ্জিনখানার দিকে তাকিয়ে রইল। ঐ ট্রেণখানার কে আজ চালক ? ক'দিন ধরে সে বাঁশী বাজাতে পারে না, ঝড়ের বেগে ট্রেণ ছোটাতে পারেনা, আজ তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে।

ক্রসিংটা পার হয়ে পাকা রাস্তা ধরে আনিস গ্রামের দিকে চলতে সুরু করল। সবুজ কচি ধানের মাথা ছাপিয়ে পাটের চারাগুলো উঠেছে খাড়া হয়ে। আর সেই পাটের সহস্র সহস্র রোমশ পোকা চারদিকে পড়েছে ছড়িয়ে। ঐ পোকা দেখলেই তার গায়ের মধ্যে শিরশির করে ওঠে।

ইটের রাস্তার পাশে দর্জির দোকানটা। ঝাঁপ ঠেলে প্রবেশ করতেই প্রসন্নবাবু ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলেন, তার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এরসাদ রাজী হল ? আচ্ছা ! তা হলে ঝামেলা একটা চুকল। হ্যাঁ, ওকে ক্যুরিয়ারের কাজে লাগানোই ভালো।

প্রসন্নবাবু যে সুকৌশলে আনিসের রাত্রে না ফেরার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, তা দেখে সে মনে মনে ভারী আরাম বোধ করল।

সে জিজ্ঞাসা করল, সুলতান কোথায় ?

চিনির কলে আবার গোলমাল সুরু হয়েছে, সেখানে। তোমাকেও তার সঙ্গে একদিনের জন্য পাঠাবো ভেবেছিলাম। আজাহার কেন আসছে না বলো তো ? বুড়ো মানুষ রাত্রে কষ্ট হবে, তাই বলেছিলাম খুব

ভোরে আসতে।

আজাহার দর্জি রাত গোটা নয়েকের সময় দোকান বন্ধ করে বাড়ী চলে যায়। এই দোকানের পিছনেই একটি অতি ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠরীতে দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকার স্থান পাওয়া গেছে!

আজাহার এল হাঁপাতে হাঁপাতে। বুড়ো বয়সে আর কত সয়, বলে গামছা খুলে একটা থালায় চিড়েমুড়ি ঢেলে দিয়ে বলল, খাও বাবারা।

দু'জনে খেতে আরম্ভ করলে আজাহার অনেকটা আপন মনেই বকবক করতে লাগল, নিজেই বা কি খাই, তোমাদেরই বা কি খাওয়াই। ছেলে-টাকে এত বড় করলাম, বিয়ে দিলাম, সে এখন বাপের খোঁজও নেয় না, মহাসুখে আছে চাটগাঁয়ে। বুড়ো বাপকে একটা পয়সা পাঠাবার নাম-গন্ধ করে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমার কি এখন এত সয়।

খাওয়া বন্ধ হতে দেখে আজাহারের গলা থেকে মিনতির সুর বেরুল, বাবারা বুড়োর কথায় দোষ ধরো না! তোমরা সব কাঁচা ছেলে, তোমাদের দেখলে মায়া হয়। কতই ত দেখলাম এ জীবনে। দেখবার সাধ আর আমার নেই। তবু তোমাদের সঙ্গে কথা বললে একটু প্রাণ জুড়োয়। দেশের মানুষ কি আর মানুষ আছে। সব চামার হয়ে গেছে।

এক ফাঁকে প্রসন্নবাবু আনিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মরিয়ম বোন কেমন আছে?

একটু ইতস্তত করে আনিস জবাব দিল, ভালোই আছে।

প্রসন্নবাবু বুক-পকেট থেকে গোটা পনেরো টাকা বের করে তার হাতে দিতে গেলেন, বুবুকে দিয়ো। নিশ্চয়ই খুব অসুবিধেয় পড়েছে।

টাকা কটা আনিস নামিয়ে রাখল, না, এ টাকা পার্টির টাকা, অতি কষ্টের টাকা, এ আমি ছুঁতে পারব না।

আজাহার তার কথায় সায় দিল, সত্যি কথা বাবা, ও টাকা তুমি নিয়ো না!

প্রসন্নবাবু বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এতো নিজের টাকা, নিজে নিতে দোষ কি?

আনিস জবাব দিল, না, এখন না। আমি কতটা পার্টির, সে কথা আগে পরীক্ষা হোক, তখন নেব।

প্রসন্নবাবু প্রসন্নহাসির সঙ্গেই বললেন, দেখ আনিস, পরীক্ষার কোনদিন শেষ হবে না! কিন্তু তুমি যখন হাত বাড়াবে, দেখবে শূন্য তহবিল ঝেড়েও কিছু বেরুচ্ছে না!

আনিস বিমর্ষ মুখে এবার মনের সেই কথাটা পেশ করল যা তাকে এ কয়দিন মুহূর্তের জন্য স্বস্তি দেয় নি—প্রসন্নদা, আমাদের অবস্থা তবু তো ভালো, কিন্তু অনেকের ঘরে হাহাকার উঠেছে, রেশনের চাল আসেনি। তাদের কি হবে?

তাদের ভার তোমাদেরই নিতে হবে! সেটাই তো এখন কাজ।

কিন্তু ভার আমরা নেব কি করে!

প্রসন্নবাবু হাসবার চেষ্টা করলেন, দেখো আনিস, চেষ্টা করলে সব অবস্থাতেই কিছু করা যায়। প্রথম কথা হচ্ছে টাকা চাই। বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে, অন্তত যাদের জামিনে ছাড়ে তাদের ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে টাকা দরকার। বন্দীদের পরিবারকে সাহায্য করতে হবে, তাতেও টাকা দরকার। কিন্তু টাকা দেবে কে?

আজাহার মাঝখান থেকে বাধা দিল, আমিও বলি টাকা দেবে কে? মানুষের কি আর টাকা দেওয়ার অবস্থা আছে?

প্রসন্নবাবু বললেন, টাকা ঐ রেলের লোকেরাই দেবে। অবস্থা নেই, তবু দেবে। তাদেরও মনে ব্যথা আছে, সহানুভূতি আছে। তাদের কাছে আবেদন জানাতে হবে, পোস্টার লিখতে হবে, ইস্তাহার বিলি করতে হবে। তারা যদি দেখে পেছনে লোক আছে, তা'হলে নিশ্চয়ই টাকা দেবে।

আনিস চুপ করে থেকে বলে উঠল, আমাদের এক মুস্কিল হচ্ছে কেউ আমাদের মধ্যে উর্দু লিখতে জানে না। অথচ শতকরা পঞ্চাশ জনের বেশী এখানে উর্দুওয়ালা।

ক্যা তুম সমঝতে হো, হাম কুছ লিখাপড়া নহি জানতা?

খলিল এতক্ষণ দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিল।

তুমি কি করে এখানে এলে, শঙ্কিত হয়ে আনিস জিজ্ঞাসা করতেই আজাহারের চোখ দু'টো নত হয়ে পড়ল। অপরাধীর মত বলল, ছেলেটা বড় ভালো। পুলিসের হাত থেকে পালিয়ে ও ক'দিন আমাদের গ্রামে

গিয়ে পাট নিড়ানির কাজ নিয়েছিল. আমাকে দেখলেই বলত চাচা, হামারা আদমীলোককো কুছ খবর তুম জানতা ?

বোঝা গেল আজাহার খলিলকে সঙ্গে করে আনলেও এতক্ষণ ভিতরে ডাকতে সাহস করে নি। প্রসন্নবাবুর নির্দেশ মত গোপনতা রক্ষা করতে পারে নি বলে মনে সঙ্কোচ ছিল।

প্রসন্নবাবু আজাহারের দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে খলিলের দিকে তাকিয়ে পরিহাস করলেন, কী সব তৈয়ার ?

দেখিয়েগা সব ঠিক হো জায়েগা !

প্রসন্নবাবু খুশী হয়ে খলিলের ঘাড়ে চাপড় মারলেন, সাবাস ! এই তো মরদা কা মাফিক বাত !

অল্পতেই ঘরের মধ্যে কী রকম একটা উৎসাহের আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেল। আনিস আর আজাহারের মুখেও দেখা দিল হাসি।

প্রসন্নবাবু যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। একগাদা কাগজের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, কিছু কাগজ মরিয়ম বোনকেও দিয়ো, কেমন ? আর শোনো আমি নারায়ণ ব'লে একটি ছেলেকে এখানে পাঠিয়ে দেব। পড়াশুনায় বড় ভালো ছিল। কলেজে গণ্ডগোলের পর কিছুদিন গোপনে আছে। ও বলছিল রেলে কাজ করবে। ছেলেটার বাপ-মা সব নোয়া-খালির রায়টে মারা যায়। আর একটা ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। নিতান্ত অঘটন ঘটলে ওখানে খোঁজ করো।

পকেট থেকে ভাঙা পেন্সিল বের করতে দেখে আনিস ফাউণ্টেন পেনটা এগিয়ে দিল, কালি দিয়ে লিখুন !...আর ওটা আপনার কাছেই রেখে দিন ! আপনার লিখবার কিছুই নেই।

তাহ'লে তুমি লিখবে কি দিয়ে !

আমার চেয়ে আপনার লেখাপড়ার কাজ অনেক বেশী।

বেশ দাও ! পেনটায় বেশ ভালো লেখা হয় দেখছি !

আজাহারকে সঙ্গে নিয়ে প্রসন্নবাবু ধান আর পাট ক্ষেত ভেঙে গ্রামের দিকে রওনা দিলেন।

৬

ক্রমে পূতিগন্ধময় ওয়াগনগুলো আনিসের আস্তানা হয়ে দাঁড়াল। থাকতে যখন হবে তখন শ্রমিকদের মধ্যে থাকাই ভালো।

খলিলও তার ওয়াগনে ফিরে এসেছে। নতুন কোন লোক আর গ্রেপ্তার হয়নি। যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া পেয়েছে, আর কয়েকজনের নামে কেস্ চালানো হবে বলে শোনা যাচ্ছে। কোরবান রয়েছে এদের মধ্যে। খলিলকে আনিস বলল, আর পালিয়ে বেড়ানো নয়, কাজে রিপোর্ট করো। ডাক্তারী সার্টিফিকেট জোগাড় করা কিছুই শক্ত নয়।

কিন্তু এরসাদ একদিন খবর নিয়ে এল, আনিস আর খলিল দু'জনের নামেই ওয়ারেণ্ট।

এখানে আনিসের পরিচিত লোকের সংখ্যা কম, কিন্তু ঠিক বাতাসের মতই খলিলের আনাগোনা সর্বত্র। তাই রক্ষে, নইলে এখানে স্থান পাওয়া শক্ত। একমাত্র ইব্রাহিম নামে এক ড্রাইভার থাকে একলা একখানা গাড়ী দখল করে কিন্তু সাধারণ নিয়ম হচ্ছে বিবাহিত লোকের জন্য একখানা ওয়াগন। অবিবাহিত হলে আস্ত কামরা মিলবে না। অন্তত তাদের তিন চার জনকে থাকতে হয় একটার মধ্যে। অথচ মজা এই যে, এ রকম তিনচারটি লোকও এক সঙ্গে রান্না করে খায় না। প্রত্যেকের জন্য কামরার চার কোনায় চারটে মাটির চুলো, স্বতন্ত্র বাসনপত্র বালতি কড়াই! চারদিকে কোনাকুনি ভাবে টাঙানো চারটে দড়িতে ময়লা কাপড়চোপড়! এই সুখের বাসস্থানে আনিস বা খলিলের পক্ষে কোথাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদি বা জুটত, পুলিসের কথা স্মরণ রেখে তারা সে চেষ্টা তো করলই না, বরং রাতের পর রাত দিনের পর দিন বাসস্থান বদলাতে লাগল। সেটাই নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারাণ্টি।

এই অবস্থায় একদিন যার ওয়াগনে বসে পোষ্টার লেখা হচ্ছিল তার দুটি শিশু এবং বৃদ্ধা মা বর্তমান, বৌ কয়েক মাস আগে মারা গেছে টি-বি'তে। ফরিদের চেহারাটি যেমন সুন্দর, স্বভাবটি যেমন কোমল, হস্তাক্ষরও তেমনি ঝরঝরে। হ্যারিকেনের আলোর নীচে ফরিদ একেবারে উবু হয়ে পোষ্টার লিখছিল, এমন সময় কোথেকে খলিল এসে তার

পিঠে ধাক্কা দিল, পোষ্টার লিখনেসে কুছ নহি হোগা!

ফরিদ সোজা হয়ে বসে বিস্ময়ভরে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তব কিসসে হোগা!

আনিস খলিলকে তাড়া দিল, কেন ওকে বাধা দিচ্ছ! নিজের তো পোষ্টার লিখতে বসলেই গায়ে জ্বর আসে! খালি বড় বড় কথা।

খলিল প্রায় চিৎকার ক'রে উঠল, পোষ্টারে কিচ্ছু হবে না! খুন কা বদলা খুনসে লেনা হ্যায়।

বহুৎ গলৎ বাত। আদমীলোগোঁকো পহেলা এক করনা হ্যায়, সমঝানা হ্যায়, সংগঠন গড়না হ্যায়—

খলিল বাধা দিল, ও কভি নহি হোগা, আদমীলোগ কভি নহি এক হোগা।

যতদিন না এক হয় এক করার চেষ্টা করতে হবে।

খলিলের কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ ফুটে উঠল, আপ কিজিয়ে! হাম নহি করেগা! আকবর আলী ডি-এস-পি'কো জান হাম মিটা দেঙ্গে! বসির হামারা হাত পর মর গয়া! হাম ও ভুলনে নহি সকতা।

একটা ছোরা ঝকমক করে উঠল খলিলের হাতে।

আনিসের গলায় চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠল, খলিল!

খলিল ছোরাখানা আবার কোমরে গুঁজে বলল, দুনিয়ামে হামারা কোন হ্যায়। আব্বা নহি হ্যায়, আম্মা নহি হ্যায়, বহু নহি হ্যায়, বিটি নহি হ্যায়, জানকা হামারা পরোয়া ক্যা হ্যায়।

বলতে বলতে খলিলের চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল, মুখ ফিরিয়ে ওয়াগন থেকে নেমে চলে গেল।

ফরিদের বুড়ি মা প্রায় কোনো কথাই বোঝে নি, ঝগড়া মনে করে এবার এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, ফরিদ, তুম খলিলকো ক্যা বোলা?

আনিস হেসে জবাব দিল, কিচ্ছু বলে নি! ওর মেজাজটা বরাবর ঐ রকম।

বুড়ি হাসল, হাঁ মেজাজ শরীফ!

এমন সময় সামনের ওয়াগন থেকে ইব্রাহিমের অতি সুমিষ্ট কণ্ঠের গান ভেসে এল—রাত হামারা কাটে কৈছা পুছ আসমাকো সিতারা কো

পাছ, পুছো !

আনিস আর ফরিদ দু'জনেরই কথা থেমে গেছে মুখে। রাত সত্যি অনেক হয়েছে। অন্ধকারে এদিকের সমস্ত রেলওয়ে ইয়ার্ড আচ্ছন্ন। সিগনালের লাল আর নীল আলোগুলি সেই অন্ধকারকেই আরো গাঢ় করে তুলেছে। আকাশে ফুটেছে অজস্র তারা। সেই নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে ইব্রাহিমের কান্নাভরা ঐ এক লাইন গান বারে বারে তার কণ্ঠে যেন মাথা কুটে মরতে লাগল—রাত হামারা কাটে কৈছা পুছ আসমা কো সিতারা কো পাছ, পুছো ! আমার রাত কেমন করে কাটছে, আসমানের তারাগুলির কাছে তা জিজ্ঞাসা করো ! আনিস এক মুহূর্তের তরে আনমনা হয়ে গেল। সত্যিই আমার রাত কেমন করে কাটছে মরিয়ম কি তারাদের কাছে সে কথা জিজ্ঞাসা করছে এখন ?

ফরিদের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল ! আনিস জিজ্ঞাসা করল, কি হল !

কুছ নাহি !

দেখা যাচ্ছে বৌয়ের মৃত্যু ফরিদ আজো সহ্য করতে পারে না। আনিস তার কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, মৃত্যুকে কে ঠেকাতে পারে। দুঃখ করো না।

ফরিদ কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল, জানেন ঐ ইব্রাহিমের চরিত্র বলতে কিছু নেই, কিন্তু গান যখন গায় তখন পাগল করে দেয় !

ঘুম ভেঙে ফরিদের আড়াই বছরের ছেলে লাল্লু কান্না জুড়ে দিল। বুড়ী ছেলের কোলে নাতিকে এনে বসিয়ে দিয়ে বলল, লে দুসরা কিসিম গানা হোতা হ্যায় !

বুড়ীর পরিহাসপ্রিয়তায় আনিস না হেসে পারল না।

কয়েকদিন পর রহমান ওরফে নারায়ণ এসে হাজির হল। প্রশস্ত কপাল, মুখে অর্ধাহারজনিত কৃশতা, চোয়ালের হাড় খানিকটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, চোখ থেকে যেন একটা তীক্ষ্ন দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কিছু একটা করতে না পারলে সব সময় তার ভাব এই, কে বুঝি তার ফাঁকির জবাব চাইছে। ইচ্ছে করলেও মনের চঞ্চলতা ঢেকে রাখতে পারে না। দুনিয়াকে বদল করবার অসম্ভব ইচ্ছা। বাংলা-উর্দু ইস্তাহার

নিয়ে এসেছিল কিছু সঙ্গে করে। ক'দিন ঘুরে ঘুরে সেটা বিলি করার পর আনিসকে বলল, আসুন ইয়ার্ডের মধ্যে আমরা একটা সভা ডাকি!

বৈঠকেই লোক আসে কিনা আগে দেখুন!

আপনার এমন নিরুৎসাহের আমি মানে বুঝিনে!

আনিস উত্তর দিল, প্রথমত সভা ডাকা বিপজ্জনক, দ্বিতীয়ত লোক আসবে না।

আনিসের কথাই ঠিক। বৈঠকে জন চারপাঁচের বেশী লোক এল না।

নারায়ণের মুখের বিরসভাব কাটাবার জন্য আনিস বলল, এত অল্পতেই ঘাবড়াবেন না। চলুন ওয়াগনে ওয়াগনে ঘুরি, দেখবেন লোকে সাহায্যের জন্য টাকা পয়সা দিচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন দু'জনে ইব্রাহিমের ওয়াগনের সামনে এসে হাজির হল। জমিয়ে গানের আসর বসেছে। ঠিক ওয়াগনের সামনে দিয়ে যেভাবে ইঞ্জিন সাণ্টিং চলেছে তাতে অনেক ওস্তাদেরই মেজাজ নষ্ট হত, কিন্তু ইব্রাহিম নির্বিকার।

আগেও জানাশোনা ছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করতে ইচ্ছে হয়নি। আজ আনিস গাড়ীতে উঠে বলল, ইব্রাহিম ভাই কুছ গানা শুনাও!

ইব্রাহিম খুশী হল, জরুর!

অতিথিদের আসন দিয়ে মুখে পান পুরে হারমনিয়মটা টেনে নিয়েছে এমন সময় ইব্রাহিমকে চকিত করে দিয়ে আনিস গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল।

ওপারে কী করে লাল্লু গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে উঠে কাঁদতে কাঁদতে মাঝখানের রেললাইন পার হয়ে আসছিল এদিকে। আর একটা ইঞ্জিন ছুটে এসেছে ঠিক সেই সময়! কিন্তু আনিস বাঁচাতে পারল না। সে লাল্লুকে ধরার জন্য লাইন পার হওয়ার সুযোগই পেল না, ইঞ্জিনটা তার আগেই মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল ঝনঝন শব্দে।

কিন্তু জোর বরাত! লাল্লু ছিটকে গিয়ে কাঠ আর পাথরের উপর পড়ে শুধু নাকটা থেঁতলে ফেলেছে। শরীরের বাকী অংশ অক্ষতই আছে।

বুড়িমা গাড়ী থেকে নেমে ছুটে এসে লাল্লুকে কোলে নিয়ে যে

চিৎকারটা শুরু করল তার অর্থ, এই বয়সে আমাকে আর কত খাটাবে!

পরে আনিসের কাছে বলল, ফরিদ কো ফিন সাদী কো লিয়ে একঠো আচ্ছা লড়কী দেখো!

কিন্তু ও-সব কথা আনিসের মাথায় ঢুকছিল না। এই যে অল্পের জন্য লাল্লুর প্রাণরক্ষা পেল, সেটা ভাগ্যের জোরে। নইলে এই স্টেশন ইয়ার্ডে এমন কত দুর্ঘটনাই না ঘটেছে। কী করে শিশুদের ধরে রাখা যাবে চব্বিশ ঘণ্টা। অথচ চারপাশে ইঞ্জিন চলাচলের বিরাম নেই। অর্থাৎ এর প্রতিকারের কথা চিন্তা করলে ঘুরেফিরে সেই পুরাতন বাড়ী তৈরীর সমস্যাই সামনে আসছে। রেশনের সুব্যবস্থার কথাই বল, মাহিনা বৃদ্ধির কথাই বল, ছুটী কিম্বা মেডিকেল লীভের কথাই বল, ওয়াগনের তিনহাজার মানুষের কাছে তার মূল্য কতটুকু। মূল জীবনীশক্তিটাই যে নিঃশেষ হয়ে আসছে। গত দুইবছরে কণ্ট্রাকটর এবং অ্যাডমিনিস-ট্রেশনের কৃপায় ক'খানাই বা খড়ের ছাউনী আর দরমার বেড়া-দেওয়া বাড়ী উঠেছে। তা নিয়েও তো লাঠালাঠি মারামারি কাণ্ড। কিন্তু এ অবস্থায় ক্রমাগত বাস করে পরিবর্তনের চেষ্টাটাও কেমন ঝিমিয়ে আসে। তবু আনিসের নিজের ছেলেমেয়ে একটু ভালো বাসায় থাকে বলেই কি এত জীবন্ত সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও আনিস সমস্যাকে দেখতে পায় না? না, অনেক চেষ্টার ব্যর্থ পরিণতি দেখে এ-বিষয়ে সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে? কিন্তু মানুষের তো এমন কতকগুলো নিতান্ত বাঁচার প্রশ্ন থাকে যেগুলো বারেবারে উচ্চারিত হলেও মীমাংসা না হলে বারেবারেই ফিরে আসে। একঘেয়ে মনে হলেও মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না, সমাধান না হলেও হতাশ হওয়া চলে না।

রেলের লোকের জন্য দোকান চাই! গুলির প্রতিবাদ চাই! বন্দীদের জন্য সাহায্য চাই! পোস্টার পড়তে লাগল। বৈঠকে লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, খলিল আবার ফিরে এল। আনিস নারায়ণকে কয়েক-দিন পর জিজ্ঞাসা করল, বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে একটা গণদরখাস্তের ক্যাম্পেন করলে কেমন হয়? আপনি কি মনে করেন?

আমাকে তুমিই বলবেন!

হাজার হলেও আপনারা কত বেশী লেখাপড়া জানা লোক!

আবার!

আনিস হেসে ফেলল, বেশ তুমিই বলব! কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না তো!

দেখুন, দরখাস্ত টরখাস্ত আমার ভালোও লাগে না, কিছু ও-দিয়ে হবে বলেও মনে হয় না, আর তা'ছাড়া ট্রান্সফারের প্রশ্নটা সামনে এসে যাচ্ছে। কোন লোকের একটু গন্ধ পেলেই তাকে সরিয়ে দিচ্ছে!

লাল্লুকে কোলে নিয়ে বুড়িমা এসে আলোচনার মাঝখানে বাধা দিল, তোমরা নিজের কথাই খালি বল! আমাকে একটা বৌ এনে দাও। ফরিদ কাজে গেলে দু'টো বাচ্চাকে আমি সামলাই কি ক'রে!

নারায়ণ হেসে ফেলল, নিন আন্দোলনের বদলে এবার ঘটকালি করুন।

আনিস উত্তর দিল, সব কাজই করতে হয়! তোমরা তো বিয়ে সাদী করলে না, কি বুঝবে!

বুড়ি শেষে আনিসকে অস্থির করে তুলল। যখনই দেখা হয় তখনই ঐ এক কথা। ফরিদেরও দেখা গেল তত আপত্তি নেই। ছেলেমেয়েকে সামলানো দরকার, আর একটা বৌ না হলে তাদের মত লোকের চলেই বা কি ক'রে। আশ্চর্য! ওয়াগনের অন্ধকারের মধ্যে বিয়ের ফুলও কম ফুটছে না।

সেই যে বসির বহুদিন আগে আম্মার অসুখের সময় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল আর আম্মা পাত্র দেখে দিতে বলেছিলেন সেটা আনিসের মনে ছিল। কিন্তু দোজবরের হাতে পড়বে ঐ আফসরী মেয়েটা এটা তার ভাল লাগছিল না বলেই বুড়ির কথায় এতদিন গা করেনি। ফরিদ অবশ্য ভাল ছেলে। দেখা যাক কী হয়, ওদের অচল সংসারে আম্মা কোনো রকমে নিষ্কৃতি পেলেই তাকে হাত তুলে দোয়া করবে।

একদিন সন্ধ্যার পর আনিস এসে আম্মার ওয়াগনের কাছে দাঁড়াল। ভিতরটা নিঃশব্দ। আলো জ্বলছে না। ডাকাডাকি করার বদলে আনিসের মনে হল ফিরে যাই আজ, তার ভালোও লাগছে না। মরিয়মকে সে একদিন বলেছিল তুমি মরে গেলে আমি বিয়ে করতে পারি তুমি বিশ্বাস করো! সেই আনিস ঘটকালি করতে এসেছে এমন একজনের জন্য যে হয়ত তারই মত বৌকে ভালবাসত এবং এই জন্তুর জীবন যাপন

করেও যার চোখ দিয়ে পানি পড়ে। তবু মানুষ প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে কই! আর সব চেয়ে মজা, ফরিদের এই বিয়ে করার চেষ্টাটা তার কাছেও অশোভন লাগছে না, নিষ্প্রয়োজনও মনে হচ্ছে না!

আনিস ডাকল, আম্মা!

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আরো জোরে ডাকল, আম্মা!

এবার ভিতরে নড়েচড়ে ওঠার আভাষ পাওয়া গেল।

ক্ষীণ কণ্ঠের আহবান এল, বেটা, অন্দরমে আও।

দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে আফসরী একটা কুপী ধরিয়ে আড়ষ্ট হয়ে ওয়াগনের এক পাশে গিয়ে বসল। আনিস তাকিয়ে দেখল, আম্মা এক পাশে শুয়ে আছে, আর সমস্ত ওয়াগনটা ফাঁকা! সে জিজ্ঞাসা করল, এরা সব গেল কোথায়!

অনেকক্ষণ আম্মা কোনো কথা বলতে পারল না। দুর্বল শরীরটা তার কান্নার আবেগে কেবল ফুলে ফুলে উঠছে। শেষে অনেক কথার ভিতর দিয়ে কাহিনীটা প্রকাশ পেল। নাসির বৌ-ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটা কোয়ার্টারে উঠে গেছে। আর আফসরী হয়েছে অন্তস্বত্তা!

নবী বক্সের কথায় নাসির বোনকে স্টেশন মাস্টার ইয়াকুব বুরহানীর বাসায় আয়ার কাজ করতে পাঠায়। ফলাফল এবং উদ্দেশ্য নাসির না বুঝতে পারলেও নবীবক্সের কিছুই অজানা ছিল না। ইয়াকুব বুরহানীর দৌলতে নবীবক্স অ্যাসিসটেণ্ট ফোরম্যান হয়েছে আর নাসিরও একটা বাসা পেয়েছে। পিছনে মা আর বোনকে ফেলে রেখে গেছে।

ইয়াকুব বুরহানীর বৌ টের পাওয়ার পর আফসরীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাতে বুরহানি সাহেবের আপত্তিরও কোনো কারণ ঘটেনি। হাতে আছে নবীবক্স আর ওয়াগনের বহু মেয়ের উদরে আছে ক্ষুধার জবালা।

আফসরী মুখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আনিসের মুখে কথা সরল না! কি বলবে সে। ঐ মেয়েটার জন্যই যে সে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল আজ।

আম্মা, আজ আমি যাই! পরে আবার আসব।

আম্মা প্রায় হাউমাউ করে উঠল, বাবা আমাদের একটু দেখো! ফেলে যেয়োনা বাবা আমার! আজ যদি আমার বসির থাকত!

আনিস উঠে দাঁড়াল শক্ত হয়ে, এখানে সে আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারছে না। এ যে বসিরের মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। আফসরী অন্ধকারে কুপিটা উঁচু করে ধরল আনিসের ওয়াগন থেকে নামার সুবিধার জন্য। কিন্তু তখনও আনিস তাকাতে পারল না ঐ মেয়েটির মুখের দিকে।

কতক্ষণ যে আনিস হনহন ক'রে হেঁটেছিল সে খেয়াল তার ছিল না। একেবারে বাজারের কাছে এসে হুঁশ হলে আবার ওয়াগনের দিকে ফিরে গেল। পথে নারায়ণ তাকে থামিয়ে বলল, আনিসদা বৌদি একবার আপনাকে যেতে বলেছে!

আনমনা আনিস জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে!

বৌদি আপনাক যেতে বলেছে!

কে বৌদি! মরিয়ম?

হ্যাঁ! কিন্তু আপনার কি হয়েছে বলুন তো!

আনিস পাল্টা চার্জ করল, তোমাকে বলেছি না, বৌদি নয় ভাবী বলবে? দাদা নয় ভাই বলবে, জল নয় পানি বলবে, স্নান নয় গোসল বলবে। তোমার মত মুখ-আলগা লোককে এদের চিনে ফেলতে কতক্ষণ?

নারায়ণ অপ্রতিভ হল, বলল, ভুল হয়ে গেছে! ভাবী আপনাকে যেতে বলেছে একবার, কেমন হ'ল ত!

আনিস দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলল, তোমার যে বড় ঘন ঘন ভাবীর কাছে যাতায়াত।

আমাকে ভাবী আজ নাড়ু আর পিঠে খাইয়েছে।

সেই লোভে লোভেই যাও বুঝি!

আনিস ভেবে পেল না কোত্থেকে মরিয়ম এসব জোগাড় করেছে।

সারাপথ আফসরীর কথা ভাবতে ভাবতে আনিস বাড়ী পৌঁছল। মরিয়ম শুনলে কি বলবে? কি পরামর্শ দেবে আফসরী সম্পর্কে?

প্রথমেই মরিয়ম রাগ করে বলল, যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

ব্যস্ত ছিলাম যে!

কাজ আর কাজ! কাজ বুঝি আমরা করিনে!

তোমার মুখ থেকে এমন কথা আশা করিনি মরিয়ম!

মরিয়ম চোখে আঁচল দিল, এ-সময় তুমি কাছে না থাকলে আমি যে পারিনে।

ভাবী জননীর চোখ মুছিয়ে আনিস বলল, দাও তোমার পিঠে দাও!

আমার পিঠে নয়, বাপজান বাড়ী থেকে পাঠিয়েছে।

আচ্ছা মরিয়ম, এ সময় তুমি মার কাছেই যাওনা! তাতে ভালো হবে। আমি থাকি বাইরে বাইরে।

একটু নিশ্চুপ থেকে মরিয়ম বলল, না আমি তোমাকে ডেকেছি অন্য কারণে। এরসাদ সুলতানের একটা চিঠি দিয়ে গেছে। বলেছে আর কেউ যেন না খোলে।

খামখানা খুলে একটু চোখ বুলিয়েই আনিস বসে পড়ল মাটিতে।

মরিয়ম ভয় পেয়ে বলল, কী হল!

আনিস চিঠিখানা এগিয়ে দিল নিঃশব্দে। মরিয়ম পড়তে লাগল মনে মনে—প্রিয় কমরেড, আপনাকে এক মর্মান্তিক খবর জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের প্রসন্নদা আর নেই! ইদানিং অমানুষিক খাটুনি, চিন্তা আর অনাহার-অর্ধাহারে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। গতরাত্রিতে খাওয়াদাওয়ার পর একটা বই খুলে পড়তে বসে হঠাৎ হার্টফেল করেন। তাঁর মুখে কোন যন্ত্রনার চিহ্ন ছিল না। শুধু খোলা বইয়ের পাতার উপর রক্তের দাগ আছে, বোধহয় নাক থেকে দু' ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছিল। কী বলব, প্রসন্নদাকে আমরা শ্মশানে পোড়াতে পারি নি। জানেন তো এখানে গ্রামগুলোতে আনসারদের কী উৎপাত, আর কৃষকরাও অনেকেই আমাদের বিশ্বাস করে না এখনো। ক'জনকে তারা কয়েক মাস আগে ধরিয়ে দিয়েছে পর্যন্ত। তাই জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি আর খুরশীদ প্রসন্নদাকে গভীর রাত্রিতেই একটা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাই। প্রসন্নদাকে কবর দিয়ে এসেছি! তাকে কবর বলা ভুল হবে, মাটি খুঁড়ে পুঁতে রেখে এসেছি। পুলিসের অনেকদিন ধরেই ধারণা থাকবে প্রসন্নদা বুঝি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদেরও ধারণা, প্রসন্নদা মরে নি, মরতে পারে না...

অনেক চেষ্টা করেও মরিয়ম শেষের কটা লাইন পড়তে পারল না। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে মুছে গেছে কালির অক্ষর! গোপন রাত্রির অন্ধকারে প্রসন্নদা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গেছেন। এত বড় একটা প্রাণ যে এ-দেশে ছিল সে কথা আগেও দেশের লোক জানত না, আর আজ যে নিভে গেল সে কথাও কেউ টের পাবে না।. যাদের জন্য প্রসন্নদা কাজ করেছেন তাদের ভয়েই প্রসন্নদাকে মরার পরেও প্রকাশ্য বিদায় দেওয়া যায় নি। যে-মানুষকে ভালবেসে প্রসন্নদা পাকিস্তান ছাড়েন নি, তারাই তাকে দুষমন বলে মনে করেছে। অথচ তাদের মতই প্রসন্নদা মরার পরে শ্মশানে না গিয়ে কবরে গেলেন। সে কবরও একদিন ওরা ভুল করে পায়ে মাড়িয়ে যাবে। একদিন প্রসন্নদা চার পাঁচশ' লোকের আক্রমণের মুখে বলেছিলেন, আমাকে মারতে পারো কিন্তু এ রক্তপতাকা নামাতে পারবে না, আর আজ মরার সময় নাক থেকে ঝরে পড়া দু'ফোঁটা রক্ত দিয়ে তাকে আরো লাল করে গেলেন! এ পতাকার কোন জাত নেই আর প্রসন্নদারও বোধ করি কোন জাত ছিল না।

কতক্ষণ যে আনিস আর মরিয়ম পাশাপাশি বসেছিল কেউ খেয়াল করে নি। ক্রমে রাত নিস্তব্ধ হয়ে এল। বারোটার ট্রেন ঝন ঝন শব্দে মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি খেয়াল না রেখে রোজকার মতই সময় রক্ষা করে দূরে মিলিয়ে গেল। মরিয়ম নিজেকে শান্ত করে আনিসের পিঠে হাত দিয়ে বলল, তুমি না পুরুষ মানুষ, তোমাকে কাঁদতে নেই।

আনিস উঠে দাঁড়াল। সেই আফসরী মেয়েটার কথা আর সে মরিয়মকে বলতে পারল না, শুধু শক্ত করে বারান্দার খুঁটিটা ধরে তাতে মাথা ঠেকিয়ে অস্ফুট স্বরে ডাকল, প্রসন্নদা!

৭

ভরসা হয় নি, তবু ফরিদকে সব কথা শুনিয়ে আনিস জিজ্ঞাসা করেছিল, এখন তুমিই বল কী করা যায়? কফিলুদ্দিন আর বসিরের পরিবারের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো?

কর্তব্যকে স্বীকার করলেও আফসরীকে ঐ অবস্থায় নিজে বিয়ে করার কোনো আগ্রহই ফরিদের ছিল না।

আকাশ পাতাল অনেক ভেবেও আনিস টের পেল না কী সমাধান। খলিল প্রায় বাউণ্ডুলে ধরণের, তা' ছাড়া তার কথাই ওঠে না এ অবস্থায়। ইব্রাহিমের যা চরিত্র তাতে তাকে কিছু বলতে যাওয়া অন্যায়, বললেও সে হেসে উড়িয়ে দেবে। আর যারা আছে তাদের সম্পর্কে কিছু ভাবাই যাচ্ছে না। অথচ দু'টি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় মেয়ে ওয়াগনের এই পরিবেশে থাকবেই বা কী ক'রে, খাবেই বা কী।

নারায়ণ বলল, এরসাদ যদি রাজী হয়, ওদের বাড়ীতে রেখে দিন। কাজও করাবে, সাহায্যও হবে।

কিন্তু এরসাদের বাপ রাজী হবে না।

নারায়ণ হাসল, বাপ তো হাসপাতালে, যায় যায় অবস্থা!

একটু চুপ থেকে আনিস বলল, চল এরসাদের বাড়ী ঘুরে আসি।

এরসাদ ঘরেই ছিল, আগন্তুক দু'জনকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা এ বাড়ীতে এলেন?

আনিস তাকে আশ্বস্ত করল, একদিন এলে কোনো ক্ষতি হবে না!

লণ্ঠনের আলো কমিয়ে এরসাদ বলল, বসুন, চায়ের কথা বলে আসি!

ফিরে এসে নিজের কথাই বলতে সুরু করে দিল, আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম! জানেন বোধ হয় বাপ হাসপাতালে, মা অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করছেন বিয়ে কর! আমি আর পারিনে, চব্বিশ ঘণ্টা ঘ্যানর ঘ্যানর করছে, কী করি বলুন তো!

আনিস কিছু বলার আগেই নারায়ণ ঝট করে উত্তর দিল, যে কাজ সুরু করেছেন তাতে এ-সময় আপনার বিয়ে করা ঠিক হবে না! আনিস মনে মনে বলল, একজনের জীবনের প্রশ্ন, আর একজনের সংসারের সমস্যা, একজনকে উদ্ধার করা যাচ্ছে না, আর একজনকে বিয়ে দেওয়ার জন্য সব কিছুই প্রস্তুত, তবু আফসরীকে এরসাদ গ্রহণ করতে পারবে না।

আনিস এরসাদকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নিজের কী মত?

আমার মোটেই মত নেই! কিন্তু মায়ের কান্না সহ্য করতে পারিনে!

আনিস হেসে ফেলল, তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেল!

আফসরীর সমস্ত কথা শুনে এরসাদ বলল, মনে হয় না মা ওকে কাজের লোক হিসাবে রাখতে রাজী হবে। ভারী সন্দেহপ্রবণ মন। আর

বাড়ীর কাজ করার লোকের তো অভাব নেই। তবে আমি চেষ্টা করব মাকে রাজী করাতে।

এরসাদের উত্তাপহীন কথাবার্তার ধরণে আনিসের আর বেশী কথা বলার ইচ্ছা ছিল না, উঠতে যাবে এমন সময় ভিতর থেকে এল চা, আর বাইরে থেকে কড়া নাড়ার শব্দ!

চায়ের বাটি শুদ্ধ পাশের ঘরে সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলতেই এরসাদের সামনে এসে দাঁড়াল আই-বি ইন্সপেক্টার সোনাউল্লা! ছাগলের মত কয়েক গাছা দাড়িতে হাত দিয়ে কোমল স্বরে বলল, আপনার কোনো কাজের ক্ষতি করলাম না তো।

করলেই বা কী। বসুন।

সোনাউল্লা কথা পাড়ল, জানেন তো ন্যাশনাল গার্ড ভেঙেগ দেওয়ার পর আনসার বাহিনী তৈরী হচ্ছে।

সে কথা আর কে না জানে।

সোনাউল্লা এরসাদের হাত চেপে ধরল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা আপনি ক্যাপ্টেন হবেন আবার। দেখছেন তো কী রকম কমিউনিস্ট উৎপাত বেড়েছে।

বুক-পকেটে-রাখা খামে ভরা একখানা চিঠি এরসাদের কাছে যেন তপ্ত অঙ্গারের মত মনে হচ্ছে, সুলতানের চিঠিখানা আনিসকে এখনো দেওয়া হয়নি। আর পাশের ঘরে যে দু'জন বসে সব কথা শুনছে এবং সোনাউল্লা যাদের খোঁজে বিশেষ করে এ-এলাকায় প্রেরিত হয়েছে, তারা সকলে মিলে যেন এরসাদের মাথায় উত্তেজনার উন্মাদ নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। সে ঠাণ্ডা গলায় সোনাউল্লার কথায় সায় দিতে চেষ্টা করল, উৎপাত বাড়লে বেড়েছে! কিন্তু ক্যাপ্টেন হওয়ার বাসনা আর নেই। বাপজান ক্ষেপে উঠেছেন, হয় পড়তে যা, না হয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। কি আর করি বলুন, খাই-দাই আর ঘুমোই।

সোনাউল্লার মুখে তির্যক হাসি খেলে গেল, কিন্তু আমরা তো ঘুমাই না! আমাদের ফুরসৎ কই, কেবল পরের পিছনে ঘুরে মরাই আমাদের কাজ। এ-সব কী আমাদেরও ভালো লাগে! চাকরী! চাকরী বুঝেছেন! নইলে আপনার উপর নজর রাখত কোন শালা।

ক্ষণেক চুপ করে থেকে এরসাদ জিজ্ঞাসা করল, যদি আমার উপর এতই সন্দেহ তাহলে কেন আনসার বাহিনীর ক্যাপ্টেন হতে বলছেন ?

কারণ আপনাকে দিয়েই সবচেয়ে ভালো কাজ হবে।

চমকে উঠল এরসাদ। এরা তাকে দিয়ে বেইমানী করাতে চায়। না, নারায়ণের কথাই ঠিক, এ অবস্থায় বিয়ে করা তার পক্ষে উচিত নয়, প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়েও এদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে তাকে।

বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় ভেবে এরসাদ তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান লাগাল। প্যাকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে সোনাউল্লা বলল, একটা নিতে পারি ?

নিশ্চয়ই! আপনাদের নেকনজরের গুণেই তো আমাদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে!

সোনাউল্লা জিভ কাটল এবং কণ্ঠে তার অনুযোগ এবং কুণ্ঠার ভাব ফুটিয়ে তুলল, ছিঃ। কী বলছেন আপনি! বলেছি তো এ যে আমাদের চাকরী! আপনার মত ঘরে জন্মালে কী এ চাকরীতে ঢুকি। কিন্তু আমি ভেবে পাই না, সব থাকতেও কেন আপনি এদিকে এলেন।

এরসাদ ভ্রূ কুঁচকাল, এদিকে এলাম! কী বলতে চান আপনি ?

সোনাউল্লা বিজ্ঞের হাসি হাসল, আনিসের বাড়ীতে তো আপনাকে মাঝে মাঝে যেতে দেখি। বলতে পারেন কোথায় আছে ? ইচ্ছে করলে নিশ্চয় পারেন।

এরসাদের আপাদমস্তক কেঁপে উঠল, ভাগ্যিস হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় তা সোনাউল্লার চোখে পড়েনি। সামলে নিয়ে এরসাদ সোনাউল্লার দিকে একগুচ্ছ চাবি এগিয়ে দিল, নিন আমার স্যুটকেশ বাক্স খুঁজে দেখুন, নিশ্চয়ই সেখানে লুকিয়ে আছে!

আপনি কেন ঠাট্টা করছেন ?

ঠাট্টা কেন করব, আপনারা শর্ষের মধ্যেও যে ভূত দেখেন।

সোনাউল্লা মিনতি করল, দোহাই আপনার, গরীবের উপর চটবেন না। আপনি জানেন বলেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি। জানেন আপনি অনেক কিছুই, আমি শুধু একটার কথাই জিজ্ঞাসা করছি। নিন একটা সিগারেট খান।

এরসাদ হাত গুটিয়ে রেখে বলল, সিগারেট নয়, আপনার মাথা চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে আমার। হাজার বার এক কথা কেন বলছেন। আপনারা লোককে পাগল না ক'রে দিয়ে ছাড়বেন না দেখছি। আপনি দয়া করে এখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাকে একটু স্বস্তি দেবেন কি?

সোনাউল্লা এবার সুর যথাসাধ্য মোলায়েম করে ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করল, জানেন তো আপনার চাচাতো বোনের বিয়ে হয়েছে আমার খালাত ভাই আরিফের সঙ্গে।

আত্মীয়তার এই চেষ্টায় এরসাদ হেসে উঠল, আপনি পরমাত্মীয় বৈকি, নইলে এমনভাবে গায়-পড়ে কেউ আলাপ করতে আসে।

দেখুন বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছে। রেলের গণ্ডগোলের জন্যই আমাকে ওরা এখানে পাঠিয়েছে। নইলে এ জায়গা কি আমার ভালো লাগে। অবস্থা ঠাণ্ডা হলেই আমি বাঁচি। এখানে থাকে কোন শালা।

এরসাদ জিজ্ঞাসা করল, ক'টা বাজল আপনার ঘড়িতে?

সোনাউল্লা ঘড়ি দেখে বলল, সাড়ে আটটা! ভয় নেই আমি আর বেশীক্ষণ বসব না। আপনার কোথাও যাওয়ার সময় হল না কি?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার?

না, আপনাদের তো সময় মেপে বেরুতে হয়, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। যাক্ চলি তা'হলে। আনিসকে খুঁজে আমি বের করবই।

এক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সোনাউল্লা বলল, আনিস লোকটা ছিল ভালো, ওর বাপ-শ্বশুরকেও চিনি আমি। এমন সুন্দর বৌ তার। তিনবার সার্চ করতে গিয়ে তো দেখলাম। এমন খুবসুরত মেয়ে লোক আমি খুব কম দেখেছি। অথচ সেই বৌ ফেলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়! আমরা হলে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে—

সোনাউল্লার জিভ দিয়ে যেন জ্বলন্ত কামনার লালা ঝরতে লাগল।

আই-বি'টা বেরিয়ে গেলে আনিস আর নারায়ণ এ-ঘরে এসে দাঁড়াল। সব কথাই ওদের কানে গিয়েছিল, নারায়ণ বলল, আমারই ইচ্ছে করছিল, লোকটার গলাটা টিপে ধরি।

উত্তেজিত এরসাদ বলল, আনিস ভাই আমাকে অন্য কাজ দাও।

নারায়ণ হেসে ফেলল, তাহলে তো আপনি সোনাউল্লার পথই পরিষ্কার

করবেন। তার চেয়ে বরং জোরসে ফুটবল-ক্লাবটাবের মধ্যে লেগে পড়ুন।

কিন্তু ওরা যদি বারেবারে বিরক্ত করতে আসে?

নারায়ণ নাটকীয় ভঙ্গীতে উত্তর দিল, তা'হলে বলবেন পুলিশ স্বর্গ, পুলিশ ধর্ম, পুলিশই পরমন্তপ, পুলিশই প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বমন্ত্রী।

মন্ত্র উচ্চারণ শুনে এরসাদও হেসে ফেলল, আপনি নিশ্চয়ই হিন্দু।

নারায়ণ ছেলেমানুষের মত ঘাড় বাঁকাল, আপনিও যে পুলিশের মতই সন্দেহপ্রবণ! বৃথা ঔৎসুক্য আপনার কাজের পক্ষে অন্যায়।

আর বাক্য ব্যয় না করে আনিস নারায়ণকে ধাক্কা দিল, চল!

রেলওয়ে ক্রসিং-য়ের কাছে এসে সে বলল, তুমি একটু এগোও, আমি বাড়ীটা ঘুরে আসি।

আনিস যখন চলে গেল তখন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নারায়ণ। আশ্চর্য এই, এমন অবস্থার মধ্যেও সে আনিসের প্রতি কেমন একটা ঈর্ষা অনুভব করছে! আনিসের বৌ আছে, ছেলে আছে, মেয়ে আছে, বাপ আছে, শ্বশুর আছে, তার যে কিছুই নেই। সত্যি কথা, আনিস দুঃখের মধ্যে পড়েছে, আধবেলা খাওয়া জুটছে না বাড়ীতে, আর পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সংসার আরো তচনচ হয়ে যাবে, কিন্তু তবু তো আনিস জীবনের একটা অংশ ভোগ করেছে, প্রিয়তমার বাহু বন্ধনের সুখ পেয়েছে, পিতৃত্বের আস্বাদ জেনেছে, তারপর যদি মরেও যায় তা'হলেও বলতে পারবে না পৃথিবী তাকে কিছুই দেয় নি। নারায়ণ মনে মনে শিউরে উঠল, এ আমি কী সব ভাবছি! আমার মন এত কঠিন এত নীচ হয়ে গেল কেন! আগে সামান্য দুঃখ দেখলেই কাতর হয়ে পড়তাম, আর এখন মৃত্যু দেখলেও চোখের জল বেরোয় না। এ পাষাণ হৃদয় আর কোন দিন কি আগের মত নরম হবে না!

সে ওয়াগনগুলোর দিকে হাঁটতে সুরু করল। হঠাৎ নিজের প্রতি তার মমতা জেগে উঠল। সত্যিই তো আমি কী পেয়েছি! বাপ-মা ভাইবোনকে হারানো, দাঙ্গা, কলেজ থেকে বিতাড়ন, ছন্নছাড়ার জীবন, পটের পর পট পরিবর্তন! যদি আমার প্রতি সমাজের এই নিষ্ঠুরতায় আমার মনটা মাঝে মাঝে পাল্টা নিষ্ঠুরতা করে বসে তাকে যেন কেউ

দোষ না দেয়।

শুধু একজনের একখানা মুখ নারায়ণের মনের উপর পেলব স্পর্শ দিয়ে যায়। সরমা কোলকাতা চলে যাওয়ার আগে বলেছিল, আর যদি দেখা না হয়, তুমি আমাকে স্মরণ রাখবার মত কিছু দাও! বিচ্ছেদের হাহাকারের মধ্যে বাহুবন্ধনের নিবিড় আরামে এক মুহূর্তের জন্য মাত্র সমস্ত দেহমন অবশ হয়ে এসেছিল। শুধু সেই চুম্বনের কথাটাই বারে-বারে মনে পড়ে। কয়েক মাস আগে সরমার পাশের খবর এসেছে। সরমা ক্রমান্বয়ে বিদ্যা আর বুদ্ধিতে উপরে উঠে যাবে, একদিন তার মত মূর্খের সঙ্গে দেখা হলে হয়ত মুখ ফিরিয়ে নেবে, কিম্বা ইচ্ছে করলেও আর খাপ খাওয়াতে পারবে না। হয়ত জীবনে আর দেখাই হবে না।

মনের মধ্যে একটি চুম্বনের চিত্র আঁকতে আঁকতে নারায়ণ ফরিদের ওয়াগন থেকে আঠার বালতি আর পোষ্টার নিয়ে অন্ধকারে এগিয়ে গেল। শুধু মাঝে মাঝে তার মনে হতে লাগল, জীবনে কর্কশতা যত বাড়ে, ততই বাড়ে কোমলতার প্রতি আকর্ষণ। নইলে কাছে থেকে সরমার উপস্থিতিতে যত বেশী মাধুর্য সে না পেয়েছে, দূর থেকে তাকেই এতবড় সঞ্জীবনী সুধা বলে কী করে মনে হচ্ছে। অথচ সরমা নিজেও জানে না এবং জানলেও বিশ্বাস করবে না যে, তারই স্মৃতি আর একজনের জীবনে বেঁচে থাকার শক্তি জোগাচ্ছে। হঠাৎ আনিসের জন্য ভারী মায়া হল নারায়ণের! আহা ওরা সুখী হোক! পৃথিবীর কোলে মানুষকে যেন কেউ প্রিয়তমার বাহুবন্ধন থেকে ছিঁড়ে না নিয়ে যায়!

পোষ্টার সেঁটে শ্রান্ত হয়ে খানিক পরে নারায়ণ ইব্রাহিমের ওয়াগনে এসে বসল। এত পোস্টার সেঁটেই বা কী হবে, অধিকাংশই অক্ষত থাকে না। ক'দিন ধরে একদল লোক প্ল্যান করে ভোর না হতেই ছিঁড়ে দিচ্ছে টেনে টেনে। রেলওয়ে ক্রসিংয়ের ঠিক উল্টো দিকে শ'খানেক আর্মড পুলিশের ছাউনি পড়েছে।

ক্লান্তকণ্ঠে নারায়ণ অনুরোধ জানাল, ইব্রাহিম ভাই একটা গান শুনাইয়ে!

ইব্রাহিম এদিক ওদিক তাকিয়ে গান গাইতে অস্বীকার করল, আজ গানা নহি হোগা। আজ আপনি চলে যান রহমান সা'ব।

কথার সুরে নারায়ণ চকিত হয়ে বলে উঠল, কী ব্যাপার ?

হঠাৎ দেখা গেল ওয়াগনের সামনে গোটা তিনেক মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ! সেদিকে নারায়ণের দৃষ্টি পড়তেই ইব্রাহিম লজ্জিত হয়ে বলল, আপনি বুঝলেন না তো হামি কী করব !

নারায়ণ না পারল কথা বলতে, না পারল গাড়ী থেকে নেমে পালাতে। মেয়েক'টি সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ইব্রাহিম ইসারা করল, এখন যা !

একটী মেয়ে এগিয়ে এসে পরিষ্কার গলায় জানাল, আমাকে আবার ওদের সঙ্গে গ্রামে ফিরতে হবে।

ইব্রাহিম ধমক দিয়ে উঠল, ভাগো আভি !

বোকার মত ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে মেয়েক'টি গা ঢাকা দিল।

নারায়ণের সামনে হাতেনাতে ধরা পড়ে ইব্রাহিমের কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে চাপা-সঙ্কোচ ভেঙ্গে পড়ল ! বেপরোয়া ভাবে সে বলল, আপনাদের তো আবার এসব চলে না। ঐ যে দূরে দোতলা বাড়ী দেখছেন, ওখানে আছে আপনাদের জন্য। টাকা বেশী লাগে ! গিয়েছেন তো দো চার দফা।

এমন অতর্কিত আক্রমণের সামনে কী ভাবে যে ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা বলবে ঠিক করতে না পেরে নারায়ণ শুধু মাথা দুলিয়ে 'না' 'না' করতে লাগল। সমঝদারের ভঙ্গিতে হো-হো করে হাসল ইব্রাহিম, ওরকম অনেকে বলে থাকে। ঘাবড়াইয়ে মৎ। একটাকে ডেকে দি ?

নারায়ণের আপাদমস্তক শিউরে উঠল, চট ক'রে দাঁড়িয়ে বলল, এখন আমি যাই !

গাড়ী থেকে সে নেমে এল, কিন্তু মনের মধ্যে কাঁপুনি আর থামতে চায় না। একটু সামনে হাঁটতেই চোখে পড়ল আরো কতকগুলি মেয়ে এদিকেই আসছে। সবই চাষীঘরের মেয়ে। আগেও এখানে এমন অনেক মেয়েকেই সে সন্ধ্যার অন্ধকারে চলাফেরা করতে দেখেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তখন তার কিছুই মনে হয়নি। সে স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছিল যে ওরা সবাই ওয়াগনের বাসিন্দা, অন্ধকারের আবরণে পর্দা বাঁচিয়ে শুধু মাত্র একটু চলাফেরার স্বাধীনতা ভোগ করছে। কিন্তু আনিস কিছুই তাকে কেন বলে নি ? সত্যিই তো গ্রামে চালের দাম চল্লিশ টাকার উপর উঠেছে। লোকের হাতে কাজ নেই। বহু হতভাগিনী

নিরুপায় হয়ে এখানে এসে ভীড় জমিয়েছে। অবাঙালীদের ভাষা তারা জানে না। কিন্তু তাতে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর সর্বত্র ক্ষুধার একই ভাষা, যৌনলালসারও এক ভাষা। যত সে উন্নত হয়েছে, বিচিত্র হয়েছে, ততই তার ভাব হয়েছে ঐশ্বর্যশালী, ভাষা হয়েছে বিচিত্র।

হঠাৎ একটা চিন্তায় নারায়ণের মাথাটা দপদপ করতে লাগল। ইব্রাহিমের নিঃসঙ্গ ওয়াগনটা কী ঐ কাজেই আরো অনেকের জন্য ব্যবহৃত হয়? নিশ্চয়ই তাই! সেই জন্যই ওখানে এত ভীড়! শুধু গানের লোভেই লোক আসে না। একদল সঙ্গী না পেলে ইব্রাহিমের শত সাহস সত্ত্বেও সাধ্য ছিল না একা একা কামরাখানা দখল করে রাখে। কী কদর্য জীবন! এই শ্রমিকদের জন্যই কি নারায়ণ সরমাকে পর্যন্ত ত্যাগ করে এসেছে! অথচ যাদের জন্য এই ত্যাগ তারা কিন্তু ভোগের গ্লানিময় তলানিটুকু পেলেও ছাড়তে চায় না!

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে নারায়ণ যাচ্ছিল আনিসের সন্ধানে আফসরীদের ওয়াগনের দিকে। ইব্রাহিম ডাকল, রহমান সাব, থোড়া শুনিয়ে না ইধর! আজ গানা হোগা! নজম হোগা! গজল ভি হোগা!

এড়াতে না পেরে নারায়ণকে গাড়ীতে উঠে আসতে হল। না উঠে উপায় কি, এদের নিয়েই তো কাজ করতে হবে। ইব্রাহিম একটা বিড়ি বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, রহমান সাব, আপনি আমাকে নিশ্চয় খুব ঘৃণা করছেন। আপনারা সব ভালো লোক আছেন।

নারায়ণ বাধা দিল, না, না, ঘৃণা করব কেন?

ইব্রাহিম সে কথা কানে না তুলে বলল, করুন ঘৃণা! কিন্তু কি লিয়ে থাকব বলুন! আমার বাড়ী ছিল বিহারে। বাপ ছিল, মা ছিল, জরু ছিল, দোঠো লড়কা ভি ছিল—তো রায়টে সব হিন্দুরা কেটে ফেলল। হামি জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এল। তো এখন কী লিয়ে থাকব বলুন! এখানে মোকান নেই, আর তঙ্খা তো জিয়াদা মিলতা নহি! নয়া সন্সার ক্যায়সা বনায়েঙ্গে? অউর দিলভি বহুৎ টুট গয়া। আপনারা এখানে আছেন ভালো রহমান সাব। হিন্দুরা তো আপনাদের মারতে পারে নি এখানে। আপনার পরিবারের একটা লোক মরলে আপনি বুঝতেন।

কথাগুলো নারায়ণের বুকের মধ্যে ঢেউয়ের মত দোল খেতে লাগল।

অতি কষ্টে বলল, হ্যাঁ আমরা ইস্টবেঙ্গলের মুসলমান, হিন্দুর হাতে কোনো বিপদ আমাদের নেই। আপনাদের দুঃখ কী আমরা বুঝতে পারি ?

আরো কত কি কথা মুখে আসছিল কিন্তু নারায়ণ থেমে গল, তার মনে হল এই সব নাটকীয় অবস্থার কথা সরমা তো কিছুই জানবে না !

ইব্রাহিম সুর নরম করে বলল, আপনি কিন্তু আনিস ভাইয়াকে কিচ্ছু বলবেন না !

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করল, কেন ?

ইব্রাহিম একটু থেমে উত্তর দিল, এসব যে ঠিক কাম নেই, ও আমি বুঝেছি, আপনাদের সামনে পড়ার ডরও আছে। কিন্তু কী করব ওরা এখানে আসে।

এমন সময় গতকালের সেই মেয়েটা মুখ বাড়িয়ে বলল, আসব !

ইব্রাহিম নারায়ণের দিকে তাকিয়ে দরাজ গলায় ডাক দিল, আয় !

মেয়েটা ওয়াগনে উঠে এল, পুলিশের বুটের শব্দও যেন চারদিক থেকে ঘনিয়ে এল ! সোনাউল্লার বাহিনী অতর্কিত নৈশ আক্রমণে শিকার ধরতে এসেছে।

ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে দিল। নারায়ণ উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে গেল, কী করছ ! আমাকে যেতে দাও।

চুপ ! উধর বৈঠিয়ে, বলে ইব্রাহিম নারায়ণকে প্রায় ঠেলে নিয়ে গেল ওয়াগনের এক কোণায়। সমস্ত ময়লা কাঁথা বালিশগুলো নারায়ণের উপর চাপিয়ে লণ্ঠনটা দিল নিভিয়ে।

কিছুক্ষণ পর দরজায় প্রবল ধাক্কা ! সোনাউল্লার গলা শোনা গেল, এখানেই আছে বদমায়েশগুলো।

দরজা ফাঁক করতেই সোনাউল্লা হুকুম দিল, এই কামরা সার্চ হোগা !

ইব্রাহিম হিমেল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কেঁও, কিসকে লিয়ে ?

উত্তর না দিয়ে কয়েকটা কনষ্টেবল ঢুকতে যেতেই ইব্রাহিম বাধা দিল, হিঁয়াপর কোই আদমী নহি হ্যাঁয় !

সোনাউল্লা চিৎকার করে উঠল, শালা হিঁয়া পর তুমরা বাপ হ্যায় !

ইব্রাহিম অশ্লীল হাসি হেসে গলার স্বর পঞ্চমে তুলে বলল, আও, ইধর আও, হিঁয়া হামারা বাপ নহি হ্যায়, তুমারা বহিন হ্যায় !

সঙ্গে সঙ্গে কামরার মধ্যে দু'পা পিছিয়ে এসে ইব্রাহিম মেয়েটির কাপড় ধরে টান মারতেই সে অস্ফুট প্রতিবাদ করে উঠল। তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে ইব্রাহিম ব্যঙ্গভরে বলে উঠল, এই তুমারা বহিন হ্যায়, মাঙতা ইস কো ?

বিস্রস্তবসনা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সোনাউল্লা মাটিতে থুথু ফেলতে লাগল, তওবা! তওবা! শালা একদম হারামী!

অন্যান্য কিছু ওয়াগন তচনচ করে বিফল মনোরথ সোনাউল্লা বাহিনীসহ অন্তর্হিত হল। নারায়ণ উঠে এসে কৃতজ্ঞস্বরে বলল, ইব্রাহিম ভাই এবার তা'হলে যাই!

ইব্রাহিম হেসে উঠল, গানা নহি হোগা ?

আর একদিন শুনব, বলে নারায়ণ গাড়ী থেকে নামতে গেল। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে সে তাকাল একনজর, কিন্তু বুঝতে পারল না, ঐ যে অনশনক্লিষ্ট ভ্রষ্টা মেয়েটির জন্য আজ সে রক্ষা পেল তাকে সে কী বলবে, আর ঐ যে চরিত্রহীন ইব্রাহিম তাকেই বা কোন ভাষায় ধন্যবাদ জানাবে।

ইব্রাহিম মেয়েটিকে একটি টাকা দিয়ে বলল, আর এদিকে এসো না।

মেয়েটি টাকাটা নিয়ে ঘাড় নেড়ে মুখ বুজে নেমে গেল গাড়ী থেকে।

ইব্রাহিম নারায়ণকে বলল, দেখবেন কাল আবার ঠিক আসবে। পয়সা নেই খাবে কি!

নারায়ণ কী একটা বলতে গেল। কিন্তু যে কোনো কথাই এখন হাল্কা শোনাবে বুঝতে পেরে সে সম্বরণ করল নিজেকে।

ওয়াগন থেকে নেমে সে আনমনা হয়ে হাঁটতে লাগল। মানুষকে সহজে দোষি করা অন্যায়। দোষ ইব্রাহিমের নয়, দোষ মেয়েটির নয়, দোষ সরমার নয়, দোষ এরসাদের নয়, দোষ ফরিদের নয়, দোষ নবীবক্স, নাসির বা তার বোন আফসরীর নয়! দোষের গোড়া অন্য জায়গায়। কতদিন, কতদিন লাগবে তা উপড়ে ফেলতে ?

কাঁধের উপর আনিসের হাত পড়তেই সে চমকে উঠল।

কী ভাবছ, আনিস জিজ্ঞাসা করল।

না তেমন কিছু না। আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন ?

ইব্রাহিমের কাছে। আফসরীকে ও বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

অস্ফুট স্বরে নারায়ণ বলল, তাই নাকি!

হ্যাঁ। যাক্ এখন বিয়েটা কোনরকমে হয়ে গেলে বাঁচা যায়, কি বল! ওরা ওয়াগনে পড়ে আছে এমন একলা একলা!

সেদিনের হামলায় আনিস ধরা পড়েনি, কিন্তু বিছার কামড়ের মত যন্ত্রণা দেখা দিতে লাগল যত্রতত্র। লোকো শেডের মধ্যে পোস্টার লাগাবার অপরাধে কুটি মহম্মদ, জানে আলম এবং ইয়ার মহম্মদ নামক তিনজন শ্রমিককে ডিসচার্জ করা হল। স্টোরেজের নেওয়াজ হায়দার এবং ট্রাফিকের তোরাব শিকদারকে সন্দেহবশে ট্রান্সফার করে পাঠিয়ে দেওয়া হল চট্টগ্রামে। ক্লিনার করমালী ফোরম্যানের হাতের চাপড় খেয়ে পাল্টা থাপ্পড় দিতে গিয়ে সাসপেন্ড হল। সি-এক্স-এন'এর প্রচুর স্থানীয় গ্যাংম্যানকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দূরে কোথায়। পার্সেল অফিসের নিরীহ বৃদ্ধ কেরাণী আসমতুল্লাহকে ওয়ার্ণিং দেওয়া হল দু'দিন লেট করার অপরাধে। আর এক ভয়ংকর গুজব ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে—পার্বতীপুরে চার হাজার রেল মজুর যারা পাকিস্তানে অপ্ট আউট করে এসেও দু'বছর বেকার বসে বসে 'ডোল' নিচ্ছে তাদের যে কোনো সময় ব্যবহার করা হবে বিন্দুমাত্র গোলযোগ দেখলেই।

ওদিকে আশেপাশের গ্রামে ন্যাশনাল গার্ড ভেংগে দেওয়ার পর আনসার বাহিনী রূপ নিতে সুরু করেছে। লীগের সভায় লোক আসছে হাজার হাজার। কাশ্মীর সমস্যা তুলে বক্তৃতা দেওয়ায় কিছু লোক উত্তেজিতও হচ্ছে। কমিউনিস্টরা পাকিস্তান ধ্বংস করতে চায় এ-কথাও বিশ্বাস করছে অনেকে। হিন্দুদের মনে বেড়ে চলেছে আতংক। সংগে সংগে রেলওয়ে কলোনীর অবাঙালী শ্রমিক এবং উদ্বাস্তুদের সংগে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সংঘর্ষ দেখা দিতে লাগল কথায় কথায়। বহিরাগত রেলের লোকের প্রতি স্থানীয় লোকের সহানুভূতি মুছে গেছে। চতুর্দিকে গ্রাম-সমুদ্রের মধ্যে রেলের লোকেরা যেন দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে রইল।

এরসাদ আরো এক দুঃসংবাদ নিয়ে এল, সুলতান গ্রেপ্তার হয়েছে।

শুধু তাই নয় গ্রামের লোকেরা আনসার বাহিনীকে সুযোগ না দিয়ে সুলতানকে মারপিট ক'রে নিজেরাই পুলিশে চালান দিয়েছে। যার বাড়ীতে সে আশ্রয় নিয়েছিল তাকেও ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

কিন্তু এই সময়েই রেলের লোকেরা যেন ক্ষেপে উঠল। প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই একদিন লোকো শেডের সামনে ছুটির পর একটা ছোটখাট সভা হয়ে গেল, অপরিচিত লোক দু'একজন বক্তৃতাও করল। সাসপেনশন উঠাও, ট্রান্সফার চলবে না, ডিসচার্য বাতিল করো, একদিন চাকা বন্ধ করো।

ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝে নবীবক্স এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ সভা ডেকে নরম এবং গরম বক্তৃতা দিতে সুরু করেছে। কৌতুহলবশে এবং কর্তৃপক্ষের ধমকানির ভয়ে কিছু লোক শুনেও আসছে তার লেকচার। অভিজ্ঞের দল অবিশ্বাসের হাসি হাসল, কিছু লোক বলতে লাগল, কিছু একটা হবেই, বিশেষত নবীবক্স যখন বলছে। কিছু লোক নবীবক্সকে দালাল বলে গালি দিল, বাকীরা রইল উদাসীন। সোনাউল্লার সঙ্গে নবীবক্সের মিলিত হাসির শব্দও কেউ কেউ শুনতে পেল আড়ালে আবডালে।

ওয়াগনের মধ্যে বৈঠক বসেছিল। লোকো শেডের খবরটা দিয়ে খলিল বলল, আভি টাইম আ গয়া! জবাব দেনা চাহিয়ে!

জবাবের এটাই উপযুক্ত সময় কিনা তাতে আনিসের প্রচুর সন্দেহ ছিল, আর জবাবের কী ধরণটা হবে তারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে নারায়ণ উত্তেজিত হয়ে উঠল, কেন কথা বলছেন না! যেখানে মজুররাই বলছে চাকা বন্ধ করো সেখানে আমাদের করনীয় কী তা তো পরিষ্কার।

নারায়ণের গলা কাঁপছে। সে এই রকম জিনিসেরই তো স্বপ্ন দেখে এসেছে। গুমোট বন্ধ হাওয়া থেকে তার ব্যর্থ যৌবন চায় মুক্তি। অসহ্য লাগে তার কাছে এই দিনে দিনে তিলে তিলে ক্ষয়।

কোরবান কদিন আগে বেকসুর খালাস পেয়েছে, সে বলল, এখন কিছু করা অন্যায় হবে!

খলিল ফোঁস ক'রে উঠল, নোকরী তুমি ফেরত পেয়েছ, তাই তোমার

খুব ডর লাগছে।

কোরবান মেজাজ হারিয়ে ফেলল, খবরদার! মুখ সামলে কথা বলো!

ইব্রাহিম তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল, ও এখনো ছেলেমানুষ আছে, ওর কথায় চটবেন না।

ফরিদ কোরবানের পক্ষ নিয়ে বলল, খলিলকে মাপ চাইতে হবে।

নারায়ণ বাধা দিল, না খলিল ঠিক কথা বলেছে!

কোরবান উঠে দাঁড়াল, আমি চললাম।

আনিস কিছু বলার আগেই কোরবান প্রায় লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে চলে গেল। অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ। ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে আনিস জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি মত ইব্রাহিম ভাই?

ইব্রাহিম হারমনিয়মটার ডালার উপর বাঁ হাতের কনুই রেখে কপালটা টিপে ধরেছে শক্ত করে, আনিসের কথায় মাথা তুলে একটু হেসে আবৃত্তি করল, যিস ক্ষেত সে দাঁহ কা কো মোয়েস সর না হো রোজি, উস ক্ষেত কে হর খোস-আয়ে গনদুস কো জ্বালা দো, জ্বালা দো!

অর্থাৎ যে ফসলের ক্ষেত চাষীর মুখে খাদ্য জোগায় না, সেই ক্ষেতের প্রত্যেকটি গমের গুচ্ছ জ্বালিয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও!

দূর থেকে একটা ক্রন্দনের সুর ভেসে আসছে। আবার কে হয়ত মারা গেল এই আস্ত জাহান্নমের মধ্যে।

আনিসের মাথাটা একেবারে ঝুলে পড়েছে যেন। মেঘের উপরে মেঘ জমলে বর্ষণ আর বজ্রপাত হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু ক্ষোভের উপর ক্ষোভ জমলেই সমস্যার সমাধান হয় না।

দু'সপ্তাহ পরে অতিকষ্টে কিছু বাংলা ইস্তাহার ছাপা হয়ে এল। লোকো এবং রানিং শেডে, ট্রাফিক এবং স্টোরেজ সর্বত্র অল্প অল্প ক'রে বিলি করা হ'ল। বহুকাল ছাপানো জিনিষ লোকে পায়নি। সামান্য এক এক খণ্ড কাগজ ঘুরতে লাগল হাতে হাতে।

ঝাড়ুদার মদনা একখানা কাগজ পেয়েছিল। বেলা গোটা দশেকের সময় খোয়াঢালা প্লাটফর্মের একটা গাছের ছায়ার নীচে বসে ঝাঁটাটা পাশে রেখে গামছা দিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল। মানু মিঞাকে যেতে দেখে কাগজখানা বের করে বলল, দেখুন তো সাহেব কী লিখেছে।

মান্দু মিঞা ইস্তাহার দেখে ধমক দিল, ব্যাটা মরবি! কিন্তু লোভ সম্বরণ করতে না পেরে এদিকওদিক তাকিয়ে বলল, দেখি কি লিখেছে!

"রেল মজদুর ভাইসব, গত ফেব্রুয়ারী মাসে লীগ সরকার সতের হাজার রেল মজদুরকে ছাঁটাই করিয়াছে। আবার নতুন ছাঁটাইয়ের ধুয়া তুলিয়া আমাদের গ্রেড, মাহিনা বৃদ্ধি, গ্রেণসপের দুর্নীতি বন্ধ ও অন্যান্য দাবিকে বানচাল করার চেষ্টা করিতেছে। কিছু 'শ্রমিক নেতা' অসম্ভব দাবি পেশ করিয়া গরম বক্তৃতা দিয়া শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করিতেছে। আবার 'পাকিস্তানের খেদমতের জন্য স্বার্থত্যাগ করো' বলিয়া শ্রমিকদের মধ্যে কিছুলোক বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য অপপ্রচারও চালাইতেছে। সরকার বলিতেছে, পে কমিশনের রায় চালু করা যাইতেছে না, কারণ টাকা নাই। সেই অজুহাতে রেশনের পরিমান কমাইয়া দেওয়া হইতেছে।...টাকা নাই ইহা সত্য নহে। লিয়াকত আলী সরকার রেল বিভাগ হইতেই কয়েক কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে। তাহারা বৃটীশ কোম্পানীগুলিকে কোটি কোটি টাকা মুনাফা দেশের বাইরে লইয়া যাইতে দিতেছে, অথচ দেশের শ্রমিকের সামান্য বাঁচিবার দাবিকে দেশের প্রতি দুষমনী বলিয়া প্রচার করিতেছে। আমাদের সরকার এ বৎসর বাজেটের শতকরা ৬৮ভাগ অর্থাৎ ৪৭ কোটি টাকা সামরিক খাতে বরাদ্দ করিয়াছে। সেই টাকায় তাহারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে ঘাঁটি বানাইতেছে।...কিন্তু রেল শ্রমিক শুধু বসিয়া বসিয়া মার খাইতেছে না। শান্তাহার, লালমনিরহাট, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, পার্বতীপুর, ঢাকা, পাহাড়তলী, সৈয়দপুরে জি-এম, টি-এম, মন্ত্রীকে ঘেরাও করিয়াছে, ধর্মঘট করিয়াছে। পূর্ববঙ্গের পঁয়সট্টি হাজার রেল শ্রমিকের মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কুড়ি হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছে।...সরকার দাবি মানার বদলে পুরাদস্তুর দমননীতি সুরু করিয়াছে। রেল মজদুরের বহু প্রিয় নেতাকে বিনা বিচারে তাহারা জেলে পুরিয়াছে। রেল মজদুরের সংগঠনকে তাহারা চুরমার করিতে চেষ্টা করিয়াছে।...আমাদের ইহার জবাবে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিতে হইবে...দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য..."

মান্দু মিঞা ইস্তাহারখানা মদনার হাতে ফেরত দিতে গেল। মদনা

কাগজখানা না নিয়ে মুখ ব্যাজার করে বলল, নিজেই পড়লেন, আমাকে কিছুই বললেন না!

মানু মিঞা জবাব দিল, যা যা এটা নিয়ে বাড়ী যা। আমার চাকরী খাবি নাকি!

বলতে না বলতেই সম্মুখে ডি-এম-ই উপস্থিত। জিয়াউল হক্ হন হন করে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে মদনার দিকে চেয়ে বলল, এই কুত্তাকা বাচ্চা ক্যা পড়তা হ্যায়!

মানু মিঞা ভাবলে তাকেই এই গালাগালি! প্রথমে থতমত খেয়ে পরক্ষণে বলে বসল, কুত্তাকা বাচ্চা বলবেন না স্যার!

আলবৎ বলুঙ্গা!

না বলতে পারবেন না! উইথড্র করুন!

দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেল। ডি-এম-ই ঘেরাও! দলে দলে লোক ছুটে আসছে ইয়ার্ড থেকে, রাণিং শেড থেকে, লোকো থেকে। প্রথমেই এসে উপস্থিত হয়েছে ফরিদ। সান্টিং বন্ধ রেখে ইঞ্জিন থেকে লাফিয়ে এল ইব্রাহিম। দু'জনে এগিয়ে গেল ভীড় ঠেলে। কেউ কিছু জানে না কী হয়েছে। মানু মিঞার কাহিনী গোলমালের মধ্যে ফরিদ বা ইব্রাহিম শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। এমন সময় কে একজন চীৎকার করে উঠল, শালা ডি-এম-ইকে ঘরে আটক করো!

ইব্রাহিম প্রায় নিজের অজান্তে জিয়াউল হককে ঠেলা মারল, চলিয়ে!

এই লোকটা বসিরের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত!

ষ্টেশন মাষ্টার এসে উপস্থিত হতেই কিছু লোক পথ ছেড়ে দিল, কিছু লোক তার দিকে তেড়ে গেল, ইয়াকুব বুরহানী দিশেহারার মত চিৎকার করে উঠল পুলিশ! পুলিশ!

কোথায় পুলিশ! ফরিদ ঠাস ক'রে তার গালে চড় বসিয়ে দিল।

এই লোকটা আফসরীর সর্বনাশ করছে।

পিছন থেকে একটি গলার স্বর শোনা গেল, টেলিফোন, টেলিফোন দখল করো, নইলে পুলিশ ডাকবে।

কয়েকজন হুড়মুড় করে ছুটে গেল টেলিফোনগুলোর সন্ধানে।

আরো লোক বাড়ছে। হৈ হল্লা, চিৎকার গালাগালি।

পুলিশের ঘাঁটি রেল ক্রসিংয়ের ওপারে। পুলিশকে আসতে হলে লাইন ডিঙিয়ে আসতে হবে। ইব্রাহিম জিয়াউল হককে কয়েক জনের পাহারাধীনে রেখে দৌড়ে গিয়ে উঠল ইঞ্জিনে। তারপর রানিং শেডের দিকে চালিয়ে দিল ইঞ্জিনখানা। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল খান-পনের ইঞ্জিন ছুটে আসছে রেলওয়ে ক্রসিংয়ের দিকে!.

ক্রসিংয়ের ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় শ'খানেক আর্মড পুলিশ। কিন্তু রেললাইন পার হ'তে পারছে না। মুহূর্তে মুহূর্তে এক একখানা ইঞ্জিন ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে, ব্যাক করে আবার ফিরে আসছে!

ষ্টেশন প্রাঙ্গন থেকে বহুকাল পরে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিত হতে সুরু করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আনিস, নারায়ণ এবং খলিল এসে হাজির হল! তারা যেন এক মুক্ত দেশে এসে দাঁড়িয়েছে! পুলিশ আর সোনাউল্লা, রিভলভারসহ আলী আকবর আর বেয়নেটসহ আর্মড ফোর্স তাদের স্পর্শ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে! ওপারে বন্দুক নামিয়ে দাঁড়িয়ে দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতারা, এপারে বিজয়ী মানুষের কলধ্বনি, আর মাঝখানে ইঞ্জিনগুলো ঘটনার জীবন্ত নায়কের মত যেন উন্মাদনায় অস্থির! এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ।

মানু মিঞার পিঠে চাপড় মেরে খলিল বলল, দেখতা হ্যায় ইনকিলাব কা ইঞ্জিন কৈসা চল রহা হ্যায়?

সে কথা মানু মিঞা শুনতে পেল না। সমস্ত ইঞ্জিনগুলোর বয়লার নির্গত বাষ্পের শব্দে কানে তালা লেগে গেছে।

এরি মধ্যে হঠাৎ কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল—ফায়ার!

কিন্তু আর্মড ফৌজের বন্দুক দিয়ে গুলি বেরুল না! আলি আকবর আবার অর্ডার দিল, ফায়ার!

ধাবমান ইঞ্জিন-ড্রাইভারদের বিরুদ্ধে পুলিশ গুলি চালাতে অস্বীকার করল!

প্রায় চক্ষের নিমেষে আলী আকবর ফোর্স উইথড্র করে চলে গেল।

ইতিমধ্যে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ এবং একখানা মালগাড়ী ষ্টেশনের দুদিকে এসে থেমে রয়েছে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে নেমে এল কোরবান! খলিল দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, ভাই মাপ কিজিয়ে!

সব রাগ ভুলে কোরবান জিজ্ঞাসা করল, কিছু লুঠপাট হয়নি তো?

খলিল হেসে ফেলল, আমরা কি ডাকু?

অতিদ্রুত এক অদ্ভুত সংগঠন গড়ে উঠল ষ্টেশন প্রাঙ্গনে! বিরাট ইয়ার্ড জুড়ে মোতায়েন হল কয়েক শ' ভলাণ্টিয়ার। সুযোগ সন্ধানীরা নিরাশ হল।

আনিসকে ধরে কোরবান জিজ্ঞাসা করল, প্যাসেঞ্জার ট্রেন কি আটক রাখা হবে?

আনিস জোর দিয়ে বলল, কিছুতেই না! তাতে জনমত আমাদের বিরুদ্ধে যাবে।

নারায়ণ বলে উঠল, কিন্তু খবরটা তা'হলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত।

ফরিদ প্রতিবাদ করল, গাড়ীতে বহুত জেনানা আউর বাচ্চা লোগ হ্যায়, উনকো বহুত তকলিফ হোগা।

খলিল তার নিজের প্রস্তাব রাখল, আপ্ আর ডাউনের দিকে আমাদের এখন ষ্টেশনে ষ্টেশনে যাওয়া দরকার।

আনিস বলল, তাতে ওদের গ্রেপ্তার করার সুবিধা হবে।

ইব্রাহিম প্রস্তাব করল, খালি ইঞ্জিন চালিয়ে নিয়ে গেলে আচ্ছা হবে। কিছুক্ষণ পর দুটো ইঞ্জিন বেরিয়ে গেল হুস হুস করে। কোরবান প্যাসেঞ্জার ট্রেণের ইঞ্জিনে গিয়ে উঠল। আগন্তুক মালগাড়ীগুলিকেই শুধু আটক রাখা হল।

দু'খানা ইঞ্জিন ঘণ্টা তিনেক পরে দু'দিক থেকে ফিরে এল। প্রায় সত্তর আশী মাইল জুড়ে কাজকর্ম পুরোপুরি বন্ধ! শুধু মজুরদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি।

আট ঘণ্টা আটক থাকার পর জিয়াউল হক সন্ধ্যার সময় প্রতিশ্রুতি দিল ঘটনাবলির জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না, সাসপেন্সন, ডিস-চার্জ নোটিশ উঠিয়ে নেওয়া হবে, এবং নেওয়াজ হায়দার আর তোরাব শিকদারকে যতশীঘ্র সম্ভব চট্টগ্রাম থেকে ফিরিয়ে আনা হবে।

জিয়াউল হককে বিদায় দেওয়ার আগে আনিস চা বিস্কুট আনিয়ে

আপ্যায়িত করল।

ইব্রাহিম বলল, দেখিয়ে ইমান ঠিক রাখিয়ে।

খলিল ঘাড় বাঁকিয়ে মুখের উপর বলে বসল, উনকো ইমান কা পর হাম পেসাব কর দেগা।

আনিস ধমক দিল, চুপ! বেয়াদব!

মুখ রাঙা করে জিয়াউল হক হেঁটে কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল।

ইমানের পরিচয় পেতে দেরী হল না।

সারা রাত্রি ধরে প্রস্তুতি চলেছিল। আলী আকবরের টেলিফোন আর টেলিগ্রামের বহর দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কোথাও বুঝি বিরাট বিদ্রোহ বিপ্লব অভ্যুত্থান সুরু হয়েছে! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক বালুচি রেজিমেণ্ট এসে পড়ল যুদ্ধের ময়দানে। ডি-আই-জি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সুরু করে রেলওয়ে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পর্যন্ত রাত জেগে আলী আকবরের মুখে একই বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি শুনতে বাধ্য হল। ঘনঘন চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ ও সিগারেট ধ্বংস করে পাকিস্তানী জোশ নেহাৎ মন্দ জাগল না।

রাত্রি শেষ না হতেই যখন অপারেশন সুরু হল, তখন ওয়াগনের গরমের মধ্যে বিদ্রোহী বাহিনী ঘুমে অচৈতন্য ছিল! কাজেই তারা যুদ্ধের চেহারাটা প্রায় কিছুই দেখতে পায় নি, কিম্বা আকস্মিক লাঠির গুঁতো খেয়ে ময়লা বালিশের উপর থেকে মাথা তুলে সে কথা ভাবার অবকাশ পায় নি।

আনিস নারায়ণ আর খলিল ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল বলেই সে রাত্রে ওয়াগনে থাকে নি। ফরিদ আর ইব্রাহিমকে সাবধান করে দেওয়া সত্বেও কথা শোনে নি। কলোনীর মধ্য থেকে মানু মিঞা এবং কোরবানকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর আনিস খবর নিতে ঢুকল ইয়ার্ডের মধ্যে। ওয়াগনগুলোর পাশ দিয়ে খানিকক্ষণ হেঁটেও লোক চলাচল একদম বন্ধ দেখে সে বিস্মিত হল। এর আগেও তো পুলিশ হামলা হয়েছে, কিন্তু এমন থমথমে ভাব তো কখনো সে দেখে নি। অধিকাংশ ওয়াগনে কোনো

আলো নেই। ক্ষীণ চাঁদ উঠেছে পশ্চিমের আকাশে, তারই আলোয় কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে সমস্ত রেল ইয়ার্ড।

কে একজন ওয়াগন থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, আনিস সাব, সাবধান! পুলিশ এখনো মোতায়েন রয়েছে চারদিকে।

আনিস দ্রুত পা চালিয়ে দিল ইব্রাহিমের ওয়াগনের দিকে। কী যে হয়েছে, কারা যে ধরা পড়েছে, কোন ধারণাই তার ছিল না।

দরজা খোলা, ভিতরটা অন্ধকার, কয়েক বার ডাকাডাকি ক'রেও কারো সাড়া মিলল না। আনিস ধীরে ধীরে উঠল ইব্রাহিমের ওয়াগনে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালল একটা কাঠি। ক্যাঁথা, বালিশ, ভাতের হাঁড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছে। একটা টিনের সুটকেশ ডালাখোলা অবস্থায় পড়ে আছে। সিগারেট বিড়ির ছাইফেলা টিনটা উপুড় হয়ে আছে। আর এক কোণায় শোভা পাচ্ছে ইব্রাহিমের সেই হারমনিয়মটা।

সামনে ফরিদের ওয়াগনে একটা আলো জ্বলে উঠল। একটি নারী-মূর্তি দ্রুত নেমে এল সেখান থেকে। ইব্রাহিমের ওয়াগনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কৌন হ্যায়!

আফসরীর কণ্ঠস্বর!

আনিস বলল, আফসরী আমি!

আফসরী রুদ্ধকণ্ঠে জানাল, সব গ্রেপ্তার কর লে গয়া।

অন্ধকারে আনিস মেয়েটার মুখ দেখতে পায়নি, পেলে দেখত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে অঝোর ধারে। যে লোকটা আফসরীকে বেঁচে থাকার ভরসা দিয়েছিল, তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগেই পুলিশ তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

আনিস জিজ্ঞাসা করল, ফরিদের কী খবর?

আফসরী একটু চুপ করে থেকে যা জানাল তাতে আনিসের মুখে কথা সরল না কিছুক্ষণ। পুলিশ ফরিদকেই মারপিট করেছে সব চেয়ে বেশী। হাত ভেঙেছে, মাথা ফেটেছে। বোধ হয় বুরহানিকে চপেটাঘাতের প্রতিফল। বুড়িমা বাধা দিতে আসায় তারও একটি পা এবং হাতের কড়ে আঙুল ভেঙে গেছে লাঠির বাড়িতে। এখনো অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে ঐ গাড়ীতে। আসলে চুপিচুপি ইব্রাহিমের খবর

নিতে এসে আফসরী ঐ বুড়িকে নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। বুড়িমার মারফতই বিয়ের ব্যাপারটা সম্পন্ন হতে যাচ্ছিল।

দু'জনে মিলে ইব্রাহিমের অস্থাবর সম্পত্তিগুলি নিয়ে গেল ফরিদের ওয়াগনে। তারপর কী কথা বলবে তারা ভেবে পেল না।

আম্মা পড়ে আছে একটা ওয়াগনে রোগগ্রস্ত হয়ে, আর বুড়িমা আহত হয়ে শায়িত রয়েছে দু'টি কচি বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে। জননী জঠরে বাড়ছে আর একজন। তাকে অভ্যর্থনা করবারও কেউ নেই, তাকে ভুলে থাকবারও ক্ষমতা নেই। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আনিসের। ধীরে ধীরে সে বলল, দেখি একটা ডাক্তার যদি পাঠানো যায় এরসাদকে বলে! আর এই একটা মাত্র টাকা আছে, নাও! পরে দেখা যাবে।

এমন সময় হারমোনিয়মের শব্দে দু'জনেই ফিরে তাকাল। লাল্লু কখন নিঃশব্দে উঠে গিয়ে প্যাঁপুঁ করতে সুরু করেছে। ইব্রাহিমের ঐ যন্ত্রটার প্রতি বরাবরই লাল্লুর লোভ ছিল।

আফসরী উঠে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে একটু হেসে বলল, এ্যায়সা মৎ করনা! খারাপ হো জায়েগা।

আনিস এ অবস্থার মধ্যে আফসরীকে হাসতে দেখে স্বস্তি পেল! আর ওর কোলে লাল্লুকে মানিয়েছেও মন্দ নয়! মানায় অনেক কিছুই, কিন্তু কোনোটাই সহজে ফুটে ওঠার পথ পায় না!

কিছুক্ষণের মধ্যে আনিসের আগমন টের পেয়ে ওয়াগনগুলো থেকে লোক আসতে সুরু করল। অধিকাংশই নানাবয়সের নারী। মারপিট এবং গ্রেপ্তারের দুঃখের কাহিনী বলার জন্য সবাই পাগল।

শব্দ বাড়তে লাগল। ডিউটিরত কয়েকটা পুলিশ ছুটে এলো। আনিস কোনো মতে গাড়ীর নীচে দিয়ে মাথা গলিয়ে গলিয়ে ইয়ার্ডের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়ালো। একটু দম নিয়ে এরসাদের বাড়ীর দিকে হাঁটতে সুরু করল।

এরসাদ সব কথা শুনে বলল, কাল সকালে ডাক্তার পাঠাতে চেষ্টা করব। কিন্তু সোনাউল্লার হাবভাব দেখে সত্যি ভালো লাগছে না, কী করি বলুন তো? এবার বোধ হয় গোপনে থাকার দরকার পড়বে, কি বলেন?

আনিস উত্তর দিল, এবার আন্দোলন করা আরো শক্ত হবে, সংগঠনটা একেবারে ভেঙে গেল, সময় নেবে। আপনার ঘোরাফেরা এখন আরো সংযত হওয়া দরকার।

এরসাদ বলল, আচ্ছা, বিয়েটা যদি এখন করে ফেলি! ওদের অনেক সন্দেহভঞ্জন হবে! কি বলেন?

এক মুহূর্তে চুপ করে থেকে আনিস উত্তর দিল, বেশ করুন! কিন্তু কাল একটা ডাক্তার পাঠাতে ভুলবেন না! এখন উঠি।

আনিস নানা পথ ঘুরে ঘুরে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। কড়া নাড়তে কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। শেষে মরিয়ম এসে দরজা খুলে দিল, কিছু বলার আগেই একটা যন্ত্রণায় সেইখানেই বসে পড়ল। তাকে কোলে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আনিস মাথায় হাত বুলাতে লাগল ধীরে ধীরে। এত রাত্রে সে ডাকতে যাবে কাকে।

মরিয়ম বলল, কাউকে ডাকতে হবে না, তুমি একটু আমার কাছে থাক।

কিন্তু—

না, ডাকতে গেলে বিপদ হবে।

হালিমা আপাকে ডাকি?

বেশ ডাকো।

তার আগেই জননী লুটিয়ে পড়ল যন্ত্রণায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত যন্ত্রণা ভেদ ক'রে জন্ম নিল সন্তান। অভিজ্ঞ জননীর পরামর্শ অনুসারে আনিস আনাড়ি হাতে কেটে দিল নাড়িটা।

তখন ভোরের আলো দেখা দিতে সুরু করেছে। কী ভাবে যে সময় কেটে গেছে কেউ খেয়াল করেনি। মরিয়ম দুর্বল গলায় বলল, তুমি এবার যাও!

না, আমি যাব না।

কী বলতে গিয়ে মরিয়মের গলায় আটকে গেল কথা। তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল ফোঁটায় ফোঁটায়।

আনিস মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি আমাকে যেতে ব'ল না!

পুলিশ আমাকে ধরে ধরুক!

মরিয়মের ঠোঁটের কোণায় ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল, সে বলল, তুমি একদম ছেলেমানুষ! দেখছ না আমি ভাল আছি! তুমি যাও।

মুখ নীচু ক'রে আনিস নবজাতকের কপালে এবং মরিয়মের শুষ্ক-প্রায় অধরে চুমু খেল। সোনা মনি এবং কলির কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে দরজা টেনে দিয়ে নেমে এল পথে।

চলতে চলতে কিন্তু কোনো দিকেই তার খেয়াল ছিল না! আসার সময় একটা পয়সাও দিয়ে আসতে পারেনি মরিয়মের হাতে। পিতৃত্বের নিস্ফল যন্ত্রণা অন্য সমস্ত চিন্তা যেন মুছে দিয়েছে মাথার মধ্যে।

হঠাৎ চোখে পড়ল পুলিশ ঘেরাও করেছে দর্জির দোকানটা! রাস্তা থেকে নেমে সে আসশ্যাওড়ার জঙ্গলের মধ্যে বসে পড়ল। একটু পরেই দেখতে পেল নারায়ণ আর খলিলকে ঘেরাও করে নিয়ে চলেছে পুলিশ। দু'জনেরই জামা ছেঁড়া, হাত দু'টি পিঠমোড়া করে বাঁধা। খলিলের মুখের কোণ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

আশে পাশে আর কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। আনিস দ্রুত হেঁটে চলল মাঠ পেরিয়ে। আজাহারের বাড়ীর কাছে এসে দেখতে পেল সেখানেও পুলিশের বেড়াজাল পড়েছে।

কয়েক দিন পরে আনসার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হল আনিস।

৯

আনিস ধরা পড়ার আগেই মরিয়মের কোলের বাচ্চাটি মারা গিয়েছিল। পুরনো ফর্সা কাপড় ছিঁড়ে কচি দেহটিকে জড়িয়ে হালিমা ইউনুসের হাতে তুলে দিয়েছিল ওকে কবর দিয়ে আসার জন্য। পিছনে পিছনে গিয়েছিল সোনা আর মনি। বিপদ হয়েছিল হালিমার। একদিকে মূর্ছিত মরিয়ম, অন্যদিকে তার তিন তিনটে ছেলেমেয়েকে সামলানো। দুই একবার জবেদা এসে ঘুরে গিয়েছিল, মানু মিঞা গ্রেপ্তারের পর সেও অন্ধকার দেখছিল চতুর্দিকে, কখনো আনিসের প্রতি কখনো স্বামীর প্রতি কটূক্তি করতে সুরু করেছিল। ইউনুসের বৌ সাজুর এখনো ছেলেপুলে হয়নি, কলিকে সে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে-

ছিল। আর ইউনুসের বাড়ী থেকেই কয়েকদিন ভাত তরকারী আসছিল মরিয়মের ঘরে।

যে কোনো সময় আনিসের আগমনের প্রত্যাশায় ছিল মরিয়ম। মনের মধ্যে জড়িয়ে ছিল কান্না আর অভিমান। এমন সময়ে আনিস কেন একবার দেখা দিয়ে যায় না! শেষে আনিসের খবর যখন পৌঁছল তখন মরিয়মের শরীর ভেঙে পড়ল আরো।

অর্ধ-চৈতন্যাবস্থায় দিন কাটতে লাগল। খেতে পারে না, শুতে পারে না, বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না, দাঁড়ালে মাথা ঘোরে, বসলে ঝিমানি আসে, একটা কিছু নিয়ে ভালো করে ভাবতেও পারে না। চতুর্দিকে কেমন একটা নিঃসীম শূন্যতা।

মরিয়মের মুখ দিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মত বেরুল, আশেপাশের লোকেরা একটু খবর পর্যন্ত নিতে আসে না।

হালিমা আঁচল থেকে একটা বাটিতে মুড়ি ঢেলে দিয়ে বলল, নে একটু মুখে দে। আর এই দু'টো টাকা রাখ, ইউনুস দিয়েছে।

অল্পতেই মরিয়মের চোখে পানি এসে গেল, কিন্তু আপা এই ভাবে আর কয়দিন চলবে বলতে পারো।

হালিমা ভর্ৎসনা করে বলল, আগে একটু ভালো হয়ে ওঠ, তারপর চিন্তা করিস। আর দ্যাখ কার কিসে দুঃখ বোঝাই মুস্কিল। ইউনুস আমাকে রেখেছে মায়ের মত, কিন্তু মন ভরে কই? মরণ আমাকে চোখেও দেখে না! তোর সোনা মনি কলি রয়েছে বুক জুড়ে, দুঃখ করিস নে!

মরিয়ম দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এই শত্রুরাই তো আমাকে জ্বালাচ্ছে আপা, নইলে আমার কি ভাবনা। তিনটে মুখ আমি কি দিয়ে ভরাব?

হালিমা সান্ত্বনা দিল, ভাবিস নে বোন, মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

তর্ক করা বৃথা ভেবে মরিয়ম আর কথা বাড়াল না। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ কানে এল। হালিমা ঘোমটা টেনে দরজাটা খুলে দিতেই উস্কখুস্ক চুল নিয়ে প্রবেশ করল মানু মিঞা। বিস্মিত হয়ে হালিমা জিজ্ঞাসা করল, কবে ছাড়া পেলে মানু মিঞা?

কাল। একটা কথা বলতে এলাম। এক গ্লাস পানি দেবেন।

ঢক ঢক করে পানির গ্লাস উজাড় ক'রে মানু মিঞা দাওয়ার উপর বসে পড়ল। একটু দম নিয়ে বলল, আমি আর থাকতে পারলাম না, হাতে পায়ে ধরে বেরিয়ে এলাম!

মানু মিঞার গলার স্বর থেমে এল। সে ভাবছিল এই দু'টি নারী কিছু একটা তিরষ্কার করবেই তাকে। কিন্তু কোনো কথাই যখন কারো মুখ দিয়ে বেরুল না, তখন মানু মিঞা প্রায় পাগলের মত ফেটে পড়ল, কি করব আমি! আমার পাঁচ সাত জন খানেওয়ালা! সংসারে এমন একটা লোক নেই যে মুখের কথা বলেও জিজ্ঞাসা করে! ছেলেমেয়ে-গুলো কি তবে না খেয়ে মরে যাবে।

ছেলেমেয়ে কি তোমার একা আছে মানু মিঞা, এই কথাটি বলতে গিয়ে কী দেখে হালিমা থেমে গেল। মানু মিঞার খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির উপর অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে!

মানু মিঞা চোখের পানি মুছে এবার অভিযোগ করল, আর আমি কি একা বণ্ড দিয়েছি? আরো যে কত লোক কোনদিন ষ্ট্রাইক করবে না বলে বণ্ড দিয়েছে তার কি হবে!

তথাপি দু'জন নারীর মুখে যখন কথা ফুটল না তখন মানু মিঞা বলল, বুকের মধ্যে কী যে হচ্ছে, তা আমিই জানি। যাক্ যা বলতে এসেছিলাম। শুনলাম আনিসকে এরসাদই ধরিয়ে দিয়েছে!

এবার মরিয়ম কথা কয়ে উঠল, কী বলছেন! কোথায় শুনলেন!

কেন, জেলের মধ্যে থেকেই শুনে এসেছি! ভাবলাম একবার সাবধান করে দিয়ে আসি।

এত দুঃখের মধ্যে মরিয়ম বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, আমাদের আর সাবধান কী! আমাদের জেলে নিয়ে গেলেই হাড় জুড়োত।

মানু মিঞা একটু ইতস্তত করে উঠে চলে গেল। হালিমা এবং মরিয়ম কারো মুখেই কথা সরলো না বেশ খানিকক্ষণ। শেষে হালিমা গালে হাত দিয়ে বলল, এই সব বারো ভূতের জন্য কখনো প্রাণটা নষ্ট করতে আছে! কিন্তু একটু থেমে হালিমা সুর পাল্টাল, তা মানুষেরই বা দোষ কি বল। একটু দানাপানির জন্যই তো চাকরী করতে আসা। আর ইউনুস বলছিল, এমনভাবে জিনিষটা করা ঠিক হয় নি। আসলে

তো আমাদের নিজেদের গোয়ারমেণ্ট, আজ না হোক কাল একটা ভালো কিছু হবেই! হালিমা আবার থামল। মরিয়মের শুষ্ক মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আমি তো বুঝি না মানুষ যদি মরেই গেল তো কিসের কী ভালো হবে।

সেনা আর মনি ছুটতে ছুটতে এল। সোনার হাতে ঠোঙ্গা ভর্তি সিঙ্গাড়া আর নিমকী। সোনা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মা ফুটবলের মাঠে একটা লোক আমাদের কিনে দিল, বলল যা বাড়ী নিয়ে যা।

বিস্মিত হয়ে মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, তার নাম কী রে?

ভাইবোন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারা কেউই নাম জানে না, জানার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে নি! মনি বলল, মা সে লোকটা মাঝে মাঝে এই পথ দিয়ে যায়।

সোনা বলল, আমি তাকে দেখিয়ে দেব!

হালিমা হেসে ফেলল, থাক আর দেখিয়ে দিতে হবে না! আমার মনে হয় জহুরের কাণ্ড!

মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, কে জহুর?

মেকানিকের কাজ করে।

মরিয়মের চোখের কোনটা জ্বালা করে উঠল, তা'হলে দুনিয়াটা এখনো পাথর হয়ে যায় নি।

কিন্তু পরদিন দুপুরবেলা বইখাতা হাতে করে কাঁদকাঁদ মুখে বাড়ী ফিরে এল সোনা। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে ভালো বলতেও পারল না। আট বছরের কচি মস্তকে তার ঢোকেও নি কোনো কিছু। বুড়ো মৌলভী তাকে বলেছে, তোর বাপ কমিউনিস্ট, দেশের দুষমণ, বুঝেছিস! এমন একটা সরল সত্য কথা সোনা কিছুতেই বোঝে নি, কিন্তু টিফিনের সময় যেই না একটি ছেলে বলেছে তোর বাপ কমিউনিষ্ট অমনি চারপাশ থেকে বালখিল্যের দল তাকে ক্ষ্যাপাতে লাগল, ওরে তোর বাপ কমিউনিষ্ট! সোনাকে কাঁদতে দেখে হেড মাষ্টার রামতরণবাবু ছাত্রদের তিরস্কার করেছেন এবং তাকে ছুটি দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সোনা জিজ্ঞাসা করল, মা কমিউনিস্ট কী?

কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে মরিয়ম বলল, যারা খুব ভালো তারা

কমিউনিস্ট!

তবে ওরা বাপজানকে গালি দেয় কেন?

ওরা কিচ্ছু জানে না!

সোনা এই জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারল না। মৌলভী সাহেব কিচ্ছু জানে না এ কী ক'রে হয়! কিন্তু এই নিয়ে স্কুলে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল। অ্যাসিসটেণ্ট হেড মাষ্টার বজলুস সাত্তারের বহুদিন থেকে হেডমাস্টার হওয়ার অভিলাষ ছিল। সে রটাতে লাগল, রাম-তরণবাবু কমিউনিস্ট!

বৃদ্ধ হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে এই উদ্ভট অভিযোগ অন্যান্য শিক্ষকরা হেসে উড়িয়ে দিল। তখন বজলুস সাত্তার স্কুল চৌহদ্দীর বাইরে যে প্রচার সুরু করল সেটা হচ্ছে, রামতরণবাবুর ছেলে কমিউনিস্ট, সে কোলকাতায় থাকে, মাঝে মাঝে বাড়ী আসে এবং পাক সরকারের সহৃদয়-তার সুযোগ নিয়ে খবর জোগাড় করে, ফিরে গিয়ে কুৎসা রটায় আর মুসলমান মারার উস্কানী দেয়!

উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত সমস্ত কাহিনীটা রামতরণবাবুর কানে যেতেই তিনি বললেন, আমি রিজাইন করব!

কমিটির দুই এক জন মেম্বার আহা উহু করা সত্ত্বেও রামতরণবাবুর পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। কয়েক দিন পরেই নতুন হেডমাস্টারের অত্যুৎসাহে স্কুলের উন্নতির খাতিরে মাইনে বাকীর জন্য অবিলম্বে কয়েকটি ছাত্রের নাম কাটা গেল। সোনা তাদের মধ্যে একজন।

কে একজন ছড়া বাঁধল, মাস্টার তাড়ানো হেডমাস্টার, ছেলেতাড়ানো বজলুস সাত্তার! মস্ত বড় বুকের পাটা, এক সঙ্গে দুই কান কাটা!

কিন্তু বজলুস সাত্তারের দুইকানে তুলো দেওয়া ছিল, সেইজন্যই কোনো ছাত্র এবং ছাত্রের গার্জিয়ানের কাকুতি মিনতি শুনেও সে শুনতে পেল না।

সোনা মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করল, মা মাইনে কবে দেবে?

মরিয়ম আদর করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, তোর বাপ ফিরে আসুক, তখন দেব।

বাপ কবে আসবে? যদি অনেক দেরী হয়!

না শিগগিরই আসবে দেখিস!

তা'হলে দু'টো পয়সা দাও না, জিলিপি খাব! ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

মনি পাশেই ছিল, বলল, মা আমাকেও কিন্তু দিতে হবে!

না এখন পয়সা নেই. কালকে দেব।

সোনা গোঁসা করার সুরে বলল, হ্যাঁ কালকে দেবে! তিন দিন ধরে বলছ, কিন্তু দিচ্ছ না।

হঠাৎ মরিয়ম ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল ছেলের গালে। হারামজাদা ছেলে জিলাপি খাবে! দাঁড়া তোকে আমি জিলাপি খাওয়াচ্ছি!

হালিমা এসে সোনাকে আড়াল করে দাঁড়াল, ছিঃ ছিঃ কী হচ্ছে! ছেলেমানুষ ওরা কি বোঝে!

মরিয়ম কিছু বলার আগেই বাড়ীতে এসে ঢুকল এরসাদ। সোনাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে ভাবী!

না, কিছুই হয় নি!

সোনা আর মনিকে হালিমা টেনে নিয়ে গেল বাইরে।

এরসাদ বারান্দায় উবু হয়ে বসল। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, ভাবী, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ!

এই লোকটাকে দেখে মরিয়মের ভিতরটা ঘৃণায় জ্বলে যাচ্ছিল, আত্মসম্বরণ ক'রে বলল, না ভালই তো আছি!

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

মরিয়ম একটু চুপ ক'রে থেকে শক্ত হয়ে বলল, আমরা যেমন থাকার থাকব, তুমি ভাই আর দয়া ক'রে এ-বাড়ীতে এসো না!

তা'হলে তুমিও বিশ্বাস করেছ ভাবী!

সে কথার জবাব না দিয়ে মরিয়ম শুধু পুনরাবৃত্তি করল, তুমি ভাই এখানে আর এসো না।

এরসাদ চিৎকার ক'রে উঠল, ভাবী! এ সব পুলিশ থেকে রটিয়েছে! এর একরত্তি সত্য নয়!

বিস্মিত হয়ে মরিয়ম বলল, পুলিশ থেকে রটিয়েছে!

হ্যাঁ! ঐ সোনাউল্লা! হারামজাদা আমার পেছনে লেগেছে! জানো

ভাবী আমাদের মধ্যে ওরা অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চায়! তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করো না ভাবী! আমি ঐ কথা শোনার পর থেকে মনের কষ্টে তোমাদের কাছে আসতে পারিনি।

মরিয়মের মনটাও প্রথমটায় ভীষণ দুলে উঠল। তারপর ভাবল, *এও কি অভিনয়! না ভুলের প্রায়শ্চিত্ত? অথবা সবটাই অকৃত্রিম?* মানুষের মাথায় একবার যখন সন্দেহ ঢোকে তখন তা সহজে ঘোচে না। কে জানে হয়ত কোনো দুর্বল মুহূর্তে পরিত্রাণের আশায় পুলিশের ফাঁদে পা দিয়ে আরো জড়িয়ে পড়েছে। কিম্বা সমস্তটাই সোনাউল্লার কারসাজি। কে জানে!

এরসাদ ইতস্ততঃ করে পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে বলল, ভাবী এটা রেখে দাও।

মরিয়ম হাতও বাড়াল না, টাকা নিল না, আস্তে আস্তে শুধু বলল, আমাদের অভাব আছে, কিন্তু টাকাটা তোমার কাছে থাক। দরকার হলে চেয়ে নেব।

এরসাদ উঠে দাঁড়াল, তুমি কোন দিন চাইবে না জানি।

মরিয়ম ম্লান হেসে বলল, মানুষের কথা কি কিছু বলা যায় ভাই।

এরসাদের বাপও হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর একদিন ঐ একই কথা বলেছিল, মানুষের কথা কি কিছু বলা যায়, আজ আছি, কাল নেই, মরার আগে যদি নাতিনাতনীর মুখ দেখে মরতে পারতাম! মরিয়মের সঙ্গে কথাবার্তার কয়েকদিন পরে এরসাদ আর বাপের কথা ঠেলতে পারল না। এরসাদ আপাতত স্বর্গসুখ অনুভব করে কাল কাটাতে লাগল।

এদিকে তমিজ বিশ্বাস এসে উপস্থিত হল একদিন। মরিয়ম ইচ্ছে করেই বাপকে কোনো খবর পাঠায় নি। বদনাভরা পানি দিয়ে পা ধুতে ধুতে তমিজ বিশ্বাস বলল, শুনেছি আমি সব কিছুই, কিন্তু কী করব ম্যালেরিয়ায় পড়েছিলাম! আর আমার ছেলে যা একখানা হয়েছে! কিছুতেই তাকে পাঠাতে পারলাম না! অথচ এত কাছে!

মরিয়মের মনের মধ্যে অনেক দিন পর একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। সে তাড়াতাড়ি সোনার হাতে মুড়ি বাতাসা আনার জন্য চারটে

পয়সা দিয়ে বলল, হালিমা আপাকে আসার সময় ডেকে নিয়ে আসিস!

সোনা ছুটে বেরিয়ে গেল।

তমিজ বিশ্বাস বলল, নে তাড়াতাড়ি সব জিনিসপত্র বেঁধে নে, একটা গরুর গাড়ী বাজার থেকে ডেকে আনি! কিন্তু কী দরকার ছিল তার এসব গণ্ডগোলের মধ্যে যাওয়ার।

বাপজান, গণ্ডগোল তো সে করে নি, বলতে গিয়ে মরিয়মের মুখে কথা বেধে গেল।

তমিজ মেয়েকে চুপচাপ দেখে ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞাসা করল, তোদের সুসময়ের বন্ধুরা এখন সব গেল কোথায়?

মরিয়ম মুখ ফিরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাপের খাওয়াদাওয়ার পর মরিয়ম সোজা বলে বসল, বাপজান, আমি যাব না!

কেন, কী হল!

কিছুই হয় নি, আমি যাব না!

না গেলে খাবে কি শুনি?

মরিয়ম আবার বলল, আমি যাব না বলছি!

না যাবি তো উপোষ ক'রে মর, আমি আর দেখতেও আসব না, বলে তমিজ বিশ্বাস রাগ ক'রে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল।

এক মাস গেল, দু'মাস গেল। ক্রমে মরিয়মের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। হাতের চুড়ি, কানের দুল, পায়ের অব্যবহৃত রুপোর মল সবই বিক্রী হয়ে গেছে। গয়না বলতে আর কিছু নেই। রাত্রে চোখে ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে মানু মিঞার কথাগুলো মনে আসে, মনে না করতে চাইলেও আসে—কি করব আমি, আমার পাঁচসাতজন খানেওয়ালা; সংসারে একটা লোক নেই যে, মুখের কথা বলে জিজ্ঞাসা করে! তারা কি তবে ম'রে যাবে! কিন্তু একথা আনিস কি জানে না? ভাবতে গিয়ে মরিয়ম কেঁপে ওঠে। ছিঃ ও কথা মনে আনলেও গুণাহ হয়।

গোপনে গয়না বিক্রী করার ব্যাপারে মানু মিঞাই সাহায্য করেছে। একদিন মরিয়ম মানু মিঞাকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, আমি সিঙ্গার মেসিনটা বিক্রী করব, একটু চেষ্টা ক'রে দ্যাখেন যাতে পানির দামে

বিক্রী করতে না হয়।

কিছুক্ষণ পর জবেদা এসে হাজির হল এবং তার পিছু পিছু মানু মিঞা। কোনো ভনিতা না করেই জবেদা বলল, আপা আমাকে সেলাইয়ের কলটা দাও! আস্তে আস্তে দাম শোধ করব আমি। বাজার দর যা হবে তার থেকে এক পয়সা কম দেবে না। তা'হলে আমি এবার থেকে নিজেই জামা সেলাই করতে পারব। আর কলটা আমার কাছে থাকলে তুমিও ব্যবহার করতে পারবে।

এক নিশ্বাসে এত কথা বলে আঁচল খুলে কুড়িটা টাকা জবেদা মরিয়মের হাতে দিতে গেল। মরিয়ম টাকা না নিয়ে বলল, যে জন্য বিক্রী করা, তাই যদি না হ'ল আমার বিক্রী ক'রে কী লাভ বলো! যা পাই এক সঙ্গে যদি পাই, সেই আমার ভালো।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মানু মিঞা বলল, বেশ দশদিনের মধ্যে যে-ক'রে পারি দাম শোধ করে দেব!

কত দেবেন?

একশ'র বেশী দিতে পারব না! মেসিন তো পুরনো, আর এখন খারাপ হয়ে আছে।

নিশ্বাস চেপে মরিয়ম শুধু বলল, আচ্ছা।

মানু মিঞা মেসিনটা ঘাড়ে ক'রে ঘর থেকে বেরুচ্ছে এমন সময় হালিমা এসে উপস্থিত। কোনো কথা না বলে হালিমার নীরব দৃষ্টির সামনে দিয়ে টালি ক্লার্ক আর তার বৌ চলে গেল।

হালিমাকেও বিনাবাক্যব্যয়ে চলে যেতে উদ্যত দেখে মরিয়ম বাধা দিল, আপা, কী করব, বুঝতেই তো পারছ।

না, কিছুই বুঝতে পারছি নে। কেন বাপের সঙ্গে তুমি গেলে না।

মরিয়ম উত্তর দিতে পারল না, কী যেন বলতে গিয়ে মুখ নত করল।

মুষ্কিল হল এই যে, বাকী টাকাটা পরিশোধ করার কোনো আগ্রহই দেখা গেল না মানু মিঞার। সে এ-বাড়ীমুখোই আর হয় না। সোনাকে পাঠিয়ে মরিয়ম কয়েকবার তাগাদা দিল। দেব দিচ্ছি ক'রে মানু মিঞা কেবলি এড়িয়ে যেতে লাগল। শেষে একদিন বলে বসল, তোদের মেসিন

তোরা নিয়ে যা। আমার টাকা ক'টা ফেরত দিয়ে যা তার আগে।

সোনার মুখ থেকে কথা শুনে মরিয়ম থ হয়ে গেল। টাকা শোধ করার কথাই আসে না, কবে তা বাষ্পের মত মিলিয়ে গেছে। ভয়ে হালিমাকেও কিছু বলতে পারল না মরিয়ম। ঐ লোকটার বিরুদ্ধে রাগে দুঃখে একদিন সে গুম হয়ে রইল। পরে মনে মনে তার হাসি পেল এক সময়। জবেদার মেসিনের সখ আছে, কিন্তু মানু মিঞার তা মেটাবার সাধ্য নেই। কী হবে রাগারাগি ক'রে। সোনাকে দিয়ে মরিয়ম মানু মিঞাকে ডেকে পাঠাল।

ঘরের আসবাবপত্র বিক্রী ক'রে দিতে হবে শুনে মানু মিঞা ঘাড় হেঁট ক'রে রইল। মলিন মুখে বলল, কী করব, আমরা অভাবী মানুষ, সাহায্য কিছুই করতে পারিনে। আর এভাবে কদ্দিন চালাবেন।

পরদিন ঘরের দু'খানা খাট, একখানা টেবিল, একটা কাচের এবং একটা কাঠের আলমারি, উঠানে টেনে বের করা হল। বাইরে ঠেলা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কলিকে সঙ্গে করে ঘোমটা টেনে কয়েকটা মুটের সামনে দিয়ে হালিমা এসে বাড়ী ঢুকল। কলি দৌড়ে গিয়ে মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করল, মা খাটপালং কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

সোনা বিজ্ঞতার পরিচয় দিল, তুই কিচ্ছু জানিসনে। মা সব বিক্রী ক'রে দিল।

কলি তবু কিছু না বুঝেই বলল, তা'হলে শোবো কিসের উপর ?

সোনা উত্তর দিল, মেঝের উপর। তুই একদম গাধা।

মনি ভাইকে শাসিয়ে বলল, আর তুই খুব পণ্ডিত।

হালিমা তিন ভাই বোনকেই ধমক দিল, যাও তো তোমরা বাইরে গিয়ে খেল গে।

ওরা চলে গেলে হালিমা বলল, মরিয়ম এখনো সময় আছে জিনিস-গুলো ঘরে তুলে নে। লোকগুলোকে ফিরে যেতে বল। আর তুই না পারিস আমি আজই তোর বাপের কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি। আনিস ফিরে এলে খালি ঘর দেখে কী বলবে বল তো।

মরিয়ম জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে রুক্ষ এলোচুলের গোছা। পরণের ময়লা কাপড়খানার দুই এক

জায়গায় হলুদের দাগ। পায়ের গোড়ালির দিকে ছিঁড়েছে খানিকটা।

হালিমা তার পিঠের উপর হাত রেখে অনুনয় করল, আমিতো জানি ঐ কাঠের জিনিষগুলো আনিস কত সাধ করে বানিয়েছিল।

মরিয়ম মৃদুস্বরে বলল, মানুষই যখন চলে গেল, কাঠ দিয়ে আমি কি করব।

প্রত্যুত্তরে হালিমার মুখে অনেকক্ষণ কোনো কথা জোগাল না।

১০

আত্মসম্মানবোধ যদি জাগে, অথচ তা রক্ষা করার শক্তি না থাকে, তা'হলেই মুস্কিল বাধে। মানসিক যন্ত্রণা চেতনা সাপেক্ষ। যার মনের স্বল্প বিকাশ, তার দুঃখবোধের পরিমাণও অল্প। তা যদি না হত, তা'হলে বাপের কথায় মরিয়ম এত কষ্ট পেত না, প্রতিবাদ করতেও যেত না। অথচ তিনটি ছেলে মেয়ে নিয়ে মর্যাদা রক্ষার শক্তিই-বা তার কোথায়। ঘরের বাইরে কোনদিন বেরোয়নি, এমন লেখাপড়া শেখেনি যাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে। চারপাশের রেলের মানুষের অবস্থাও এমন নয় যাতে সংগঠনের জোরে বেঁচে থাকার অন্তত হেলা-ফেলা একটা বন্দোবস্ত হয়। সবই মরিয়ম জানত, তবু মানের দায়ে কেন মেনেও মানা যায় না, নত হয়েও নত হওয়া যায় না, নিস্ফল জেনেও মনে গোঁ জেগে ওঠে!

তমিজ বিশ্বাস একদিন আবার এল, বলল, তোর মা না থাকলে আমি আর নিজের থেকে আসতাম না, দেখতাম তুই এভাবে আর কতদিন থাকতে পারিস। কিন্তু কেবল তোর মা আমাকে দুই বেলা জ্বালাতন করছে। আমার একমুঠো জুটলে তোর ছেলেমেয়েও উপোস থাকবে না।

অর্ধ-উপবাসেই মরিয়মের দিন কাটছিল, বাপের কথায় এবার আর দ্বিরুক্তি করল না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মনে মনে।

রওয়ানা হওয়ার সময় ঘরে তালা লাগিয়ে মরিয়ম চাবিটা হালিমার হাতে তুলে দিল। একমাত্র সম্পত্তি ছিল ঘরের বড় আয়নাটা। হালিমার ঘরের দেওয়ালে মরিয়ম নিজেই টাঙিয়ে রেখে এল। কলির সেই দোলনাটা টাঙান রইল বারান্দায়। সঙ্গে চলল শুধু বিছানাপত্র।

গরুর গাড়ি যখন বাপের বাড়ীর সামনে এসে থামল তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে।

প্রথমেই একখানা খড়ের ছাউনি দেওয়া নতুন বৈঠকখানা চোখে পড়ে। দেখলেই মনে হয় গৃহস্থের অবস্থা উন্নতির দিকে। অথচ তমিজ বিশ্বাসের হাতে পয়সাকড়ি বিশেষ ছিল না। সর্দারীর কাজে পঁচিশ বছর ধরে যা জমিয়েছিল সেটা বিঘে কয়েক জমি কিনতে, দুই মেয়ের ভালো ঘরে বিয়ে দিতে, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে এবং কিঞ্চিৎ শরীফ ঘরের মেয়েকে ঘরে আনতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। বাপের সমস্ত অভিলাষ ব্যর্থ করে দিয়ে মকসুদ পরীক্ষায় ফেল করে। মনের দুঃখে কচি বৌ রাহেলাকে ফেলে রেখে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। নারায়ণগঞ্জে পাটের আড়তে কেরাণীগিরির কাজ পায়। বছর দুই পরে ফিরে আসে। জমানো কাঁচা টাকায় পাটের ফড়িয়াগিরি সুরু করে। সারা বছর কাজ থাকে না বলে সে গ্রামেই একটা দোকান দিয়েছে। একটি মাত্র ছেলে গফুর, সংসারের খরচা এখনো বাড়ে নি। তমিজ বিশ্বাসের হাতে টাকা না থাকলেও মকসুদের হাতে দু'পয়সা আছে। সেই উদ্যোগী হয়ে বৈঠকখানা উঠিয়েছে এ বৎসর, আর বাড়ীর মধ্যে দু'খানা নতুন ঘর বানিয়েছে টিনের ছাউনি, সিমেন্টের মেঝে।

প্রথম অভ্যর্থনা জুটল রাহেলার কাছ থেকে। গাড়ী থেকে ননদকে হাত ধরে নামিয়ে রাহেলা পরিহাস করল, গ্রাম কি তোমাদের পছন্দ হবে, তোমরা আবার শহরের মানুষ!

মরিয়মের মুখে আসছিল, অবস্থাতেই সবই সয় ভাবী। কিন্তু চেপে গিয়ে সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও ঘাড় হেঁট করে রাহেলাকে সালাম করে বলল, ভাবী আমি তো এই গ্রামেরই মেয়ে!

মা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে মড়া-কান্না জুড়ে দিল, ওরে আমার কী হবে রে, আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে রে।

মায়ের উচ্ছ্বাসে মরিয়ম বাধা দিল, আহ্ চুপ করো মা! ধরে নিয়ে গেছে তো কি হয়েছে! সে চুরিও করে নি, ডাকাতিও করে নি।

রাহেলা মুচকী হেসে কলিকে কোলে তুলে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। মরিয়মের মা কান্না থামিয়ে সোনা আর মনির হাতে ডালায়

করে মুড়ি দিয়ে বলল, চল আমরা দুধ দোহাতে যাই!

মরিয়ম দাওয়ার উপর বসে পড়ল। একটা মহা ক্লান্তি যেন নেমে আসছে তার সর্বাঙ্গ বেয়ে। স্নেহের একটু পরিবেশের মধ্যে সামান্য নিশ্চিন্ত হ'তে পেরে এতদিন পরে যেন টের পাচ্ছে দেহমনে কত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে। আর উঠতেই ইচ্ছে করছে না, কিছু ভাবতেও ভালো লাগছে না। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বাড়ীর চার পাশের বাঁশ বাগান আর আম নারিকেল গাছগুলির মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না। ঝিঁঝিঁর ডাক যেন চারদিকের নিঃশব্দতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এমন নীরবতা শহর থেকে এলে প্রথম দিন অনুভব করার মত। দূর থেকে রেলের অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল। মরিয়মের সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। কত দূরে এসে পড়েছে সে! ঐ শব্দের সঙ্গে মনের তার যেন বাঁধা পড়ে গেছে। দূর থেকে দূরান্তরে চলেছে মানুষ, গতির ঝড় উঠেছে সেখানে। আর হয়ত কোনো এক জেলখানার পাশ দিয়ে চলে গেছে ঐ রেললাইন!

উঠোন থেকে গফুর ডাকল, ফুফু।

চমকে উঠে মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, কি বাবা!

ফুফু, চার আনা পয়সা দাও না।

পয়সা তো নেই বাবা!

না আছে, মাত্র চার আনা চাইছি তো! আমরা একটা কৌড়ে ঘুর্ণী বানাব।

রাহেলা পাশের ঘর থেকে ছেলেকে তাড়া দিল, পয়সা নেই দেবে কোত্থেকে? এদিকে আয়।

হঠাৎ গফুর একজন লোককে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে বলে উঠল, এই যে ফুপো, চার আনা পয়সা দিন না!

আগন্তুক ইসরাইল তরফদার ঈষৎ হেসে বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে একটা টাকা বের করে গফুরের হাতে দিয়ে বলল, ভাঙ্গানি নেই, এটাই নিয়ে যা!

ছেলেটা একটা লাফ দিল, কী মজা! তারপর ছুটে পালাল।

মরিয়মের মা একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে গেল বারান্দায়।

বড় ভগ্নিপতিকে উঠে সালাম করার ইচ্ছাটা মরিয়মের মনের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। সে একই ভাবে বসে রইল পাথরের মত।

ঘন কাঁচাপাকা দাড়ির মধ্যে হাত বুলিয়ে ইসরাইল বলল, কী বিবি সাহেবা, তোমাকে দেখতেই তো এলাম; তা মুখে কথা নেই কেন! মনটা এত ব্যাজার হলে কি চলে? একটু হাসতে দোষ কি। এতদিন পরে দেখা!

কোনো জবাব দেওয়ার আগেই পাশের ঘর থেকে ছুটে এল রাহেলা। হাতে শীতল পাটি। চোখ কপালে তুলে অভিমানের সুরে বলল, তা আমরা থাকতে বড়লোকের পা এদিকে পড়বে কেন! আজ এসেছেন আদরের মানুষ, তাই বড় লোকের দেখা মিলল!

একগাল হেসে ইসরাইল জবাব দিল, কি করব, ঘরের মানুষ না থাকলে পরের মানুষই খুঁজতে হয়!

তা আমরা বুঝি আর মানুষ না, বলেই রাহেলা জিভ কেটে তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বলল, অত যার টাকা তার আবার দুঃখ কিসের! কিন্তু বসুন, বসে কথা বলুন!

শীতল পাটিতে বসে ইসরাইল আত্মপরিতুষ্টির হাসি হাসল, দেখো ভাবীজান, টাকা থাকলে কি আর সব হয়! তবে এত তো দেখলাম, টাকা না থাকলে এ দুনিয়ায় কেউ কাউকে পোছে না।

কোথেকে ছুটে এল মনি। মরিয়মের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, মা শোন! গফুর ভাই আমাদের বলছে আমরা নাকি পথের ফকির! তোমার নাকি একটাও পয়সা নেই।

বিষণ্ণ মুখে মরিয়ম মেয়েকে তাড়া দিল। এখান থেকে যা, দেখছিস না কথা বলছি!

ইসরাইল জিজ্ঞাসা করল, ও কি চায়? পয়সা? আচ্ছা এই নাও!

মরিয়ম মেয়েকে বারণও করল না, সম্মতিও দিল না, কেবল মৃদু স্বরে বলল, এখন যাও তো মা।

মনি মায়ের মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

ইসরাইল টাকাটা পকেটে রেখে দিয়ে হাসল, বাবাঃ যেমন মা তার তেমনি মেয়ে!

মরিয়ম নিরুত্তর। তখন ইসরাইল একাই বলতে লাগল—আমি তো কতবার আমাদের ভাইয়াকে বলেছি, দেখ উন্নতি করতে চাও তো এস আমার সঙ্গে। আমার আড়তে লোকের অভাব নেই, তবু একজন বিশ্বাসী লোক যদি পেতাম! বিশ্বাস ছাড়া ব্যবসা চলে না। সে এলে তারও উন্নতি হত, আমিও বেঁচে যেতাম! রেলের ওটা আবার একটা চাকরী! খেয়েদেয়ে কী থাকে? রাজনীতি করতে চাও তাতেও তো টাকার দরকার। কিন্তু কে শোনে কার কথা! এখন হয়ত বুঝতে পারছ, গরীবের কথা বাসি হলে ভালো লাগে।

ইসরাইলের কথায় রাহেলা সায় দিল, নিজের ছেলেমেয়েকে পথে বসিয়ে এ কেমন কাজ গো! এ আমি বুঝিনে!

ইসরাইল রসিকতার চেষ্টা করল, আর আমিও বুঝিনে এমন যার বৌ সে কিসের টানে কমিউনিষ্ট ছোকরাগুলোর সঙ্গে মেশে।

প্রায়ান্ধকারে ইসরাইলের চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, নত আঁখি মরিয়ম দেখতে পেল না।

সোনা এসে তার গলা জড়িয়ে ধরল, মা আমি এখানে থাকব না!

ইসরাইল হেসে বলল, বলিস কি পাগলা! ফিরে যাওয়ার জন্য এসেছিস নাকি? ফিরতে অনেক দেরী! তোর বাপ জেল থেকে আগে বেরোক! তুই কোন ক্লাসে পড়ছিস রে?

সে আমি জানি নে, বলে সোনা উঠে চলে গেল। স্কুল থেকে নাম কেটে দিয়েছে, অতটুকু ছেলে সেই লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করল। মরিয়মের নত মুখ আরো নত হয়ে পড়ল, কারণ তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ইসরাইল জিজ্ঞাসা করল, তা বিবি সাহেবা, আমাদের বাড়ীতে কবে মেহেরবানী করে আসবেন? যদি আসেন পাল্কি পাঠিয়ে দিতে পারি।

রাহেলা বলল, পাল্কি আমরাও একদিন নোটিস দিয়ে রাখছি কিন্তু!

ইসরাইল মরিয়মের দিকে ফিরে আবার জিজ্ঞাসা করল, কবে পাঠাব?

চোখ না তুলেই মরিয়ম উত্তর দিল, পরে জানাব। হাসমতকে একবার পাঠাবেন।

সে তো এখন ঢাকায়, বলে ইসরাইল উঠে চলে গেল।

রাহেলা একমুহূর্ত মরিয়মের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করে রান্নাঘরে ঢুকল।

ক্রমে খাওয়াদাওয়া চুকে গেল, ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ল, রাত গভীর হল। কিন্তু মরিয়মের চোখে ঘুম এলো না। অনেকদিন পর বড় বোনের কথা মনে পড়ছে তার। আজ যদি জাহানারা বেঁচে থাকত! নিশ্চয়ই মরিয়মকে বুকে টেনে নিত। জাহানারা মরেছে দশ বছরের উপর, কিন্তু মনে হয় সেদিনের কথা। দেখতে না দেখতে দিনগুলি কোথা দিয়ে উড়ে চলে গেছে! সেই ছোট্ট হাসমৎ আজ কত বড় হয়েছে, পড়তে গিয়েছে ঢাকায়! ঢাকায় আছে আর একজন। সে কি ভাবছে এখন এত রাত্রে? মরিয়ম এখন কোথায় সেকথা কি সে জানে? কি করে মরিয়মের দিন কাটছে সে কি ধারণা করতে পারে।

চোখের পানিতে বালিশ ভিজে গেল। অনেক কেঁদে মরিয়মের বুক হাল্কা হল একটু। কিন্তু ঘুম তার চোখে আসছে না কিছুতেই। অসংলগ্ন চিন্তা চলেছে মাথার মধ্যে। দপদপ করছে কপালের শিরা-গুলি। কী করলে ঘুম আসে, শান্তি আসে? মরিয়ম উঠে বসল। মাথার কাছের হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিল। বাক্স থেকে টেনে বের করল পুলিসের হাত থেকে বাঁচান কতকগুলো কাগজ। এটা ওটা উল্টিয়ে মরিয়মের চোখে পড়ল বড় বড় হরফে লেখা 'পাকিস্তানে মুসলীম লীগ শাসনের দুই বছর।' মনযোগ দিতে চেষ্টা করল ঃ

'লীগ শাসনের দুই বছর জনগণকে স্বাধীনতা দেয় নাই দিয়াছে ইঙ্গ-মার্কিন ধনকুবেরদের গোলামী..." ইঙ্গ-মার্কিন কাকে বলে? "...নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা জমিদারী ক্রয়ের যে বিল আনিয়াছে তাহাতে জমিদারদের কোটি কোটি টাকার খেসারত দিতে হইবে..." বিল মানে কি? বিল আনলে খেসারত দিতে হয় কেন? "...পূর্ববাংলার মেহনতী চাষীর অমূল্য সম্পদ পাট। এই পাটের ব্যবসায়ে র‍্যালী-এন্ড্রিইয়ুল-লোহিয়া-ইস্পাহানি-আমিন ব্রাদার্স কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে। অথচ এবার পাটের দর নামিয়াছে দশ বারো টাকায়। এই পাটের শিল্পে কলিকাতার একচেটিয়া বৃটিশ পুঁজিপতিগণ মজুরকে শোষণ করিয়া

মুনাফার পাহাড় জমায়...” একচেটিয়া কি জিনিস? “...সেল্‌স ট্যাক্স বাড়াইয়া সরকার ক্রেতা ও ছোট দোকানদারদের উপর আক্রমণ করিয়াছে...” সেল্‌স ট্যাক্সের কথা কার মুখে যেন সে শুনেছে। “...গ্রামে গ্রামে মেহনতী কৃষকের বিরুদ্ধে ফৌজ লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বারবার গুলিবর্ষণে মাত্র গত এক বৎসরেই মারা গিয়াছে চট্টগ্রামের মাদারশায় সতের জন, ময়মনসিংহে দুই জন নারী সহ তেত্রিশ জন, রংপুরে দশ জন, খুলনায় তিন জন, মানিকগঞ্জে এক জন ও সিরাজগঞ্জে এক জন...” এত মরেছে! তবু বিচার নেই! “...পুলিস ময়মনসিংহ, রংপুর, খুলনা, যশোহর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় গ্রামের হাজার হাজার কৃষকের বাড়ী লুঠ করিয়াছে। ইহারা ময়মনসিংহ, রংপুর ও খুলনায় বহু নারীকে ধর্ষণ করিয়াছে...” মরিয়ম চোখ বন্ধ করল। এরা মানুষ না জানোয়ার! “...কিন্তু মানুষ বসিয়া নাই। কুষ্ঠিয়া ও নারায়ণগঞ্জের সূতাকল শ্রমিকগণ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও চাঁদপুরের পাট-প্রেসের শ্রমিকগণ গত এক বৎসরে বার বার ধর্মঘট করিয়া মালিকের আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে।...ছাত্র-সমাজও দমননীতি ও শিক্ষা সঙ্কোচের বিরুদ্ধে নভেম্বর মাস হইতে সুরু করিয়া সারা পূর্ববঙ্গে অবিরত ধর্মঘট ও বিক্ষোভ করিয়া চলিয়াছে। নভেম্বর হইতে এপ্রিল পর্যন্ত মোট সত্তর হাজার ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট করে ...দিনাজপুর, রংপুর, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার কৃষকেরা লালঝান্ডা হাতে লইয়া মজুরীবৃদ্ধি, আধি-প্রথা, টঙ্কপ্রথা খতম ও খাদ্য দখলের সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে...” ক্লান্ত হয়ে মরিয়ম সযত্নে কাগজগুলো ভাঁজ করে রেখে দিল। ঐ যে সব জেলার নাম, সেগুলো কতদূরে। কোথায়? সব জায়গাতেই কি রেল লাইন আছে? বাতি নিভিয়ে মরিয়ম শুয়ে পড়ল। চোখের সামনে ভেসে আসছে অস্পষ্ট ছবির মিছিল। দলে দলে মানুষ যেন চলেছে কোথায়, কেউ থামাতে পারছে না তাদের, হাজারে হাজারে তারা চলেছে, গুলি বন্দুক ভেদ করে তারা এগুচ্ছে, তাদের মনে ভয় ডর নেই। কিন্তু তারা এই ক্ষুদ্র গ্রামটিতে এসে দেখা দেয় না কেন? এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে তাদের গলার আওয়াজ শোনা যায় না কেন? তারা মরিয়মের পাশে

এসে দাঁড়ায় না কেন? আনিসও কি তাদের মধ্যেই মিশে আছে! এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল মরিয়মের চোখ থেকে। তারপর কখন একটা মহাক্লান্তিতে ধীরে ধীরে মরিয়মের চোখের পাতা বুজে এল।

১১

মাঘের শীতে বাঘা কাঁপে। মরিয়মের না ছিল আগেকার স্বাস্থ্য, না ছিল শীত সহ্যের ক্ষমতা। তবু সেদিন অতি ভোরে কনকনে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গোবর দিয়ে উঠোন নিকোতে সুরু করেছিল। তমিজ বিশ্বাস নামাজ সেরে বারান্দায় তাওয়া থেকে কল্কের মাথায় আগুন তুলতে তুলতে মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করল, বৌ ওঠেনি?

মরিয়মের বদলে তার মা জবাব দিল, কাজের দিন থাকলে আজকাল দেখি বৌ আরো দেরী করে ওঠে!

হুঁ বলে তমিজ বিশ্বাস হুঁকো টানতে লাগল চোখ বুজে।

মরিয়ম ঝাঁটাটা ধুয়ে হাতটা পরিষ্কার করে আবার একবার রাহেলার দরজায় এসে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, ভাবী, ভাবী!

ভাবীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মকসুদেরও সকালে উঠার অভ্যেস ছিল না। মাঠের কাজ সে কখনো করেনি, সকালে নামাজও সে কখনো পড়ে না, দোকান থেকে ফেরে রাত ক'রে, ওঠেও তেমনি দেরীতে। তমিজ বিশ্বাস মাঠের কাজ না করলেও নিজের হাতে বিঘে-খানেক জমিতে হলুদ চাষ করে প্রতি বছর। তা ছাড়া দু'একটা ছোট-খাট ক্ষেতের কাজ লেগেই থাকে, তাই সকালে উঠতেই অভ্যস্ত।

মরিয়ম গোয়াল ঘরে গেল, গাই আর বাছুরটাকে খুঁটি থেকে খুলে বাইরে এনে বাঁধল, আমনধানের তাজা খড় সামনে ফেলে দিল। তারপর কলাগাছের ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে কলার খোলা টেনে টেনে খুলে এনে জড় করল উঠোনের এক পাশে। সেগুলো বঁটি দিয়ে কাটল ছোট ছোট করে। ধামা ভর্তি করে বৈঠকখানার পাশে তামাক-ক্ষেতের কাছে এনে নামিয়ে রাখল। তমিজ বিশ্বাস ততক্ষণে উঠে এসে তামাকের চারায় পানি দিতে সুরু করেছে। মরিয়মকে দেখে বলল, জানিস তামাকের

উপর ট্যাক্স বসেছে, ক্ষেতের জন্য আবার লাইসেন্স চাই!

মরিয়ম উত্তর না দিয়ে কাঁচি চারাগুলি এক এক খণ্ড কলার খোলা দিয়ে ঢেকে দিতে লাগল। তমিজ বিশ্বাস তাকে বাধা দিল, আমি ওগুলো করব, তুই যা হলদি চড়িয়ে দে।

গাদা করা কাঁচা হলুদ, আর তার পাশে আর এক গাদা হলুদের মুথা। পাশেই আগের দিন মাটি খুঁড়ে দুটো চুলো বানান হয়েছে। খালি কেরোসিনের টিন বসিয়ে ধামাভর্তি করে হলুদ ঢেলে দিয়ে মরিয়ম মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, গোবর কই!

বাসন মাজতে মাজতে মরিয়মের মা উত্তর দিল, সাধুকে কাল বারবার বলেছিলাম, এখনও দিয়ে গেল না! সোনাকে একবার পাঠিয়ে দেখ না!

মস্ত এক ঝুড়ি গোবর নিয়ে সাধু নামধারী এক প্রৌঢ় প্রবেশ করল। তার দিকে চেয়ে মরিয়মের মা চমকে উঠল, কী সাধু, তোমার অসুখ নাকি?

সাধু উত্তর দিল, হ্যাঁ কাল রাত থেকে ভীষণ জ্বর! আজ আর কোথাও কাজে যাওয়ার মত শক্তি নেই। ঘরে কাল থেকে সবকটা উপোস দিচ্ছে। আবার বৌও নড়তে পারছে না জ্বরে। কী যে করি।

মরিয়মের মা একবাটি চিড়ে এনে ঢেলে দিল সাধুর গামছায়

মরিয়ম জলে গোবর গুলে দুটো টিনে ঢেলে দিয়ে চুলোয় আগুন জ্বালল। সোনাকে ডেকে বলল, তুই জ্বাল দে!

হলুদ সেদ্ধ করা একার কম্ম নয়, বিশেষত যেখানে শুকনো কলা-পাতা আর কলার বাকল দিয়ে হলুদ জ্বাল দেওয়ার রীতি। অনবরত চুলোর মধ্যে জ্বালানী গুঁজতে হয়।

প্রত্যেকটা টিনের দু'দিকে দুটো বংশদণ্ড দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আধঘণ্টা পরে মা মেয়ে দু'জনে মিলে সেই হাতলের সাহায্যে তপ্ত টিন উঁচু-করে-বসানো ঝুড়ির উপর সন্তর্পণে ঢেলে দিতেই জল নিঙড়ে গেল। নিকানো উঠোনের এক পাশে প্রথম কিস্তি সিদ্ধ হলুদ ঢেলে দিয়ে মরিয়ম কপালের ঘাম মুছল। মা বলল, হলদির দাম ভালো হ'লে তোর একটা আলোয়ান কিনতে বলব।

মরিয়ম এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সিদ্ধ হলুদের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছোটবেলা থেকে তার একাজ ভালো লাগে। কিন্তু ঐ যে তাজা তাজা রসালো হলুদগুলো সেদ্ধ করার পর চুপসে এতটুকু হয়ে যায় এবং তারপর সপ্তাহদুই রোদে পোড়ার পর ক্ষুদে ক্ষুদে শক্ত পাথরের মত আকার ধরে, এটা কোনদিনই তার ভালো লাগে না। মনে হয়, জন্তু মরলে যেমন শুধু তার কঙ্কাল থাকে, এও যেন তেমনি হলুদ নয়, হলুদের হাড়!

মা জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা জামাইকে তুই চিঠি লিখিস না কেন? একটা লিখেই দেখ না উত্তর আসে কি না।

মরিয়ম মুখ রাঙা করে জবাব দিল, গত মাসে লিখেছিলাম তো!

আর একখানা লিখে দেখ না!

মরিয়ম নিরুত্তর। মা তখন খেদের সঙ্গে বলল, তুই যখন ছোট ছিলি তখন তোর বাপ বলত এমন সুন্দর মেয়ে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না, ঘরজামাই ছাড়া মেয়ের বিয়ে দেব না! মেয়ে আমার আজ ঘরে, অথচ জামাই থেকেও নেই!

বৃদ্ধার মুখ থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। রাহেলাকে আসতে দেখে বলল, এবার আমি যাই, তোরা কাজ কর, আমি দানাপানির জোগাড় করি।

রাহেলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, বাব্বাঃ, আমার বাপের জন্মেও কোনো কালে হলুদ জ্বাল দিতে হয় নি। এ কী মেয়েমানুষের কাজ!

কিছুক্ষণ পর গফুর দৌড়ে এল, মা, বাপজান ডাকছে!

রাহেলা ঘরে যেতেই মকসুদ রেগে বলল, কি শুনতে পাওনা, এত ডাকাডাকি করছি। বাক্সের চাবীটা দাও।

আঁচল থেকে চাবীর গোছা খুলতে খুলতে রাহেলা অম্লানবদনে কৈফিয়ত দিল, কী করব তোমার আদরের বোন তো ননীর পুতুল! দেখতেই মাকাল ফল! যদি একটু ভালো ক'রে কাজে হাত লাগাবে! ঐ হলদির গাদা নিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে আমাকে।

মকসুদ বলল, তা'হলে কী পারে ও? একজন তো জেলে গিয়ে আছেন, ছেলেপুলে পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস।

রাহেলা ফোড়ন কাটল, সে কথা কী বলার জো আছে, মানুষে বলবে কি।

মকসুদ সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে মরিয়মের সামনে গিয়ে হাজির হল, বলল, কী, বাড়ীর কাজকর্মে অন্যলোকের সঙ্গে একটু হাত লাগাবে তাও তুমি পার না? মিলেমিশে কাজ করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

বিস্মিত মরিয়ম কী জবাব দেবে। জবাবের প্রত্যাশায় আসেওনি মকসুদ। যেমন হনহন করে এসেছিল ভর্ৎসনা ক'রে তেমনি হনহন করে চলে গেল।

মরিয়ম আঁচলে ঘাম মুছে হলদি ঢালতে লাগল।

মা এসে চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করি, ভানানী তো আজ এলো না। হাঁড়িতে আধ সেরের বেশী চাল নেই।

রাহেলা এসে দাঁড়িয়েছিল, বলে উঠল, থাকবে কি ক'রে! ক'টা-মুখ খায় দেখতে হবে তো! কথায় বলে বসে খেলে রাজার গোলা ফুরিয়ে যায়।

মরিয়মের মা রেগে গেল, দেখ বৌ, মুখে যা আসে তাই বল না!

রাহেলা মুখ ভ্যাঙচাল, না বলবে না! চাল এখন আসবে কোত্থেকে শুনি? এ মুল্লুকে কি ধার পাওয়ার জো আছে। দেশে যেন আকাল পড়েছে।

মরিয়ম বলল, মা, চল আমি ভেনে দেব।

মা বিস্মিত হল, তুই কি ক'রে ধান ভানবি! তুই কি কোনোদিন ঢেঁকিতে পা দিয়েছিস নাকি!

মরিয়ম বিনাবাক্যব্যয়ে ঘরে ঢুকে ধামার ধান নিয়ে ঢেঁকিটার কাছে গেল। মা তার পিছনে পিছনে এসে বলল, আচ্ছা জেদী মেয়ে তুই!

সব কাজ শেষ করে ঠান্ডা পানিতে গোসল সেরে যখন মরিয়ম ঘরে এল, তখন তার সারা শরীর কাঁপছে। বিছানা পেতে গায়ে একখানা কাঁথা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

রাহেলা ঘরে গিয়ে স্বামীকে বলল, দেখে এস তোমার বোনের কান্ড, রাগ ক'রে না খেয়ে শুয়ে আছে।

মকসুদ জবাব দিল, তোমাদের মেয়েলী ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই। তারপর রাগতভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মরিয়মের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কী, রাগ ক'রে না খেয়ে আছিস কেন?

মরিয়ম ধড়মড় ক'রে উঠে বসে জবাব দিল, রাগ করব কেন! আমি তো রাগ করিনি!

না রাগ করনি! তোমাদের জ্বালায় খেটে খেটে অস্থির হলাম, বাড়ী এসেও স্বস্তি নেই। যা ভাত খা গিয়ে, বলছি!

মরিয়ম উঠল না, ভাতও খেল না। বেশ প্রবল বেগেই জ্বর এলো তার সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে।

বারান্দায় সোনা মনি কলি আর গফুর খেতে বসেছিল একসঙ্গে।

সোনা অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, আর একটু ভাত!

বলাই বাহুল্য হাঁড়িতে মরিয়মের উদ্বৃত্ত ভাত মজুত ছিল, কিন্তু রাহেলা চেঁচিয়ে উঠল, আর ভাত কোথায়? কুকুরটার জন্য কেবল এক বাটি আছে।

শেষে কী ভেবে এক গাদা ভাত এনে রাহেলা সোনার পাতে ঢেলে দিয়ে বলল, নাও খাও! এমন পেটও বাবা দেখিনি সাত জন্মে!

সোনা উঠে দাঁড়াল, না, আমি খাব না!

এদিকে তো দেখছি গোঁসা আছে ষোল আনা! তা'হবে না, যেমন ঝাড় তার তেমনি বাঁশ!

মরিয়ম ঘরের মধ্য থেকে জ্বরের ঘোরে শ্রান্ত কণ্ঠে বলল, ছেলে-মানুষের কাছে ও সব কী বলছ!

না বলবে না! গণ্ডায় গণ্ডায় জন্ম দেওয়ার সময় তো আটকায়নি। মাগ ছেলের ভাত দিতে পারে না, জেলে গিয়ে দেশোদ্ধার করছেন। আল্লা মানে না, রসুল মানে না, ছেলে বৌয়ের দিকে নজর নেই, আর চিরকাল বড় বড় কথা! সোয়ামীর উপর যখন এত দরদ তখন আমাদের উপর অত্যাচার কেন? দেশের কাজ করছেন, তো দেশের লোকের কাছে গেলেই হয়। তা দেশের লোক তো তোমাদের লাথি মেরে খেদিয়ে দিয়েছে।

তমিজ বিশ্বাস কখন এসে দাঁড়িয়েছিল, রাহেলা খেয়াল করে নি। মাথায় ঘোমটা টেনে সে ঘরে চলে গেল।

রাত্রে মকসুদ বাড়ী ফিরলে তমিজ বিশ্বাস বলল, দ্যাখ বৌকে বলে দিস সংসারটা এখনো আমার। আমার মেয়েকে আমি নিয়ে এসেছি

তাকে যেন যা খুশী তাই না বলে।

পাটের দর আরো দু'টাকা নামার খবর শুনে মকসুদ প্রায় মাথায় হাত দিয়ে এতক্ষণ দোকানে বসে ছিল। এখন বাপের কথায় রেগে গিয়ে আদ্যোপান্ত কিছু না শুনেই জবাব দিল, আলবৎ বলবে! এত-গুলি লোক ঘাড়ের উপর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো আজকাল কে সহ্য করে? বুঝতাম লোকটা মরে গেছে, কি অথর্ব হয়ে গেছে, তাও একটা কথা ছিল। সংসারের ঠেলাটা মাথার উপর দিয়ে কি ক'রে যায় তা এক আমিই বুঝি।

বৃদ্ধ তমিজ বিশ্বাস গর্জে উঠল, মুখ সামলে কথা বলিস! আমি এখনো মরিনি! ছেলের পয়সায় খাব এই প্রত্যাশা আমি কোন দিন করিনি, করবও না!

মকসুদ ততোধিক চিৎকার ক'রে উঠল, এখন তবে কার পয়সায় খাচ্ছ?

তোর পয়সায়?

আলবৎ! ক'বিঘে তোমার জমি? ক'মণ তাতে ধান হয়?

ক্রোধে ক্ষোভে তমিজ বিশ্বাসের গলা ভেঙেগ পড়ল, ওরে নেমক হারাম! এই জন্যই তোকে এত বড় করেছিলাম, এত কষ্ট ক'রে লেখা-পড়া শিখিয়েছিলাম!

বাপগিরি ফলাতে এস না বলছি!

বেশ তাই হোক, কাল থেকেই তুই আলদা হয়ে যা। আমার বরাতে যা থাকে তাই হবে! তুই তো বড়লোক হ? আল্লা আমাকে দু'মুঠো দেয় খাব, না দেয় উপোস ক'রে পড়ে থাকব, কিন্তু তোর কাছে হাত পাতব না!

মরিয়মের মা বাপছেলের মাঝখানে এসে কপাল চাপড়াতে লাগল, তোমরা থাম! নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব!

কিন্তু তমিজ বিশ্বাসের কথার নড়চড় হল না। পরদিন থেকে বাপ-ব্যাটায় পৃথক হয়ে গেল।

১২

ওদিকে ইসরাইলের সঙ্গেও তার ছেলের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। বাপকে হাসমৎ একদম সহ্য করতে পারত না। তার কারণও ছিল। হাসমতের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন জাহানারা মারা যায়। জাহানারার মৃত্যুর পর ইসরাইল দুই মাসও অপেক্ষা করেনি। নতুন বিমাতার কাছে প্রথম কিছুদিন হাসমৎ আদরযত্ন যে পায়নি তা নয়। কিন্তু তারপরেই সৎমায়ের কোলে দুটি সন্তান এল, হাসমতেরও বয়স একটু বাড়ল, কিশোর বয়সের মন নিয়ে বুঝতে শিখল কিছু, যা বুঝতে পারল না তাও বুঝিয়ে দেবার লোক জুটল। বিমাতার অবহেলা আর বাপের অনাদরের জ্বালা জুড়োবার একটা ঠাঁই হয়ে উঠল নানার বাড়ী। নানানানীর স্নেহ আর মরিয়মের আদরের মধ্যে দিনের কয়েক ঘণ্টা সে কাটিয়ে যেত তমিজ বিশ্বাসের বাড়ীতে।

কিন্তু সৎমাটিও মারা গেল! ইসরাইলকে তার জন্য বিমর্ষ দেখা গেল না। কারণ সৌভাগ্যবান পুরুষেরই বৌ মরে!

এবং সৌভাগ্য যেন ইসরাইলের ফেটে পড়তে লাগল। পাকিস্তান হওয়ার পর তার চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী মহেন্দর সরকার নিজের পাটের আড়তটা তার উপর ছেড়ে দিয়ে চলে গেল ভারতে। সেখানে মহেন্দর কাস্টমস ডিউটী ফাঁকী দেওয়ার জন্য 'পাকিস্তানী জুট' নাম দিয়ে কারবারের নামে বিস্তার করল এক চক্রান্ত জাল। ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান পাটের দাম হু হু করে যত নামতে লাগল তত উপরে উঠতে লাগল ইসরাইল মহেন্দরের মুনাফা। কেননা সস্তাদরের পাট ইসরাইল-মহেন্দর-বর্ডার পুলিশের যোগসাজসে আরো বেশী বেশী পরিমাণে নিয়মিত ভাবে পেঁৗছে গেল গঙ্গার দুপাশের জুটমিলের গুদামে। চটকলের সাহেবরা বাজার দরের চেয়ে কম দামে পাট পেয়ে মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে নিল, আর উদ্বেগের জগতে নিরুদ্বেগে জয়েন্ট পার্টনারসীপে ইসরাইল-মহেন্দর নতুন নতুন ব্যবসা সুরু ক'রে দিল। সুপারী থেকে পান, মাছ থেকে হোগলা পাতা কিছুই বাদ গেল না। সীমান্তের বেড়া পার হয়ে রাতের অন্ধকারে কখনো নৌকোয় কখনো গরুর গাড়ীতে গোপন মৈত্রীর কারবার ফুলে ফেঁপে উঠল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পঞ্চাশ সালের দাঙ্গা বাধল। আনসার বাহিনীর নেতৃত্বে হিন্দুদের বাড়ী এবং জমি দখলের আশায় গ্রামের একদল গরীব চাষী এবং রেলকলোনীর একদল অবাঙালী উদ্বাস্তু সড়কী বল্লম নিয়ে জোট পাকাল। বাড়ীর পাশের ঐ সব জমিজমার উপর লোভ ছিল ইসরাইলের। সে সব এখন দাঙ্গাবাজ কৃষক আর উদ্বাস্তুর হাতে চলে যাবে আশঙ্কায় ইসরাইল বন্দুক নিয়ে এসে বাধা দিল, চিৎকার ক'রে উঠল, আমি থাকতে একটা হিন্দুকে উৎখাত করা চলবে না! আনসার ক্যাপ্টেন হবিবুর ইসরাইলের বাড়ীতে 'খানা' খেয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল, ভালো ওস্তাদের হাতে আপনার শিক্ষা হয়েছে!

ইসরাইল হেসে বলল, ইসলামের অর্থ শান্তি।

কাজেই সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইলের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

যে উদ্দেশ্যেই হোক কাজটা যেহেতু ইসরাইলের ভালো ছিল সেজন্য ওর জালের মধ্যে নিজেও সে খানিকটা জড়িয়ে পড়ল। তিন ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার এসে যখন তাকে অনুরোধ জানাল, আমাদের রুজিরোজগার নেই এখানে, আপনি যাহোক আমাদের ব্যবস্থা করুন, মোটামুটি একটা দাম পেলেই আমরা জমিজমা বাড়ী বিক্রী করে চলে যাব, তখন ইসরাইলকে বলতে হল, এখন আর আমার জমি কেনা চলে না, লোকে হাসবে, বলবে এই জন্যই আমি দাঙ্গা ঠেকিয়েছি!

এরপর থেকে ওরা উঠে যাওয়ার চেষ্টা করলেই ইসরাইল ওদের কিছু কিছু সাহায্য করে ঠেকিয়ে রাখতে লাগল! ফলে এদেরই মধ্যে যোগেন গাঙ্গুলি নামে এক ব্যক্তি ইসরাইলের পরম অনুরক্ত হয়ে উঠল। দুই-বঙ্গে যাতায়াত থেকে সুরু ক'রে ইসরাইলের বাড়ীতে দারোগা-সার্কেল অফিসার-এস-ডি-ওর অভ্যর্থনার কাজ সবই তাকে করতে হত।

ছেলেকে ইসরাইল ব্যবসাতে ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাপের কাছ থেকে দূরে থাকার নেশায় হাসমৎ রাজী হয় নি তাতে। দ্বিতীয় বৌ মরে যাওয়ার পর ইসরাইল আর বিয়ে করে নি, বিধবা বোনের বিধবা ননদের রূপ দেখে তাকে বাড়ীতে এনে আশ্রয় দিয়েছিল এবং তাকে বিয়ে করার প্রয়োজনও অনুভব করে নি! তার মুখের উপর

কথা বলে এমন সাধ্যও ছিল না কারো। কিন্তু বাপের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল হাসমতের।

এবার যেদিন সে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী এল সেদিনই যোগেন গাঙ্গুলি বলল, তোমার বাপের ইচ্ছা তোমার মরিয়ম খালাকে কয়েকদিন এ বাড়ীতে এনে রাখে। তুমি বললে হয়ত রাজী হবে। ওদের দুঃখ কষ্টে দিন যাচ্ছে, এতে ভালোই হবে।

এ কথা শুনে বহুকাল পরে বাপের প্রতি একটু আকর্ষণ অনুভব করল হাসমৎ। জিজ্ঞাসা করল, বাপ কেন আমাকে এ-কথা বললেন না?

যোগেন গাঙ্গুলি হেসে উত্তর দিল, তুমি যে ছেলে, তোমাকে কোনো কথা বলতেই তো তোমার বাপ সাহস করে না!

একটু চুপ করে থেকে হাসমৎ হেসে বলল, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনি যদি কিছু মনে না করেন। হিন্দু হয়ে আপনি লীগের দালালী করেন কী করে?

মুখ অন্ধকার করে যোগেন গাঙ্গুলি জবাব দিল, আর একটু আদব কায়দা শেখা তোমার উচিত ছিল। লীগ যখন পাকিস্তান বানিয়েছে তখন লীগকে স্বীকার করতেই হবে!

ও তাই বুঝি, বলে হাসমৎ বেরিয়ে পড়ল।

হাসমতকে দেখে রাহেলা খুসি হল, বলল, এই যে বড়লোকের ছেলে কবে এলে?

মকসুদ ঘরেই ছিল, বের হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ক'দিন থাকবি?

গফুর ছুটে এল, আমার জন্য কি এনেছ হাসমৎ ভাই?

কোন প্রশ্নেরই জবাব না দিয়ে হাসমৎ বলল, বাড়ীখানা দুভাগ করে ছেড়েছ দেখছি! এখানে এসে একটু বসা-ওঠা যেত, এখন দেখছি তারও উপায় রইল না।

মকসুদ প্রায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, সে কথা আমাকে কেন বাপজানকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর!

দেখো মামা, আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে আসিনি! এ বাড়ীর হিন্দুস্তান-পাকিস্তান একটু দেখে যাই! কই, খালা কোথায়?

রাহেলা মুখ ব্যাজার করে উত্তর দিল, ও দিক দিয়ে ঘুরে গেলে

দেখতে পাবে। যাও আপন খালার কাছেই যাও! আমরা তো পর বই কিছু নই!

হাসমৎ বাধা দিল, থাম! পর হ'লে কেউ ঝগড়া করতে আসে না!

রাহেলা একটু নরম হয়ে মিনতি করল, হাসমৎ, একটু বস, দুধটা গরম ক'রে আনি! তোরা তো শহর বাজারে খাঁটি দুধ পাস না!

দুধের বাটি নিঃশেষ ক'রে হাসমৎ ঘুরে বাড়ীর অন্য দিকটায় প্রবেশ করল। খেজুর পাতার পাটি বুনছিল মরিয়ম, কাজ বন্ধ না করেই ডাকল, আয় হাসমৎ! অনেকক্ষণ ধরেই তোর কথা কানে আসছিল।

বেড়ায় ঠেস দেওয়া আরো গোটা দুই খেজুরের পাটির দিকে আঙ্গুল উ'চিয়ে হাসমৎ প্রশ্ন করল, কী খালা, খেজুরের পাটির ব্যবসা করছ নাকি!

মরিয়ম মুখ টিপে হেসে বলল, কী করি বল! গরীব মানুষ, সংসার চালাতে হবে তো! তোর বাপের মত তো আমার বাপের টাকা নেই! মনি, তোর ভাইকে বসতে দে।

হাসমতের মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। পি'ড়ির উপর বসে পড়ে একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল, খালুর খবর টবর কিছু পাওয়া যায়?

মরিয়ম জবাব দেওয়ার আগেই মস্ত একটা ঝুড়ি মাথায় করে বাড়ী ঢুকল তমিজ বিশ্বাস। পিছনে সোনা, তার মাথাতেও একটা ঝুড়ি।

তমিজ বিশ্বাস বোঝাটা নামিয়ে বলল, কবে এলি, বুড়োকে একটা চিঠিও দিতে নেই!

সে কথার উত্তর না দিয়ে হাসমৎ ঝুড়ি ভর্তি বেগুন, কপি, মরিচ, আর শাকের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল, এত সব কোথা থেকে আনলে নানা?

তমিজ বিশ্বাস চুপ করে রইল। ছেলের সঙ্গে পৃথক হবার পর থেকে মেয়ের পরামর্শে সে সুরু করেছে শাকসব্জির চাষ। বিকালে ঝুড়ি ভর্তি ক'রে তুলে আনে, পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ে রেল-কলোনীর বাজারের দিকে। কোনো কোনো দিন সোনাকেও ডেকে নেয়। হাঁস বা মুরগীর ডিম পেলে মরিয়ম গামছায় বে'ধে ছেলের হাতে

দিয়ে পাঠায় বাপের সঙ্গে।

উত্তর না পেয়ে হাসমৎ এবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বাপ ব্যাটায় ঝগড়া করলে কেন?

এবার বৃদ্ধ ফেটে পড়ল, দ্যাখ হাসমৎ ছেলেই হোক আর জামাইই হোক বড় হয়ে গেলে কেউ মুখের দিকে তাকায় না। নইলে আমার এই বুড়ো বয়সে এত সব সয়? কোথায় বসে বসে দু'টি খাব, তা নয় শাকের ঝুড়ি মাথায় করে আমাকে বাজারে যেতে হয় রোজ রোজ।

মরিয়ম একখানা কাঁসার বাসনে মুড়ি আর গুড় এনে রাখল বাপের সামনে। সোনা প্রায় হুমড়ী খেয়ে পড়ে এক মুঠো নিয়ে মুখে দিয়ে মচমচ করে চিবোতে চিবোতে বলল, মা, যা আমার ক্ষিদে পায় বিকালে!

তমিজ বিশ্বাস রাগের ভান করল, ওরে রাক্ষস, এতগুলো যে জাম পেড়ে দিই রোজ রোজ, সেগুলো যায় কোথায় শুনি?

সোনা সাফ জবাব দিল, কোথায় যাবে, খালি আঁটি। ক্ষিদে যায় কখনো জাম খেলে? যত খাই তত মনে হয় আরো খাই।

ছেলের কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল মরিয়ম, তা একটাও বুঝি ভাই বোনের জন্য বাড়ী আনতে নেই?

এই নে, বলে সোনা কোঁচড় থেকে কয়েকটা কালো জাম তুলে মনি আর কলির হাতে দিতে লাগল গুণে গুণে। সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে ঘাড় নেড়ে বলল, আমার কাছে বাবা সমান সমান ভাগ!

এ দৃশ্য দেখে হাসমৎ যেন আর দাঁড়াতে পারছে না। সে উঠে পড়ে বলল, খালা আমি যাই আজ, আবার আসব কাল।

ছেলেকে মরিয়ম তাড়া দিল, সোনা, তোর হাসমৎ ভাইকে দিলি নে?

লাজুক চোখে হাসমতের বেশভূষার দিকে তাকিয়ে সোনা গোটা কয়েক দিতে গেল তার হাতে।

না আমি খাব না, বলে বেরিয়ে পড়ল হাসমৎ। যোগেন গাঙ্গুলির কথাটা এই মুহূর্তে মরিয়মকে বলা অসম্ভব মনে হল তার কাছে।

ঝগড়ার মনোভাব যেখানে বিদ্যমান সেখানে হেতুর অভাব হয় না।

ঐ যে হাসমৎ আসে আর তার খালার ঘরে ওঠে বসে এবং গল্প

গুজব করে চলে যায় এতেই রাহেলা যেন ক্ষেপে গেল আরো।

তুচ্ছ কারণেই সেদিন পাকিয়ে উঠল ঝগড়াটা। বাড়ীর মধ্যে বেড়া দিয়ে মানুষকে ঠেকানো যায়, কিন্তু মোরগমুরগীকে ঠেকায় সাধ্য কার। সাধু শেখের বাড়ী থেকে একটা বাচ্চা মোরগ এনে পুষতে সুরু করেছিল মনি, মাস দেড়েকের মধ্যে সেটা প্রায় যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে কঁককঁক শব্দে বাড়ী উতলা করে তুলল এবং দিব্যি বেড়া ডিঙিয়ে ও বাড়ীতে যা খুশী তাতে মুখ দিয়ে ফিরতে লাগল। শীতের রোদে রাহেলা মটর মসুর আর সেদ্ধ ধান দিয়েছিল শুকোতে, মোরগটাকে কয়েকবার তাড়িয়েও নিরস্ত করতে না পেরে ছেলের উদ্দেশ্যে রাহেলা চিৎকার করে উঠল, দে তো গফুর ওটার ঠ্যাং ভেঙে।

গফুর কয়েকটা ঢিল মারতেই মোরগটা উড়ে গিয়ে পড়ল ও-পাশে মরিয়মের মার ঘাড়ের উপর আর বেড়ার এ পাশ থেকে গফুর আবৃত্তি করতে লাগল, আগার রান পাছার রান, দিল কলজে মেটে খান, মোল্লার কাল্লা, আল্লা হো আকবর।

মরিয়মের মা চেঁচিয়ে বলল, দ্যাখ বৌ, বাড়ীতে মোরগমুরগী থাকলে জিনিসে মুখ দিয়েই থাকে। তা বলে—

রাহেলা পাল্টা জবাব দিল, তা'বলে আমারও দশখানা হাত নেই, আর তোমার মেয়ের মত রাক্ষসের পাল নেই যে উঠোনে পাহারা বসাব।

তুই তুকারী করিস নে বৌ! ভালো হবে না বলছি! মটর মসুর তোমার বাপের বাড়ীর থেকে আসেনি খেয়াল থাকে যেন।

মকসুদ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, মা, তোমাদের ঝগড়ায় কি আমি পাগল হয়ে যাব! কারো বাপ মা তুলে কথা বলো না!

মা তখন চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল, শেষে বৌয়ের পক্ষ হয়ে তুইও ঝগড়া করতে এলি!

মকসুদ বোঝাতে চেষ্টা করল, দ্যাখো মা, এই জন্যেই বাড়ীতে আমি মোরগমুরগী পুষতে দিই নি। ও জিনিস থাকলে পরের বাড়ীতে যাবেই, আর ঝগড়া বাধবেই! গোস্ত না খাই সেও ভালো, একটু শান্তিতে থাকতে চাই।

মরিয়মের মা আরো অশান্ত হয়ে উত্তর দিল, তোর বৌ করল আমাকে

অপমান, আর তুই এসেছিস আমাকে বোঝাতে।

মা, আমি তোমাকে কিছুই বোঝাতে চাই নে, কিন্তু দেখছি তোমার যত দরদ সে তোমার ঐ মেয়ের জন্যই!

মরিয়ম এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, এখনো কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সে ঘরের মধ্যে গিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর খেজুরের পাতা টেনে নিয়ে নতমুখে পাটি বুনতে লাগল।

কিন্তু পরদিন সকালে মোরগটাকে ধরে বাপের হাতে দিয়ে বলল, যে দামেই হোক বিক্রী ক'রে দিয়ো।

মনি ছোঁ মেরে তমিজ বিশ্বাসের হাত থেকে মোরগটা কেড়ে নিল। তারপর সাশ্রুনয়নে বলল, আমার জবাকে আমি বিক্রী করতে দেব না।

মনি ওটার নাম রেখেছিল জবা। টকটকে লাল জবা ফুলের মতই ঝুঁটিটা নেড়ে মোরগটা স্থির হয়ে রইল মনির ক্ষুদ্র বুকের উপর।

এ মোরগ আমি বাড়ীতে রাখব না কিছুতেই, বলে মরিয়মের মা মনির বুকের মধ্য থেকে জবাকে ছিনিয়ে নিল জোর করে।

উঠানে ধুলোর উপর কেঁদে গড়াগড়ি গেল মনি। তমিজ বিশ্বাস মোরগটা সোনার হাতে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নে জলদি চল।

সেদিন রেলকলোনীর বাজারে পেঁছতে বেশ একটু বেলাই হয়ে গেল দু'জনের। তবু তমিজ বিশ্বাসের তরীতরকারী বিক্রী হয়ে এল, কিন্তু সোনা মোরগটাকে ধরে বসে আছে একই ভাবে। দরে পোষাচ্ছে না কিছুতেই। ডিমের একটা বাঁধাধরা দর থাকে, তরী তরকারীও সের দরেই বিক্রী হয়, এমনকি পুঁইয়ের ডাঁটাও দাঁড়িপাল্লায় উঠতে সুরু করেছে, কিন্তু মোরগমুরগী এখনো উঠতে পারেনি যে পর্যায়ে!

শেষে একজন সরু গোঁফ হাতে-ছড়ি অফিসার এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে থলি-হাতে রেলের উর্দীপরা এক পয়েণ্টস্‌ম্যান।

ছড়ি দিয়ে মোরগটার গায়ে খোঁচা মেরে অফিসারটী জিজ্ঞাসা করল, ইসকা কেতনা দাম!

মুখ তুলে অফিসারটিকে চিনতে পেরে সসম্ভ্রমে সালাম করল তমিজ বিশ্বাস। রেলের পাথওয়ে ইন্সপেক্টর মহম্মদ শুক্কুর। তমিজ বিশ্বাসের অতিভক্তির কারণ, গ্যাংম্যানের সর্দার হিসাবে জীবনের বৃহত্তর অংশ তার

কেটেছে ঐ পাথওয়ে ইন্সপেক্টরদের হুকুমবরদার হয়ে।

শুক্কুর আবার জিজ্ঞাসা করল, কেতনা দাম।

হুজুর, আপনি বলুন!

এতনা ছোটা বাচ্চা, এক রুপেয়া দেগা!

তমিজ বিশ্বাস চুপ করে রইল। যারা মোরগ পোষে এবং যারা মোরগ খায় তাদের মন মেজাজই আলাদা।

তমিজ বিশ্বাস ডবল দাম চেয়ে বসল, হুজুর দো রুপেয়া।

ছড়ি ঘুরিয়ে শুক্কুর মহম্মদ বলল, ক্যা হিঁয়াপর হিন্দুস্তান মিলা?

তমিজ বিশ্বাস উষ্মা চেপে জবাব দিল, হুজুর, পাকিস্তান হয়েছে বলেই তো সস্তায় পাচ্ছেন!

জরুর! হামলোক পাকিস্তান বনায়া। তুম বাঙ্গালীলোক কুছ নহি কিয়া। তুমলোগ ভাত খানেওয়ালা।

কী কথার কী উত্তর। তমিজ বিশ্বাস এবার বলে ফেলল, হুজুর আপনি মানী লোক, একটু বুঝেসুঝে কথা বলবেন। অন্য কেউ হলে—

ক্যা, তুম উল্লুকা পাঠ্ঠা, তুম ক্যা বলতা হ্যায়—

তমিজ বিশ্বাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল, মুখ সামলে কথা বলবেন।

অবিলম্বে চারপাশে জমে গেল বাঙালী আর অবাঙ্গালীর ভীড়। এখানেও ঝগড়ার মনোভাব ছিল, কাজেই হেতুর অভাব হল না।

'শালা বিহারী'! 'শালা বাঙ্গালীলোক'! চার পাশ থেকে ছুটতে লাগল গালাগালির গোলা-গুলি। জিনিষ ছিনিয়ে নেওয়া, কম দাম দেওয়া এখানে রেলের নবাগত অফিসারদের দ্বারা এতবার সংগঠিত হয়েছে যে, এবার তরীতরকারী বিক্রেতাদের মনে বিস্ফুরিত হয়ে উঠল ক্ষোভ আর ক্রোধের জমা বারুদ।

দেখতে না দেখতে লেগে গেল মারামারি।

মহম্মদ শুক্কুরের ছড়িখানা আচমকা এসে লাগল সোনার মাথায়! ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটল! আর সেই সঙ্গে তার হাত থেকে কে কেড়ে নিয়ে গেল মোরগটা!

লুট হয়ে গেল তরকারী এবং মনোহারী দোকানগুলো!

কিছুক্ষণের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল বাজারটা। সোনাকে কাঁধে তুলে

ছুটতে লাগল তমিজ বিশ্বাস। রাস্তায় কে একজন তাকে থামিয়ে পরামর্শ দিল, পাথওয়ে ইন্সপেক্টরের নামে থানায় ডাইরী করাও। আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। সাক্ষী দেব।

থানা সম্পর্কে তমিজ বিশ্বাসের মনে ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট থাকায় থানার উল্টো দিকে আবার দৌড়তে লাগল সে। একটা ডাক্তারখানা দেখে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে।

ডাক্তার বলল, রক্ত পড়েছে খুব বেশী, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হলে তমিজ বিশ্বাস কোমর থেকে আনি দুয়ানি সিকি বের করছে দেখে ডাক্তার তাকে বাধা দিল, পয়সা রেখে দাও, পয়সা আমি নেব না। শালা বিহারীদের বাংলাদেশ থেকে তাড়াতে হবে।

সোনাকে কাঁধে নিয়ে যখন তমিজ বিশ্বাস বাড়ী পেঁাছল তখন মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। গ্রামে তার আগেই ছড়িয়ে পড়েছে শহরের খবর। শুধু তারা জানত না আহত হয়েছে কারা, ঘটনা সুরু হয় কী নিয়ে।

ছেলেকে দেখে মরিয়মের মুখ দিয়ে না বেরুল কান্নার শব্দ, না জিজ্ঞাসা করতে পারল কার্যকারণের কথা। শুধু বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সোনার মাথাটা কোলের উপর নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

সোনার জ্ঞান ফিরে এসেছিল, মনিকে দেখতে পেয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, তোর জবাকে ওরা কেড়ে নিয়ে গেছে রে।

ভাইয়ের গায়ে হাত রেখে মনি হঠাৎ কাঁদতে সুরু করল। এমন সময় রাহেলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে পাশ ফিরে শুল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। ও-দিকে মকসুদও এসে দাঁড়াল আবেগে উত্তেজনায়। এক ঝগড়ার মধ্যে আর এক ঝগড়া যেন কখন তলিয়ে গেছে।

বাপকে মকসুদ বলল, বাইরের ঘরে যাও, গ্রামশুদ্ধ লোক আসছে দেখ! তোমায় খুঁজছে সবাই।

সত্যি তাই! খবর ছড়ায় বাতাসের আগে আগে। ছুটে এল সাধু শেখ, ছুটে এল ইসরাইল, ছুটে এল হাসমৎ, ছুটে এল আনসার বাহিনীর ক্যাপ্টেন হবিবুর, ছুটে এল হাজারখানেকের বেশী মানুষ! যোগেন গাঙ্গুলিও আছে তার মধ্যে। দাঙ্গার খবর শুনে প্রথমে ঘাবড়ে গিয়ে-

ছিল সে, তারপর অন্য ধরণের দাঙ্গার কথা শুনে সেও এসেছে ছুটে। বাকী হিন্দুরা কেউ আসে নি, কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে বিপদের আশঙ্কা কেটে যাওয়ায়।

হঠাৎ কী এক যাদুমন্ত্রের গুণে গ্রামের বিভেদাচ্ছন্ন মানুষগুলো এক হয়ে গেছে যেন! তমিজ বিশ্বাসের বৈঠকখানার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হবিবুর হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠল, চলো সব! যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে চলো! বাংলা দেশে বাস ক'রে বাঙালীর গায়ে হাত! চলো সব! শালাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে আনব! তোমরা সব এগোও! আমরা আশেপাশের গ্রামের লোক নিয়ে যাচ্ছি।

উত্তেজনাবশে ইসরাইল বলল, যদি প্রয়োজন হয় আমার বন্দুক দু'টো নিয়ে যাও!

হাসমৎ বাপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেও চিৎকার করতে লাগল, হ্যাঁ চলো সব, আমরা প্রতিশোধ নেব! শালারা আমাদের ভাষা বলতে দেবে না, আমাদের চাকরী দেবে না, হাঁস মুরগী কেড়ে খাবে—'

মরিয়ম এসে দাঁড়িয়েছিল বেড়ার পাশে। চোখের সামনে এই দৃশ্য বিশ্বাস হচ্ছে না তার। বোধশক্তিও যেন অসাড় হয়ে এসেছে। প্রতি-শোধ নিতে চায় ওরা কার বিরুদ্ধে? অবাঙালীদের বিরুদ্ধে? তারা কারা? তারা যে অনেকরকম মানুষ। তাদের মধ্যে যে মিশে আছে খলিল, ইব্রাহিম, ফরিদ। আনিসের সঙ্গে তারা আজো জেলখানায়। আর বসির! সোনাকে যারা মেরেছে তারা যে খুন করেছে বসিরকে।

মরিয়ম হাতের ইশারায় ডাকল হাসমৎকে।

হাসমৎ এসে দাঁড়াতেই বলল, ওদের শহরে যেতে বারণ কর!

হাসমৎ বলল, সে আমি পারব না! আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই!

মরিয়ম এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বলতে পারিস, মায়ের চেয়েও কি ওদের ব্যথা বেশী!

কী জবাব দেবে সহসা ভেবে না পেয়ে হাসমৎ অনুযোগের সুরে বলল, কিন্তু ওরা কি আমার কথা শুনবে! আচ্ছা, দেখি!

প্রায় ছুটে চলে গেল হাসমৎ। কিন্তু কে শোনে কার কথা। দারুণ উত্তেজনায় বিকট উল্লাসের সঙ্গে চলেছে মানুষগুলো।

মরিয়ম নিস্তেজ হয়ে আবার এসে বসে পড়ল সোনার মাথার কাছে। একদিন ঐ রেলকলোনীর লোক আর গ্রামের মানুষ মিলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মেতে উঠেছিল দাঙগায়, আর আজ গ্রামের সেই লোকেরাই চলেছে শহরে হাঙগামা করতে! একদিন এই গ্রামের চাষাভুষোই রেলের লোকদের ঘর তৈরীর জন্য ঝাড়ের বাঁশ আর দেহের শক্তি খরচ করতে এগিয়ে এসেছিল সানন্দে, আর আজ তারাই চলেছে খুনের নেশায় পাগল হয়ে! চোখের সামনে কী যেন একটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে দেশের!

ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ইসরাইল। লোককে বন্দুকের উৎসাহ দেখিয়ে সে বন্দুকও দেয়নি তাদের সঙ্গেও যায়নি।

সোনার গায়ে হাত দিয়ে ইসরাইল বলল, না, গায়ে বেশী জ্বর নেই।

চমকে উঠল মরিয়ম—ও আপনি!

হ্যাঁ আমি! কষ্ট কী কেবল তোমার একলার! ও-তো আমারও ছেলের মত!

গলার স্বরে বিস্মিত হয়ে ইসরাইলের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই শিউরে উঠল মরিয়ম।

হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে এসে ঢুকল হাসমৎ। সে দম নিয়ে বলল, ওদের অতি কষ্টে ঠেকান গেছে!

ছেলের কথায় মুখ ব্যাজার করে ইসরাইল জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে ঠেকাতে বল্লটা কে? এই কাঁচ বাচ্চাটার জন্য দুঃখ হ'ল না তোমার?

হাসমৎ নিরুত্তর রইল।

ইসরাইল ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে তামাক সেবনরত তমিজ বিশ্বাসকে দেখে ডাকল, শুনুন!

তমিজ বিশ্বাস সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী?

দেখুন, কিছুই তো শেষ পর্যন্ত হ'ল না! ঐ লোকটার বিরুদ্ধে একটা মামলা ঠুকে দিলে কেমন হয়?

কোন লোকটা? পাথওয়ে ইন্সপেক্টার?

হ্যাঁ, যে লোকটা মেরেছে! আপনি তো স্বচক্ষে দেখেছেন!

তমিজ বিশ্বাস মাথা চুলকে জবাব দিল, হ্যাঁ, দেখেছি বই কি। কিন্তু আবার হাঙগামা হুজ্জতে যাওয়া, বড় ঝামেলা!

তা হোক, অপরাধীর শাস্তি হওয়া দরকার!

ইসরাইলের এত আগ্রহ দেখে অথচ আগ্রহের কারণই বুঝতে না পেরে তমিজ বিশ্বাস বিস্মিত হল।

সে মাথা চুলকে বলল, অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার। ও সব কি আমাদের সাজে? হাতে একটা পয়সা নেই বললেই হয়!

সব আমি দেব! আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না! আপনি কালকেই গিয়ে মামলা রুজু ক'রে দিন!

তমিজ বিশ্বাস কী ক'রে বুঝবে যে ইসরাইল এই সুযোগে এ বাড়ীতে ঘনঘন যাতায়াতের পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত ক'রে নিতে চায়। ছেলের জন্য এতটা করলে কি মায়ের মন গলবে না? টাকা খরচা করলে মানুষের মন নরম হ'তে কতক্ষণ।

তমিজ বিশ্বাস বলল, কিন্তু মরিয়মকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়!

কী দরকার! সে মেয়েমানুষ, তার আবার মতামত কী?

তা'হলেও তার মত নেওয়া দরকার! সে যা মেয়ে!

বেশ, করুন জিজ্ঞাসা ওকে।

বারান্দা থেকে সব কথাই মরিয়মের কানে এসেছিল, তবু আর একবার শুনে শুধু ঘাড় নেড়ে জানাল, না!

মরিয়া হয়ে ইসরাইল জিজ্ঞাসা করল, কেন না? একজন দোষী লোক ছাড়া পেয়ে যাবে এমনি এমনি?

মরিয়ম কোন উত্তর না দিয়ে শুধু ঘাড় নেড়ে স্তব্ধ হয়ে রইল।

যে বুঝবে না তাকে বোঝাবে কে, যে শুনবে না তাকে শোনাবে কে। তমিজ বিশ্বাস ইসরাইলকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। খানিকটা অপরাধীর মত বলল, মরিয়ম আমার এ-রকম ছিল না, ঐ আনিসের জন্যই এমনটা হয়েছে। যতসব বদশিক্ষা দিয়েছে ওকে।

তবুও ইসরাইলকে নীরব দেখে তমিজ বিশ্বাস আক্ষেপের সুরে বলল, ওদের মায়া-দয়াটাই কম, বুঝেছ! নইলে এ-ভাবে কেউ ছেলে-মেয়ে বৌকে ফেলে যায়? আমি একা মানুষ এতগুলো প্রাণীকে টানি কি ক'রে বলো তো?

ইসরাইল এবার যেন স্বগতোক্তি করে উঠল, কবে জেল থেকে বেরুবে

তারও তো ঠিকঠিকানা নেই! এতদিন কি এইভাবেই থাকবে!

কিন্তু আমি যে ভেবে কুল পাই নে, কী করব!

কী আর করবেন, স্বামী তার দায়িত্ব পালন না করলে যা আর দশজন করে তাই করবেন!

এই কথার পর ইসরাইল পকেট থেকে দু'খানা দশটাকার নোট বের করে শ্বশুরের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, আপনি না করবেন না!

ইসরাইল অদৃশ্য হয়ে গেল পথের মোড়ে। কিন্তু টাকা ক'টি হাতে নিয়ে একই ভাবে পথের উপর দাঁড়িয়ে রইল তমিজ বিশ্বাস। এতগুলো টাকা হাতে আসেনি অনেক কাল। অশ্রুসজল হয়ে এল তার চোখ। সংসারের ঝামেলায় তমিজ বিশ্বাস বুড়োবয়সে অস্থির হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু অতি টনটনে তার মর্যাদাবোধ, তাই বড় জামাইয়ের কাছে হাত পাততে পারেনি কোনদিন। আজ যখন ইসরাইল নিজের থেকে এগিয়ে এসেছে তখন বহুকাল পরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল! পুরনো জামাই যেন ফিরে এল নতুন ক'রে। হঠাৎ তমিজ বিশ্বাসের মনে হল, বড় জামাইয়ের প্রতি চিরকালই তার টান ছিল বেশী। নসিবের দোষে জাহানারা মারা গেল, জামাইও হয়ে গেল পর। তার আগে যদি মরিয়মের বিয়ে না হয়ে যেত, তা'হলে কখনো দূরে যেতে পারত না জামাই।

তমিজ বিশ্বাস বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করল। দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। ইসরাইলের শেষ কথাগুলোর মানে কী? না, না, তা হতেই পারে না! আর দশজন কী করে! ছিঃ! ছিঃ! ভাবলেও গুণাহ হয়।

সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর তমিজ বিশ্বাস নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল মরিয়মকে, জামাইয়ের কোনো চিঠিপত্র এসেছে?

কই না!

কিন্তু তুমি চিঠি লিখতে পার না! ভালোমন্দ খবরটবর তো দিতে হবে তাকে, না কি? কালকেই আমি খাম এনে দেব। সোনার খবর জানিয়ো তাকে।

বাপের এই আচমকা আদর দেখে মরিয়ম কী করবে ভেবে পেল না। ঘরে গিয়ে বসতেই হাসমৎ এসে হাজির! মরিয়ম একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী রে, এত রাত্রে!

আর বল কেন, খালা। বাপজানের ধারণা ডাক্তারী পড়তে সুরু করতে না করতেই আমি ডাক্তার হয়ে গেছি!

তোর প্যাঁচালো কথা আমি বুঝিনে।

বাপজান পাঠিয়ে দিলেন, বললেন একবার সোনার খবর নিয়ে আয়।

আর তুইও এত রাত্রে চলে এলি!

হাসমৎ চুপিচুপি বলল, জানো খালা, বাপজানকে যত খারাপ ভাবতাম, তা নয়, এখন দেখছি অনেকটা ভালো!

মরিয়মের গলা দিয়েও প্রায় একই কথা বেরুল, হ্যাঁ ভালো!

১৩

শীত গিয়ে গ্রীষ্ম এলো। ধান যা হয়েছিল তা ফাল্গুনের মধ্যেই শেষ। পাট যা পেয়েছিল, তা এমন দরে বিক্রী করতে হল যে, পরণের কাপড়ও জুটল না, মেয়ে বৌয়ের মাথার চুলের জন্য সাতটাকা সেরের নারিকেল তেলও কেনা গেল না। তমিজ বিশ্বাস ভেবেছিল মাথা ঠাণ্ডা হ'লে একদিন তাকে ডেকে নিজেই বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে মকসুদ। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই মানুষের মন যেন নরম না হয়ে গরম হয়ে উঠছে আরো। ইসরাইল মাঝে মাঝে একটু সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু সে একেবারে টিপেটিপে। যখন সে টের পেল এ-পাথর সহজে গলবে না, তখন সে একদিন যোগেন গাঙ্গুলিকে বলল, সবুরেই মেওয়া ফলে যোগেনবাবু!

যোগেনবাবু উত্তর দিল, আপনি ও আশা ছাড়ুন ইসরাইল সাহেব! ওদের আপনি চেনেন নি! ওরা ভাঙ্গে তবু মচকায় না!

সেই জন্যই তো আমার এত লোভ! নইলে মেয়েমানুষের কী অভাব? আমার কথা হচ্ছে, পয়সা দিয়ে এবং পয়সা না দিয়ে জব্দ করো!

সে কী রকম ব্যাপার?

একটু দাও, তারপর একেবারে বন্ধ করে দাও, আবার একটু দাও, আবার বন্ধ করে দাও! এমনি ক'রে টানো! ব্যবসাবুদ্ধি থাকা চাই, বুঝলেন যোগেনবাবু! এই বাজারে যাবে কোথায়!

যাওয়ার জায়গা সত্যি ছিল না। শীতের মরসুমে তরীতরকারী

ছিল, এখন তাও নেই। আধপেটা খেয়ে চলছিল কয়েকদিন। তবু তমিজ বিশ্বাস ছেলের দোকানে বাকীতে চাল আনতে যেতে রাজী হ'ল না।

সোনাকে ধামা হাতে দেখে মকসুদ জিজ্ঞাসা করল, পয়সা এনেছিস?

সোনার মুখ শুকিয়ে গেল, সে উত্তর দিল, পয়সা পরে দেবে বলেছে।

চালও তা'হলে পরেই নিয়ে যাস! বলগে যা!

মকসুদ বাড়ী এলে মরিয়মের মা মরিয়া হয়ে বহুদিন পর ছেলের বাড়ী গিয়ে বলল, তুই কি একেবারে চামার হয়ে গেলি! তোর পয়সা কি আমরা ফাঁকি দিতাম রে! বাপ-মা-বোন উপোস করে আছে, আর তোর গলা দিয়ে ভাত নামছে!

মকসুদ ক্ষেপে উঠল, তখন যে বড় জোর ক'রে আলাদা হয়ে গেলে! তোমার আদরের মেয়ে খেতে দিচ্ছে না এখন! আর আমি তো পাটের ব্যবসায় ফতুর মেরে গেলাম, আমি দেব কোত্থেকে?

রাহেলা একটা বেতের কাঠায় সেরখানেক চাল এনে শ্বাশুড়ীর হাতে দিতে গেল।

মরিয়মের মা হাত গুটিয়ে বলল, এই একবেলার খোরাকী দিয়ে আমি কী করব?

নিতে হয় নাও, নইলে বিদেয় হও!

কী মনে ক'রে মরিয়মের মা চালের কাঠা হাতে তুলে নিয়ে এলো বাড়ী। জ্বরে বেঘোর হয়ে পড়ে আছে মনি আর কলি। না ওষুধ না পথ্য। মরিয়ম রাত্রি জাগরণের পর ছেলেমেয়ের পাশে বসেই ঝিমোচ্ছিল পাখা হাতে, মায়ের ডাকে উঠে এসে ভাত চাপিয়ে দিল।

মনি এসে খবর দিল, মা, দাদা এসেছে!

এতদিন পরে শ্বশুরের আগমনের সংবাদে মরিয়ম উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বলল, যাও দাদুর সঙ্গে গল্প করগে, আমি আসছি।

দানেশ খাঁর পরণে ছেঁড়া কাপড়, হাতে ছেঁড়া ছাতা; পায়ে জুতো নেই, চোখ প্রায় ঢুকে গেছে গর্তে। দানেশ খাঁ বারান্দায় এসে বসতেই অর্দ্ধশায়িত তমিজ বিশ্বাস উঠে অভ্যর্থনা জানাল, আসুন বেয়াই আপনার কথা আমরা ভাবছিলাম। আপনার ব্যাটার বৌ আর নাতি-

নাতনিকে আপনি নিয়ে যান, আমি আর পারছি নে!

এই রকম অভ্যর্থনায় ভড়কে গিয়ে দানেশ খাঁ কিছুক্ষণ না পারল কোনো কথা বলতে, না পারল মুখ তুলে তাকাতে। দলা করা ময়লা গামছা খুলে বার বার মুছতে লাগল কপালের ঘাম। শেষে দম নিয়ে বলল, বেয়াই আমি যে আপনার কাছে এসেছিলাম সাহায্যের প্রত্যাশী হয়ে! আপনার বেয়াইনের যায় যায় অবস্থা, ঘরে একটা দানা নেই! আমার নিজের শরীরও অচল। আনিসের চিঠি পত্র পান?

বিরস মুখে তমিজ বিশ্বাস উত্তর দিল, না!

এর পরে আর গল্প করার মনোভাব ছিল না কারো। অবস্থা বুঝে খানিক পরে দানেশ খাঁ উঠে পড়ল, আচ্ছা বেয়াই, তা'হলে যাই!

তমিজ বিশ্বাস চটে গেল, বলল, দু'টো নাতি নাতনি যে জ্বরে পড়ে আছে তা একবার চোখেও দেখার দরকার মনে করলে না, বেয়াই! যত ভুতের বোঝা বওয়ার ভার কি আমার উপর?

কাঁচুমাচু হয়ে দানেশ খাঁ উত্তর দিল, কী করব বেয়াই, সামর্থ না থাকলে দেখে কী করব! পকেটে মাত্র দু'গণ্ডা পয়সা আছে! নে সোনা, দু'আনিটা রাখ!

মরিয়ম এসে বলল, ভাত হয়ে গেছে, খেয়ে যান!

বারান্দায় খেতে বসিয়ে ক্ষুধার্ত বাপ-শ্বশুর-ছেলের পাতে মরিয়ম হাঁড়ির ভাত প্রায় উজাড় করে ঢেলে দিল।

দানেশ খাঁ চলে গেলে মরিয়মের মা এসে স্বামীকে বলল, নিজে তো দিব্যি গিললে, মেয়েটা যে উপোস করে আছে, সে খেয়াল আছে?

চোপরাও হারামজাদী! বলে তমিজ বিশ্বাস মরিয়মের মার গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিল! তারপর বেরিয়ে গেল হন হন করে।

ইসরাইলের বাড়ীতে অনেককাল ঢোকেনি তমিজ বিশ্বাস। বাড়ীর সামনে ইসরাইল নতুন পুকুর কেটেছে, চতুর্দিক কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, পুকুর পাড়ের কলাগাছ নারিকেল গাছের সারির দুধারে নানা রকম ফুলের গাছ। ঠিক শানবাঁধান ঘাটের পাশে সাদা ধপধপ করছে নুতুন চুনকাম করা মসজিদ। বিকালের আজান শুনে তমিজ বিশ্বাস একবার থমকে দাঁড়াল, কিন্তু নামাজের কোনো প্রবৃত্তিই তখন ছিল না

তার। সোজা বৈঠকখানায় ঢুকে যোগেন গাঙ্গুলিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, ইসরাইল কোথায় ?

সে তো আড়তে গেছে! কী দরকার, আমাকে বললেই হবে!

কিছু টাকা চাই!

কিছু কেন! অনেকই তো পেতে পারো মেয়েকে রাজী করালে।

তার মানে!

আমার উপর চ'টো না খামোখা! আমি বুড়ো মানুষ—আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই! কিন্তু ইসরাইলের মনোভাব তো জানো!

না জানতাম না, আঁচ করেছিলাম। কিন্তু শ্বশুরকে সে সাহায্য করবে না ?

যোগেন গাঙ্গুলি হাসল, সাহায্য সে তো করেই, কিন্তু তারও তো একটা বাসনা আছে!

অর্থাৎ সেটা না মিটলে টাকা দেবে না! হারামজাদা কোথাকার! আস্ত চামার ঐ ইসরাইল, বুঝেছ যোগেনবাবু!

কী বলছ তমিজ বিশ্বাস!

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, মেয়ে যদি আবার আমি বিয়ে দিইও, তা'হলে ঐ চামারের হাতে দেব না।

যোগেন গাঙ্গুলি শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে কে ওকে বিয়ে করতে রাজী হবে এই বাজারে ?

তার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না! তোমার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তুমি বরং তাকে জামাই করো যোগেন বাবু! পাকিস্তান হওয়ার পর সেই তো তোমার সব চেয়ে বড় কুটুম হয়েছে!

কথাবার্তার সীমা আরো কতদূর নামত বলা মুষ্কিল, কিন্তু ইসরাইলকে আসতে দেখে ঝড়ের বেগে তমিজ বিশ্বাস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাড়ী এসে দাওয়ায় বসে হাঁপাতে লাগল সে! এমন সময় সোনা বার্লি আর একখানা চিঠি নিয়ে ঢুকল বাড়ীতে। চুপি চুপি মরিয়মের হাতে দিয়ে বলল, বাপজানের চিঠি বোধ হয়!

তমিজ বিশ্বাসকে আড়াল করে চিঠিখানা আঁচলের তলায় লুকিয়ে

মরিয়ম ঘরে গেল। আনিসের চিঠিঃ

তোমাদের কতদিন কোনো খবর পাই নাই! আমাদের প্রায় দেড় মাসের উপর অনশন ধর্মঘট চলিতেছে। তোমাদের কথা চব্বিশ ঘণ্টা মনে হয়। তুমি কি আমার আগের চিঠি পাও নাই? তোমাদের কথা ভাবিয়া আমার দিন কাটে। আমাদের অবস্থা এক রকম ভালো। মোটেই চিন্তা করিও না। আমার প্রাণের সকল ভালোবাসা লইও! সোনা মনি কলি কেমন আছে। বাপজান আর মাকে আমার সালাম দিয়ো। মকসুদ ভাই আর ভাবীকেও আমার সালাম জানাইও। এযাবৎ তোমার দুইটা চিঠি পাইয়াছি। ইতি, তোমার আনিস।

সোনা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, বাপজান কবে আসবে মা?

শিগগীরই আসবে! যা খেলা করগে যা!

ক্ষিদে পেয়েছে যে!

ক্ষিদে পেয়েছে তো আমাকে খা!

বার্লি জ্বাল দিতে বসে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিল মরিয়ম। আমার আনিস! আমার আনিস আজ দেড় মাস ধরে না খেয়ে আছে! কোন দিন কি আর দেখা হবে! কেমন যেন মাথা ঘুরতে লাগল মরিয়মের। মনে হচ্ছে এখনই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। হঠাৎ গরম বার্লির মধ্যে মরিয়ম ডুবিয়ে দিল একটা আঙ্গুল! হাতের প্রচণ্ড জ্বলুনীর ফলে একটু শান্তি বোধ করতে লাগল মনে মনে।

কাঁসার বাটিটা আঁচল দিয়ে চেপে উঠোনে আসতেই পড়ে গেল ফোস্কাপড়া হাত থেকে। শ্বশুরের সেই দু'আনা পয়সায় বার্লি আনিয়ে ছিল। চোখের সামনে গড়িয়ে পড়া তরল পদার্থটার দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল অসহায়ের মত। তারপর সেখানেই বসে পড়ল। কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সমস্ত শরীর।

তমিজ বিশ্বাস দাওয়া থেকে উঠে এসে বাটিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। হাটখোলায় মকসুদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, দে একসের চাল আর দু'আনার বার্লি দে!

কতবার বলেছি না, নগদ ছাড়া আর দেব না! শোধ দেবে তুমি কী দিয়ে?

তোর মাথা দিয়ে! বলে তমিজ বিশ্বাস কাঁসার বাটিটা ঠকাস ক'রে নামিয়ে রাখল দোকানের চৌকির উপর।

মকসুদ সাফ জবাব দিল, আমি জিনিষ বাঁধা রাখতে পারব না!

তবে রে হারামজাদা! বলে তমিজ বিশ্বাস ছেলের গায়ে মাথায় হাত চালিয়ে দিল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

মকসুদ বাপকে ঠেলা মারতেই তমিজ বিশ্বাস পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। হাটুরে লোকেরা জমা হল অনেকে। পড়ে গিয়ে তমিজ বিশ্বাসের পায়ের হাড় গেছে মচকে। কয়েকজন লোক তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়ীতে।

মরিয়মের মা স্বামীকে দাওয়ায় বসিয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, কী ক'রে হল ?

কী করে আবার হবে! তোমার ঐ মেয়ের জন্য আমার এই হাল! ওর জন্যই তো ছেলের সঙ্গে ভাগাভাগি! ওর জন্যই তো বাপব্যাটায় মারামারি। ঐ মেয়ের হাতেই আমার মরণ হবে!

কী বলছ তুমি! একটু চুপ ক'রে শোও!

না, আমি চুপ করব না! আমি জেলে চিঠি লিখব, হয় তোমার ছেলে-বৌকে খেতে পরতে দাও, নইলে আমার মেয়েকে আবার আমি বিয়ে দেব!

আহাঃ, তোমার জ্বালায় আমি গেলাম! বলে, মরিয়মের মা হাত চাপা দিল স্বামীর মুখে।

ততক্ষণে দাওয়ায় উপবিষ্ট ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন মরিয়ম অজ্ঞান হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে উঠোনে।

সোনা ছুটে এসে মরিয়মের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকতে লাগল, মা, মা গো!

১৪

কথাটা তমিজ বিশ্বাস রাগের মাথায় বললেও রাগ করে বলে নি। কয়েকদিন পর একখানা চিঠি লিখে এনে মরিয়মের মাকে ডাকল, শোন এই চিঠি পাঠাচ্ছি তোমার জামাইকে।

মরিয়ম খই ভাজতে বসেছিল সের খানেক ধান জোগাড় করে, আর তার মা খইয়ের ধান বাছছিল পাশে বসে, সে না উঠেই স্বামীকে বলল, তুমি কেন লিখবে, লেখার থাকলে মেয়েই লিখবে।

তমিজ বিশ্বাস পাশে এসে দাঁড়াল, দেখো, মেয়ে লিখলে কি আমার দুঃখ ছিল! শোনো চিঠিটাঃ বাবা আনিস, তোমাকে এক বিশেষ কারণ বশতঃ এই চিঠি লিখিতেছি। তুমি তো আমার অবস্থা জানো! প্রায় ভাত বিনা আমাদের দিন কাটিতেছে। তোমার মেয়ে মনি এবং ছেলে কালি অসুখে পড়িয়াছে। এমতাবস্থা চলিতে থাকিলে সকলে প্রাণে মারা পড়িবে। হয় তুমি আসিয়া ইহাদের ভার লহ, নতুবা অন্য কোনো ব্যবস্থা করো। আর তাহা না হইলে আমার মেয়েকে তুমি খালাস দাও! আল্লা তোমার ভালো করিবে। পত্রপাঠ উত্তর দিবা। আমার দোওয়া লইবা। ইতি, তোমার শ্বশুর তমিজ বিশ্বাস।

মরিয়ম ঘরে গিয়ে ঢুকল কোনো মতে। মরিয়মের মা স্বামীকে অনুরোধ করল, এ চিঠি তুমি পাঠিয়ো না!

আমি বাপ, আমার কর্তব্য আমি করব।

কিন্তু মেয়ে কি বলে শুনতে হবে না?

তমিজ বিশ্বাস উত্তর দিল, এখন ওর হিতাহিত চিন্তার ক্ষমতা নেই!

চিঠি পেয়ে বহুদূরে এক বন্ধ দেয়ালের মধ্যে আর এক জনের চিন্তার ক্ষমতা যে কী ভাবে খেই হারিয়ে ফেলল বাইরের লোকের হয়ত তা ধারণার বাইরে। পিছনে অনশনের ফেলে আসা সেই সব দিন, সামনে অনির্দিষ্টকালের জেল জীবন, আর চারপাশে শক্ত ইঁটের গাঁথুনি, তার মধ্যে এ রকম সংবাদ নিঃশব্দে এসে হয়ত পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে দেয়, তবু বাইরের জগতে তা সংবাদ হয় না! কিন্তু আনিসের চিঠি বন্দীদের উতলা করে তুলল গোপন আবেগের জগতে। আমার স্ত্রী পুত্রের তা'হলে কী হচ্ছে! নিজের স্ত্রী আর নিজের নেই! মানুষকে ভালোবেসে জেলে আসা আর সেখান থেকে শোনা তুমি যাকে সব চেয়ে ভালোবাস সে চলে গেছে তোমাকে ছেড়ে!

কিন্তু বন্দীরা কেউ আনিসকে কার্যকরী কোনো পরামর্শ দিতে

পারল না। বাইরে সংগঠন নেই, লোকজন ছত্রভঙ্গ, কার কাছে চিঠি লিখবে, কে গিয়ে ঐ দূরান্তরের একখানা নির্জন গ্রামের ততোধিক নির্জন এক বাড়ীতে অভাবগ্রস্ত একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আসবে, সাহায্য করতে সুরু করবে। বিরাট জগতের বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে যেখানে কত আসে কত যায়, কত জন্মে কত মরে, সেখানে এক তুচ্ছ মরিয়ম যদি ভেসে যায় আপাততঃ সেটা মেনে নিতে বলাই ভালো। কিন্তু সেটা না বোঝে বন্দীরা, না বোঝে আনিস। কেউ কেউ এ-দিক ও-দিক চিঠিও লেখে দুই একটা, কিছু হওয়ার আসা কম, তবু যদি হয়! সান্ত্বনাহীন দিন এবং রাত্রির মধ্যে আনিস অনেক চিঠির মুসাবিদাই ছিঁড়ে ফেলল মনে মনে। কি লিখবে সে? কি লেখার আছে? কি লেখা যায়?

একটি মেয়েলি গলার সুতীব্র চিৎকারে আনিস চমকে উঠল। ছুটে গেল ক্ষুদ্র জানালাটার কাছে। রাবেয়া নামে একজন ছাত্রী নেত্রীকে পুলিশ কয়েক দিন আগে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছিল, চিৎকারটা যে তারই সেটা প্রথমটা আনিস ঠাহর করে উঠতে পারে নি। শুধু তার চোখে পড়ল মান্নান জমাদার একটি মেয়েকে চুল ধরে একেবারে মাটি দিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে!

তখনো মেয়েটির গলা দিয়ে গালাগালি বেরুচ্ছে, হারামজাদা! শুয়োর কা বাচ্চা! স্কাউণ্ড্রেল!

কে একজন আনিসের মতই জানালার মধ্যে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল, তার বিস্ময় ভরা কণ্ঠস্বর আনিসের কানে এলো—রাবেয়া! এই সেই রাবেয়া! যে রাবেয়া পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য অসঙ্কোচে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ছাত্রদের হোস্টেলে, হোস্টেল ঘেরাও হওয়ার পর তেতলা থেকে পাইপ বেয়ে নেমেছিল নীচে, ছেলেদের মত রেনকোট আর টুপি পরে বৃষ্টির মধ্যে পালাতে গিয়ে তিনটে পুলিশের দ্বারা ঘেরাও হয়ে একটার নাক ভেঙ্গে দিয়েছিল ঘুঁসি মেরে, সেই রাবেয়া! কী করেছে রাবেয়া যে তার উপর এই অত্যাচার!

জেলের মধ্যে রাবেয়াকে বিচারের জন্য বসেছিল কোর্ট! তার ডান পাশে দাঁড়িয়েছিল হেড জমাদার কাশেম, আর বাঁ পাশে সেকেণ্ড জমাদার

মান্নান। রাবেয়া জেরার উত্তর দেয়নি আদালতে। হাকিম রায় দিলেন, আপনার ছ'মাসের রিগোরাস ইমপ্রিজনমেণ্ট! রাবেয়া চিৎকার করে উঠেছিল, আমি মানি না এই আদালত। ক্রুদ্ধ হাকিম প্রত্যুত্তর দিয়েছিল, আপনার শাস্তির মেয়াদ আরো বাড়ানো হল সিক্স মানথ্‌স্‌! তৎক্ষণাৎ রাবেয়া পায়ের জুতো খুলে ছুঁড়ে মেরেছিল হাকিমকে! হাকিম খাড়া হয়ে হুকুম দিয়েছিল ইসকো বাহার নিকালো।

ডান পাশের জমাদার ইতস্তত করছিল। বাঁ পাশের মান্নান রাবেয়াকে ধাক্কা মেরেছিল, চলো!

স্কাউণ্ড্রেল! যাবো না আমি এখান থেকে।

মান্নান ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল রাবেয়াকে এবং এখন চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে চলেছে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে। হায়রে পাকিস্তান! একদিকে আমার মরিয়ম, অন্যদিকে এই রাবেয়া! এদের চিৎকার শুনতে পাওনা পাকিস্তানের মানুষ? জানালার লোহার শিক দু'টো বোধহয় দুমড়ে গেল আনিসের হাতের চাপে।

কিছুক্ষণের মধ্যে খবর গেল সমস্ত বন্দী ওয়ার্ডে। খাওয়ার সময় ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। জেলের মধ্যে এ পশুর মত জীবন রেখে আর লাভ কি। ঐ মান্নান জমাদারকে খতম করতে হবে! তাতে গুলি চলে চলুক।

আনিসই উদ্যোগ দেখিয়েছিল জেলের মধ্যে সভা ডাকার। তার উপরই মান্নান জমাদারকে খতম করার ভার পড়ল।

জেলে অস্ত্র পাবে কি ক'রে। কোত্থেকে একটা ভাঙ্গা শিক জোগাড় হল। চেষ্টা হল তার মুখটা ঘসে ঘসে সরু করার। বিকালে ডিউটি চেঞ্জের সময় ভিতরে আসবে মান্নান, তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে ঐ শিকটা।

বন্দীরা সবাই রইল বিকালের প্রতীক্ষায়।

মান্নান সময় মতই এলো। আনিস এগিয়ে গেল তার দিকে, দাঁড়াল গিয়ে তার গা ঘেঁসে, আশেপাশে আরো কয়েকজন চেয়ে দেখছে উৎসুক দৃষ্টিতে। মান্নানের ভ্রূক্ষেপই নেই। সে গুণ গুণ করছে প্রতিদিনের মতই। কিন্তু কিছুতেই অগ্রসর হ'তে পারছে না আনিস। না, একটা

ঝগড়া না বাধলে কি করে আঘাত করা যায় লোকটাকে!

এই তুমি রাবেয়াকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলে কেন?

কে বল্লে আপনাকে?

আমি নিজে দেখেছি! তুমি মাপ চাইবে কিনা বল?

হেড জমাদার কাসেম অত্যন্ত চালাক। সে বন্দীদের আলোচনার আঁচ পেয়েছিল, কোত্থেকে এসে মান্নানকে ধাক্কা দিল, যাও, বাইরে যাও। এটা কথা বলার জায়গা নয়।

ঠেলতে ঠেলতে মান্নানকে বের ক'রে নিয়ে গেল কাশেম। আনিসের মুখে যেন একবিন্দু রক্ত নেই। এখন সে কী করবে? তাকে এখন থেকে সবাই করবে ঘৃণা। অবশ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে এও ছিল যে, মান্নানকে প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলতে হবে, তাতে রাজী না হলে দিতে হবে উচিত শাস্তি। কাজেই সে তো কিছু অন্যায় করেনি। মাঝখান থেকে কাসেম এসেই বাধিয়েছে যত গণ্ডগোল। কিন্তু আনিস নিজের কাছে কি জবাব দেবে। মাপ চাইতে অস্বীকার করলেই কি সে ওকে মোক্ষম আঘাত করতে পারত?

ভালো ক'রে তাকে কেউ জিজ্ঞাসাও করল না, সেও বেড়াতে লাগল দূরে দূরে। জীবনমরণের বন্ধুদের সঙ্গেই যখন এই রকম দূরত্বের সম্পর্ক রচিত হচ্ছে, তখন জেলে থাকার গৌরব আর নেই! এই ধরণের অবস্থাতেই কি লোক আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে? বেঁচে থাকার মত কিছুই যেন আর আঁকড়ে ধরার পাওয়া যাচ্ছে না। চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে এমন জোরে সে টান দিল যে, প্রায় এক মুঠো চুল ছিঁড়ে এলো! সমস্ত শরীর দিয়ে তার ঘাম ছুটছে।

আওলাদ এসে তার কাঁধে হাত রাখল। আনিস চমকে ফিরে তাকাতেই সে বলল, মানুষকে মানুষ অত সহজে মারতে পারে না। অন্তত পারা উচিত নয়! আপনি অত মনমরা হয়ে আছেন কেন?

কিন্তু আমার দুর্বলতা ঢাকব কি দিয়ে?

ঢাকবেন না! ঢাকার দরকার নেই! এই রকম দুর্বলতাই মানুষের গৌরব।

আওলাদ আনিসের দিকে তাকিয়ে রইল হাসিমুখে। অথচ এই

আওলাদই জেলে এসেছে সব চেয়ে বেশীদিন! আনিস উঠে পড়ল, ঘরে গিয়ে শ্বশুরের বদলে মরিয়মকে চিঠি লিখল।

প্রাণাধিক মরিয়ম, আমি বাপজানের চিঠি পাইয়াছি। মাথা ঠিক রাখিয়া আর লিখিতে পারিতেছি না, ভাবিতেও পারিতেছি না। মনের অবস্থা কী করিয়া বুঝাইব। কিন্তু আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, বণ্ড সই করিয়া আমি কিছুতেই মুক্তি লইতে পারিব না। যে সত্যের জন্য আমি লড়িতেছি তাহা আমার প্রাণের চেয়েও বড়। কোনো কিছুর বদলেই তাহা আমি ছাড়িতে পারিব না। একথা বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তবু আমাকে বলিতে হইতেছে। তোমাকে ছাড়া হয়ত আমি বাঁচিতে পারিব না, কিন্তু আমি অন্য কোনো পথও দেখিতেছি না। আমার জন্য তুমি ভাবিয়ো না, তোমার যাহাতে ভালো হয়, সেজন্য আমি সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারিব। নিজের এবং ছেলেমেয়ের প্রাণ বাঁচাই-বার জন্য যদি তুমি মনে করো তোমাকে আমার আইনত মুক্তি দেওয়া দরকার, তাহা হইলে আমি তাহাই দিব। আর আমি বেশী কিছু লিখিতে পারিতেছি না। তুমি আমার প্রাণের ভালবাসা লইয়ো। ইতি, তোমার আনিস।

চিঠি আসা মাত্র তমিজ বিশ্বাস ছিঁড়ে ফেলল খাম খানা। পড়ার পর মরিয়মের মার হাতে চিঠিটা দিয়ে বলল, মেয়ে যদি নিজে উত্তর দিতে না চায়, আমিই তাকে লিখে দেব যাতে সে তালাকনামা পাঠিয়ে দেয়।

কী উত্তর দেবে মরিয়ম, যতবার পড়ে চিঠিখানা, ততবার বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে দু'টি চোখ। অনেক কষ্ট ক'রে শেষে চিঠি লিখতে হল তাকে ঃ আদাব হাজার হাজার পর পাক জনাবে আরজ এই যে, তোমার পত্র পাইয়াছি। তাহার পর অনেক কাঁদিয়াছি। তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই। তুমি শক্ত থাকিয়ো। বাপজানের কথায় তুমি ভুলিয়ো না। তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না। আমার সালাম জানিয়ো। ইতি, তোমার মরিয়ম।

তমিজ বিশ্বাস মেয়ের চিঠির মর্ম জানতে পেরে ক্রোধে ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, তা'হলে গুষ্টিশুদ্ধ সবাই মরুক! আমি আর কিছু জানিনে!

হাসমৎ বাড়ী ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করল, কী হল নানা, চিৎকার

করছ কেন অমন ক'রে ?

হল আমার গুষ্ঠির মাথা! কিন্তু কতদিন জেদ বজায় থাকে দেখি!

হাসমতকে পীড়ি এগিয়ে দিয়ে মরিয়ম বলল, বস। কবে এলি ?

কাল রাত্রে। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটীর এতদিন আমি বাড়ীতে কাটাব কী ক'রে তাই ভাবছি।

কেন কী হল ? গ্রামে মন টিকছে না ?

হাসমৎ জবাব না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। সে নৈঃশব্দের যে অর্থ তাতে লাল হয়ে উঠল মরিয়মের মুখ। ঐ ছেলেটাও জেনে গেছে তাহলে।

চুপি চুপি হাসমৎ বলল, খালা কিছু টাকা এনেছি, তুমি নাও।

টাকা ? তুই ছোট ছেলে, তুই টাকা পাবি কোথায় ? আর তোর কাছে থেকে নেবই বা কেন ?

খালা, এ আমার নিজের স্কলারসীপের টাকা, আমি জমিয়েছি।

ভালই করেছ! কিন্তু তুমি বলেছ এতেই আমি খুশী হয়েছি।

কিন্তু আমি খুশী হব কি ক'রে তুমি না নিলে ? দেখো খালা, আমাদের গভর্ণমেণ্ট রাজবন্দীদের পরিবারকে ভাতা দেয় না বলেই তো তোমার এত কষ্ট! আমরা এবার আন্দোলন করব, যাতে ভাতা দেয়!

ভাতার প্রশ্নটা মরিয়ম আগে শোনেওনি, ভাবেওনি। এই সরকারের কাছ থেকে রাজবন্দী পরিবারের জন্য ভাতা আদায় করা যায়, এই হয়ত বর্তমানে অসম্ভব মনে করেই ওরা কেউ ও নিয়ে আলোচনাও করেনি, আন্দোলনও চালায়নি, কিম্বা চালালেও মরিয়ম তা জানেনা। অথচ সরকার ভাতা দিলে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক পারিবারগুলি এমন ভাবে ছারখার হয়ে যেত না, একজনকে গ্রেপ্তার করে দশজনকে মারার পথও পরিষ্কার হ'ত না। মরিয়ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, হয়ত আমার জীবনের ধারাও হত অন্যরকম! কিন্তু বেঁচে থাকতে তো এরা দেবে না।

মুখে হাসি ফুটিয়ে সে হাসমতকে বলল, বেশ আন্দোলন করে ভাতা আদায় করে দিয়ো, সেই টাকা নেব! সে তো আমাদের হক পাওনা!

হাসমৎ শেষ মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল, খালা আমার মা বেঁচে থাকলে তার কাছে তুমি না করতে পারতে না!

মরিয়ম হাত পেতে বলল, বেশ দাও, টাকার আমার খুব দরকার।

হাসমৎ চলে গেল হৃষ্ট চিত্তে। বহুক্ষণ ধরে বসে মরিয়ম ভাবল ঐ মাতৃস্নেহক্ষুধাতুর ছেলেটার কথাই। এ টাকায় ক'দিনই বা যাবে কিন্তু মরুভূমির মধ্যে এই অকৃত্রিম সহানুভূতির স্পর্শে মন হয়ে উঠেছে আর্দ্র। দুনিয়ায় তা'হলে সবকিছু শুকিয়ে যায়নি।

অনেক ভেবে চিন্তে বাড়ীর মধ্যেই একটা ছোট্ট দোকান খুলে বসল মরিয়ম। বাপ তাকে এড়িয়ে চলছে দেখে সোনাকেই রোজ পাঠাতে লাগল শহরে। দেশালাইয়ের বাণ্ডিল, তেজপাতা, জিরে, গোলমরিচ. শুকনো লঙ্কা, খয়ের. সুপারী. চিনি, মিছরী, তালমিছরী, সুঁই, সুতো থেকে সুরু করে চুলের ফিতে মাথার কাঁটা ছোটখাট কোনো জিনিসই বাদ গেল না।

তমিজ বিশ্বাস মুখে কিছুই বলল না মেয়ের কাণ্ড দেখে। কিন্তু মকসুদ বোনের মধ্যে নতুন প্রতিযোগীর আভাষ পেয়ে হাসল মনে মনে। চাষাভূষোর মেয়েরা ধারে নিতে এলেই পাঠিয়ে দিতে লাগল বোনের কাছে। অল্পদিনের মধ্যেই দেনার দায়ে ফুরিয়ে এলো সামান্য পুঁজি।

সন্ধ্যার পর কলিকে ভাত খাওয়াচ্ছিল মরিয়ম, এমন সময় বহুদিন পরে এল ইসরাইল। ডাক ছাড়ল, কই গো নতুন দোকানদার কোথায়!

ছেঁড়া সাড়ীখানা গায়ে জড়িয়ে মরিয়ম বসল ঠিকঠাক হয়ে।

ইসরাইল হেসে বলল, তোমার দোকানে জিনিস কিনতে এলাম। বাঃ, খদ্দের এল. বসতে দাও!

এমন বিশ্রী রসিকতার উত্তর দেওয়ার ভাষা জানা ছিল না মরিয়মের। রাগ চেপে নির্বাক হয়ে রইল সে।

নিজে থেকেই বসে পড়ে ইসরাইল হেসে উঠল, একটা কথা বলতেও দোষ নাকি? আমাদের কি রক্তমাংসের শরীর নয়।

মরিয়ম ক্ষীণ কণ্ঠে ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করল, আমাদের কি রক্তমাংসের শরীর নয়! আমরা তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি দুলাভাই? কিন্তু কেন আপনি এমন করে আসেন অপমান করতে?

আমি অপমান করতে আসি!

কোন জবাব দিল না মরিয়ম। ইসরাইল একটু চুপ করে থেকে বলল, অনেক ভেবেছি আমি। একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা

করব। তুমি তার উত্তর দাও। দেখো, আমি খারাপ লোক সে কথা আমিও জানি। তুমি আমাকে ঘৃণা করো সে কথাও আমার অজানা নেই। আরো জানি যে, তুমি সত্যি অত্যন্ত ভালো। অথচ সেই জন্য তোমার প্রতি আমার মত লোকের এত আকর্ষণ। অনেক চেষ্টা করেছি কাটাতে. কিন্তু পারিনি! তুমি খারাপ হলে তোমার প্রতি আমার কোনো আকর্ষণই থাকত না! আমি কি করব, তুমিই বলে দাও! তুমিই আমার কাছে এসে আমাকে ভালো করতে পারো মরিয়ম!

মরিয়ম নিরুত্তর।

ইসরাইল উত্তেজিত হয়ে বলল, চুপ করে থেকো না, উত্তর দাও!

নিজে খারাপ হয়ে কাউকে ভালো করা যায় না, দুলাভাই!

কিন্তু আমি ভালো হব কি ক'রে, তা বলতে পারো?

কথা বলার ইচ্ছা লোপ পেয়েছিল মরিয়মের। এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে সে? কী করে লোক ভালো হয়? আনিস থাকলে কি বলত? নারায়ন কি উত্তর দিত? প্রসন্নদা বেঁচে থাকলে কি বলতেন?

শেষে মরিয়ম বলল, মন্দের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে ভালো হওয়া যায় না, ভালো থাকাও যায় না।

দেখো মরিয়ম, ভালো মন্দের কথা আমার আসল কথা নয়, অন্য মেয়েদের দেখলে আমার ঠুনকো মনে হয়, তারা যেন আস্ত মানুষ না। তাই তোমাকে আমি চাই!

দুলাভাই!

মেয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কানে যেতে মরিয়মের মা এগিয়ে এল, হয়েছে কী। অত চিৎকার করছিস ক্যান?

ইসরাইল বগলের তলা থেকে একখানা শাড়ী বের করল, দেখুন ও ছেঁড়া কাপড় পরে আছে, তবু এটা নেবে না, এত রাগ।

মরিয়মের মা মেয়েকে তিরস্কার করল, আপন দুলাভাই দিচ্ছে, নিতে তোর এত আপত্তি কিসের।

মা, তুমি জানো না, বলে মরিয়ম গিয়ে ঘরে ঢুকল।

পরদিন ভয়ঙ্কর খবর এল, গুলি চলেছে জেলে। এ গ্রামে যোগেন গাঙগুলির বাড়ীতে আসে একখানা মাত্র সাপ্তাহিক কাগজ। সেখান

থেকেই শুনে এসেছিল তমিজ বিশ্বাস এবং বাড়ীতে বলব না বলব না করেও বলে ফেলল সে।

মরিয়মের ঘুচে গেল আহার নিদ্রা। মা যতই বলে, একবেলা বাদে একবেলা খাওয়া, তাও যদি উপোস থাকিস, শরীরটা থাকবে কি করে!

মরিয়ম শুধু বলে, মা আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

রাত্রিতে সোনা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে খবর দিল, জানো মা আজ নামাজের সময় নানি কেবল বলছিল, হে আল্লা আমার আনিসের যেন কিছু না হয়। আল্লা, বাপজানকে ভালো রাখবে, না মা?

মরিয়মের চোখের পাতা ভিজে এল! সে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, এবার ঘুমোও তো।

আচ্ছা মা ঘুমুলে নাকি মানুষ মরে যায়?

ছিঃ মরার কথা বলতে নেই।

আচ্ছা মা মরে গেলে মানুষ কোথায় যায়?

আর কথা না, তুমি ঘুমোও এবার।

মা, গফুর বলছিল কমিউনিসরা মরলে সব দোজখে যাবে। গফুরটা ভারী পাজি, না?

ছিঃ ভাইকে গালাগালি দিতে নেই, ঘুমোও।

পরদিন রেল কলোনীর বাজার থেকে সোনা ফিরল জ্বর গায়ে। আগেই ধার দেনায় যে দোকান ডুবতে বসেছিল, এখন গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের ভিজিট আর ওষুধের দাম দিতে গিয়ে তার ভরাডুবি হল।

মরিয়মের মা স্বামীকে বলল, তুমি একবার ইসরাইলের কাছে যাও না? ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো!

আচ্ছা, তাই যাব!

আর আনিসের একটা খবর টবর আনাও!

চিঠি তো লেখা হয়েছে, তাছাড়া খবর আমি পাব কোথায়!

মরিয়মের মা এতদিনে রাগটা প্রকাশ করে ফেলল, আনিস মরে গেলে তো তুমি খুশীই হও! তুমি তো তাই চাও!

তমিজ বিশ্বাস জিব কাটল, ছিঃ ছিঃ মরিয়মের মা! আমি কি মানুষ, না পশু! সেও তো আমার আপন ছেলের মত। দিনেরাতে

আমিও কি খোদার কাছে ডাকছি নে যাতে সে ভালো থাকে? কী করব সবই আমার নসীবের দোষ! অভাবে পড়ে স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে, মরিয়মের মা! আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব।

ইসরাইল কিন্তু তমিজ বিশ্বাসের আবেদনে ভুলল না। বলে বসল, মরিয়ম না ডাকলে আমি যাব না, সাহায্যও করতে পারব না। কেন মিছে-মিছি গালাগালি খাব!

টাইফয়েড রুগী বিনা ওষুধে বিনা পথ্যে এগিয়ে যেতে লাগল মৃত্যুর দিকে। মাঝে মাঝে বিকারের ঘোরে সোনা ভুল বকে, আমি বাপজানের কাছে যাব...স্কুল থেকে আমার নাম কেটে দিয়েছে...মা কবে মাইনে দেবে ...মোরগ নিয়ে আমি আর বাজারে যাব না...আমাকে মেরে ফেলল রে... বাপজান কেমন আছে মা...

বিকারের ভুলের সত্য শেলের মত বিঁধতে লাগল মরিয়মের বুকে। সে কি ইসরাইলের কাছে গিয়ে বলবে, আমার সব কিছু নাও, কিন্তু সোনাকে তোমরা বাঁচিয়ে তোল। এ সব কী ভাবছে সে! সেও কী ভুল বকছে! হঠাৎ তার মনে পড়ল সুলতানের কাছে শোনা সেই ব্রজ বর্মনের গল্প। কিন্তু বাপ হয়ে ব্রজ বর্মন পেরেছিল, মা হয়ে সে কি করে পারে? না পারলেও পারতে হবে যে! আচ্ছা, সে কেন গিয়ে ভাইয়ের পা ধরবে না?

ও-পাশের বাড়ীতে সে সময় মকসুদ বাক্স থেকে কিছু টাকা বের করছিল, রাহেলা তাকে শুধাল, কোথাও যাচ্ছ নাকি তুমি?

যাই কিছু টাকা দিয়ে আসি, ছেলেটা তো মরমর শুনছি।

রাহেলা বলল, যাও দিয়ে এস। আমিও কথাটা বলব বলব ভাবছিলাম! কিন্তু বলিনি, কারণ টাকা তো ওদের হাতের পাঁচ, বললেই তো পায় হাসমতের বাপের কাছে! নিজের থেকে দুঃখ করলে কে তা খণ্ডাতে পারে!

হঠাৎ মকসুদ ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আমি যদি তোমাদের খেতে দিতে না পারি, তা'হলে তুমিও আবার বিয়ে করবে?

রাহেলা থতমত খেয়ে উত্তর দিল, আমি কি তাই বলেছি নাকি।

তবে তুমি কী বলেছ?

রাহেলা টাকাটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দাও আমাকে দাও, আমিই ও বাড়ীতে যাব।

দুজনে মিলে গিয়ে দেখল ইসরাইল ফলমূল ডাক্তারসহ উপস্থিত!

কিন্তু সোনা শেষ মুহূর্তের আদর যত্ন উপেক্ষা করে চলে গেল।

ক'টা দিন শোকোচ্ছাসের মধ্যে কী ভাবে যে দিন কাটল, কেউ তা টের পেল না। হৃদয়াবেগের কারণ ছাড়া এর আর একটি কারণ ছিল। ইসরাইলের বাড়ীর চাল, পুকুরের মাছ, বাগানের তরকারী আসছিল নিয়মিত। শোকের মধ্যে ক্ষুধার ছায়া বিয়োগ ব্যাথাকে ম্লান করে নি। সন্ধ্যার পর এখন একবার এসে উপস্থিত হয় ইসরাইল।

সোনার মৃত্যুর পর মরিয়ম প্রায় ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকে। কখনো নীরবে কাঁদে। বেশীর ভাগ সময় শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শুধু। জোর করে মা তাকে ভাতের থালার কাছে টেনে আনে। একটু বসেই উঠে পড়ে মরিয়ম। এরই মধ্যে আনিসের চিঠি এল। তাতে মায়ের মনের ব্যথা হ্রাসের বদলে হল তীব্রতর। ওগো, তোমার ছেলেকে আমি বাঁচাতে পারলাম না।

তমিজ বিশ্বাস একদিন মুখ ফুটে বলে ফেলল, এখন আর কাঁদলে কি হবে, মেয়ের জেদের জন্যই তাজা ছেলেটা মারা গেল!

মরিয়মের মা তাড়া দিল, চুপ! মেয়ে শুনতে পাবে!

শুনুক না! আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি? জামাই যদি বলতে হয়, সে ঐ ইসরাইল। প্রত্যেক দিন এসে দেখে যাচ্ছে। মুখে একটা কথা নেই! মন্দের কথা যদি বলি, কোন মানুষটা একেবারে ভালো?

সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে ইসরাইল একদিন মরিয়মকে এসে বলল, কত-দিন এ-রকম করে কাঁদবে বলো তো? তোমার চোখের সামনে আর একটা লোক মরে যাচ্ছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না! তোমার মন কি কিছুতেই গলবে না!

উদভ্রান্তের মত মরিয়ম উত্তর দিল, হ্যাঁ সোনা আমার মনকে পাষাণ করে দিয়ে গেছে। নইলে আজো আমি বেঁচে আছি কেন?

ধৈর্যহীন হয়ে ইসরাইল তাকে সংশোধন করল, আমি সে কথা

বলি নি!

তবে তুমি কি কথা বলেছ দুলাভাই? তার পরেই মরিয়ম প্রায় চিৎকার করে উঠল, তোমরাই আমার সোনাকে মেরে ফেলেছ! তুমি চলে যাও তোমাকে আমার সহ্য হয় না!

ইসরাইল সেই যে চলে গেল, আর এদিকে পথ মাড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে আসা বন্ধ হল তার সাহায্য। টান পড়ল আবার ভাতের হাঁড়িতে। টান পড়ল তমিজ বিশ্বাসের মনে। একদিন সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল মরিয়মকে, ইসরাইল কেন আর আসে না?

বাপ যে তার এতটা নীচে নেমে যেতে পারে তা কল্পনাও করতে পারে নি মরিয়ম। প্রথমটা চুপ করে থেকে পরে পাল্টা প্রশ্ন করল, তা আমি জানব কি ক'রে?

তুমি জানবে না, তবে কে জানবে? তোমার জন্যই ছেলের সঙ্গে আমার গোলমাল, তোমার জন্যই বড় জামাই আমার বাড়ীতে আসে না।

তবে আমিই বাড়ী থেকে চলে যাই?

তাই যা!

এর পরদিন থেকে উঠতে বসতে তমিজ বিশ্বাস বলতে লাগল, হয় আমার কথা শোন, নইলে আমার চক্ষের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

একদিন সত্যসত্যই মরিয়ম একটা কাপড়ের বাণ্ডিল নিয়ে মনি আর কলির হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। মা এল বাধা দিতে। মরিয়ম বলল, আমাকে যেতে দাও মা, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব!

কোথায় যাবি?

আমার সেই রেল কলোনীতে।

কিন্তু খাবি কি?

মা, আমি বরং ঘুটে কুড়িয়ে খাব!

তাই বলে এই দিন-দুপুরে এতলোকের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবি?

আর লজ্জা কি মা! সোনা আমার সব লজ্জা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।

বেশ, তবে তাই যা!

মরিয়মের মা ক্ষুধার্ত দেহটা নিয়ে সেখানেই বসে পড়ল। তমিজ বিশ্বাসের অনাহারক্লিষ্ট চোখে মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

মনি আর কলির হাত ধরে মরিয়ম বেরিয়ে পড়ল পথে।

১৫

মনের অবস্থা যখন অশান্ত থাকে তখন পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি সহজে ধরা পড়ে না। তারপর এক সময় শ্রান্তির চরম অবস্থায় দেহমন অবসন্ন হয়ে পড়ে, মন হারিয়ে ফেলে চিন্তাভাবনার সমস্ত ক্ষমতা। তখন সর্বাঙ্গে নেমে আসে বিশ্রামের অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা, চোখে জড়িয়ে আসে প্রগাঢ় ঘুম। তীব্র শোকোচ্ছাসের পর তাই একটা মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে অকাতরে। প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে প্রাণকে রক্ষা ক'রে চলে। শ্রান্তি অপনোদনের পর মানুষ দুনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আবার লড়তে সুরু করে বেদনার সঙ্গে। কিন্তু মরিয়মের ভাগ্যে সেদিন এই সুযোগও জুটল না। বাড়ী থেকে রেল কলোনী পর্যন্ত অনেকখানি পথই যে সে কলিকে কোলে ক'রে হেঁটে এসেছিল, অসম্ভব মানসিক উত্তেজনায় তার ক্লান্তি সে অনুভব করে নি, দারুণ রোদের তাপও বুঝতে পারে নি, অনভ্যস্ত পায়ে ক্ষুধার্ত দুর্বল দেহ নিয়ে এতখানি হাঁটাও তার গায়ে লাগে নি। কিন্তু শহরের একেবারে উপকণ্ঠে এসে একটা টিউবওয়েলের পাশে থেমে ঢক ঢক ক'রে জল খেয়ে যখন সে রাস্তার পাশেই ঘাসের উপর বসে পড়ল তখন চারদিক থেকে যেন এক কঠিন নিষ্ক্রীয়তা এসে ঘিরে ফেলতে চাইল তাকে।

বিকাল হয়েছে, এখন আকাশে সূর্যাস্তের আভা। গ্রীষ্মের দিন-শেষে ঠান্ডা হাওয়া এবং ছায়ায় যেন পুরাতন এক সহানুভূতির আভাস। কিন্তু মরিয়মের যেটা সবচেয়ে ভালো লাগল সে ঐ সান্টিংয়ের শব্দ এবং ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া। কতকালের পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে যেন দেখা। ঝিমিয়ে আসা শরীরে মরিয়ম বুঝতে পারছে একটু বসলে সে আর উঠতে পারবে না। ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরের ইঁটের রাস্তায় পা দিল মরিয়ম।

অবশেষে যখন বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। এ কী কান্ড! বাড়ীর দরজা খোলা! ভিতরে আলো, কথা-বার্তার শব্দ আসছে! তবে কি আনিস মুক্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে!

মরিয়ম দুরুদুরু বুকে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

তাকে দেখে এক ফতুয়া-গায়ে সাদা-দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ এগিয়ে এসে শুধাল, কৌন? কিসকো মাঙতা?

মরিয়ম ঘাবড়ে গিয়ে বলল, এটা তো আমাদের বাসা!

তুমারা বাসা! ক্যা বলতা হ্যায়! বাহার নিকালো!

আকস্মিক এই রকম অভ্যর্থনার জন্য মরিয়ম মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ভ্রমেও তার মনে হয়নি এ বাড়ী রেলকর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিতে পারে। তাই মরিয়ম অত নিশ্চিন্ত মনে চাবি দিয়ে গিয়েছিল হালিমার হাতে। আনিসের চিরকালের মতই যখন চাকরী খোয়া গেছে, তখন কী করে যে চিরদিনের মত বাসাটা থাকবে, তা মরিয়ম ভেবে দেখেনি।

বুড়ো আস্তে নাস্তে সব শুনে ঠান্ডা হয়ে মাপ চাইল। কারণ সে আনিসকে ভালোভাবেই চিনত। তারপর বৃদ্ধ মরিয়মকে বুঝিয়ে বলল বাসা দখলের ইতিবৃত্ত। আজিজ উত্তর প্রদেশের লোক, সান্টারের পদে আছে এখন, একগাদা ছেলেপুলে নিয়ে এতদিন ছিল ওয়াগনে। বাসাটা খালি দেখে তালা ভেঙে ঢুকে পড়ে এবং আরো দুই একজন যখন একই সঙ্গে দখল করতে আসে, তখন তাদের সঙ্গে মারামারি না হলেও ধ্বস্তা ধ্বস্তি করে। বাসাহীন অবস্থায় এত দীর্ঘদিন বাস করে বাসা-হারানোর দুঃখ বুঝে আজিজ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আনিস ফিরে এসে চাকরী পেলে নিশ্চয়ই আর একটা বাসা পাবে।

দিশাহারা মরিয়মের মুখ দিয়ে বেরুল, এখন আমি কি করব।

তারপর সে মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, হালিমা আপাকে ডেকে আনো তো মা! আমি আর উঠতে পারছি না।

আজিজ খবর দিল, ভাইয়ের বিয়েতে ওরা দেশে গেছে, কাল ফিরবে। আজ রাতটা এখানে থাকো, কাল সকালে যা হয় ঠিক ক'রো।

মরিয়ম শুধু বলল, আমি একটু শুতে চাই।

আজিজ তাড়াতাড়ি একটা ঘর পরিষ্কার ক'রে চাটাই বিছিয়ে দিল। সেই ভরসন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে অথচ পরের বাড়ীতে শুতে না শুতেই মরিয়মের চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। ছেলেমেয়ের দিকেও তার খেয়াল

রইল না। যেন চিরকালের মত ভাবনাচিন্তার বাইরে চলে গেছে মরিয়মের শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ। আজিজের বৌ তাকে হাজার ডাকাডাকি করেও খাওয়াতে পারল না।

পরদিন সকালে মরিয়ম যখন ধড়মড় ক'রে উঠে বসল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে! হালিমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আপা কতক্ষণ এসেছ।

হালিমা উত্তর দিল, তোকে মড়ার মত ঘুমুতে দেখে আর ডাকিনি কাল রাতে। কিন্তু কী ব্যাপার, তুই বাড়ী থেকে চলে এলি কেন? আর সোনা কোথায়, তাকে দেখছিনে তো।

মরিয়ম ডুকরে কেঁদে উঠল। আজিজের বৌ একটা থালায় রাতের শুকনো রুটি এবং একটু গুড় নিয়ে এসেছিল। হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ক্যা হুয়া?

আজিজও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হালিমা নিজে যা বুঝেছিল তাই ফিসফিস করে বুঝিয়ে দিল আজিজকে। আজিজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। সে যেন বুঝতে পারছে, যে রমণীর স্বামী জেলে, পুত্রের হয়েছে অকালমৃত্যু এবং বাসা হয়েছে হাতছাড়া তার দুঃখের জন্য সেও খানিকটা দায়ী। কী করবে ভেবে না পেয়ে শুধু বললে, বেটী রোনা মৎ!

মরিয়ম কিন্তু এতেই সান্ত্বনা পেল। বাপ তাকে দিয়েছে তাড়িয়ে, আর এই অপরিচিত বৃদ্ধ তাকে সম্বোধন করছে মেয়ে বলে। চোখ মুছে একটু রুটি মুখে দিয়ে হালিমার সঙ্গে মরিয়ম গেল ইউনুসের বাড়ী।

ইউনুসের মাইনেটা ভালো, বাড়ীটাও ভালো, প্রশস্ত তিনখানা ঘর, সবগুলিই বেশ সাজানো গোছানো। সে একটু সৌখীন প্রকৃতির লোক। ঘর থেকে সুরু ক'রে গ্রামোফোন সিঙ্গার মেসিন সব কিছুই আদর করে সাজিয়ে রাখে, বৌয়ের পরণে নিমেষের জন্যও ময়লা কাপড় দেখতে পারে না।

বোনকে ডেকে ইউনুস বলল, দ্যাখো আপা, আনিস লোকটা ছিল ভালোই কিন্তু এসব ঝঞ্ঝাট বাড়ীতে ডেকে আনলে কেন? একবার বসতে পেলে আর উঠবে না। তুমি জান, ঝামেলা আমি পছন্দ করিনে। দু'চার দশ টাকা দরকার হয় একবারের মত দিতে পারি। তার বেশী

কিছু পারব না। আপা, তুমি সাবধান।

হালিমা ধমক দিল; তুই থাম! লোকটা আসতে না আসতেই এত কথা। সকলেতো আমার মত নয় যে চিরকাল তোর বাড়ীতে থাকবে।

মহাজবালা, আগের থেকে সাবধান হতে দোষ কি।

পাশাপাশি এত বছর বাস করছিস, আর মানুষ চিনলিনে!

আরে কখন কী হয় বলা যায়। আমার উপর নজর পড়তে কতক্ষণ?

থাম, পুলিশ তোর মত নয় যে একটা মেয়েমানুষের ভয়ে অস্থির হবে।

হার মেনে ইউনুস আপাতত চলে গেল। কিন্তু সব কথাই মরিয়মের কানে এসেছিল, হালিমা ঘরে ঢুকতেই সে ম্লান মুখে বলল, আমাকে নিয়ে এসে তোমার তো খুব মুস্কিল হল আপা।

মুষ্কিলের কথা পরে হবে, তুই তাড়াতাড়ি গোসল করে নে, আর ছেলেমেয়েকেও গোসল করিয়ে দে। নইলে আর পানি পাবি নে, গ্রামে গিয়ে সব ভুলে গেছিস।

মরিয়ম দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সব কিছু ভুলতে পারলেই তো বাঁচতাম আপা। একটু থেমে বলল, আমাকে একখানা খাম আনিয়ে দাও।

রাত্রে মরিয়ম চিঠি লিখল আনিসকেঃ আদাব হাজার হাজার পর পাক জনাবে আরজ এই যে, তোমাকে না জানাইয়া পারিতেছি না যে এক মাস হইল সোনা আমাদের চিরকালের মত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এতদিন তোমাকে জানাইতে সাহস হয় নাই, কারণ তুমি জেলের মধ্যে আছ এবং তোমার মনে কোনো গ্লানি আসিতে পারে। কিন্তু মা হইয়া আমি যাহা সহ্য করিতেছি, তোমাকে তাহা সহ্য করিতেই হইবে। কিছুতেই মন খারাপ করিয়ো না। আর এক কথা, আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছি। সেই ঠিকানাতেই পত্র দিয়ো। তুমি ভাবিয়ো না, আমাদের দিন একরকম কাটিয়া যাইতেছে ও যাইবে। আবার বলিতেছি তুমি মন খারাপ করিয়ো না। পত্রপাঠ উত্তর দিয়ো। মনি ও কলি ভালো আছে। অধিক আর কি লিখিব। ইতি—তোমার মরিয়ম।

চিঠি লেখা শেষ ক'রে কান্না কিছুতেই থামতে চায় না। আনিসকে মন খারাপ না করতে লেখার মূল্য দিতে হল তাকে—সারা রাত একটুও

চোখ বুজতে পারল না সে। আর কেনই বা সে মিছে কথা বলতে গেল, পুরনো বাসাতেই ফিরে এসেছি, ঐ ঠিকানাতেই পত্র দিয়ো! যাতে আনিস একটু নিশ্চিন্ত থাকে সেই জন্য। কিন্তু যাকে ছেলের মৃত্যুর কথা লিখতে হল, তার সঙ্গে আর এই লুকোচুরি কেন? বুকের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে মরিয়মের। সে সন্তর্পণে বিছানা থেকে উঠল। বাইরে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়াল। ঘরে এসে খানিকক্ষণ ঘুমন্ত হালিমার পাশে শায়িত মনি আর কলির মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। শেষে অসহ্য বোধ হওয়ায় হ্যারিকেনের সলতেটা উস্কে দিয়ে সেই পুরনো কাগজের বাণ্ডিলটার একটা কিছুর মধ্যে মনটা আকৃষ্ট করে বেদনা হ্রাসের চেষ্টা করল। কাগজগুলো মনে যেন কী রকম একটা সাহস এনে দেয়, সেই জন্যই ওগুলোকে কিছুতেই ফেলতে পারে না মরিয়ম। আজ কিন্তু কিছুতেই মন বসতে চাইছে না। হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল তার—ঝাড়মনি হাজং পনের মাসের শিশু কোলে ঘুমাইতেছিল, পুলিশ মায়ের বাহু হইতে শিশুটিকে ছিনাইয়া লয় এবং মায়ের চোখের সামনে বুটের তলায় চাপিয়া মারে! শেষে ঝাড়মনির পেটে বেয়নেট বসাইয়া দেয়। এইরকম অত্যাচার শুধু একটি গ্রাম নহে, সমগ্র হাজং এলাকায় প্রায় চারিশত গ্রামে চালানো হইতেছে। জাগিরপাড়া নামক গ্রামে ঢুকিয়াই পুলিশ গুলি চালাইয়া বারজনকে হত্যা করে। ছয় শত লোকের উপর বেয়নেট চালায়। সমস্ত গ্রামে আগুন লাগাইয়া দেয়। তাহারা সাতমাসের গর্ভবতী সাতাইমনিকে উলঙ্গ করিয়া প্রথমে বুলেট দিয়া স্তন উড়াইয়া দেয়। তারপর বেয়নেট চালাইয়া হত্যা করে। সশস্ত্র পুলিশের চার পাঁচজন গাঙিগলা গ্রামের মণ্ডলের পুত্রবধূর উপর একের পর এক পাশবিক অত্যাচার চালায়। অজ্ঞান হইয়া পড়িলে পশুরা তাহার স্তনের মাংস ছিঁড়িয়া লইয়া যায়। জামাল হাজংয়ের বৃদ্ধা মাকে গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া আগুন লাগাইয়া দেয় এবং...(ছাপার অক্ষরে তাহা লেখা চলে না) এই রকম হাজারের বেশী মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। ইহা ব্যতীত এই এলাকায় কুড়ি হাজারের বেশী লোকের উপর শারীরিক অত্যাচার চালানো হইয়াছে! পুলিশ মোট দুই কোটি টাকার ধান নষ্ট করিয়াছে, চার শত পঞ্চাশটি বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে, চল্লিশ

হাজারের বেশী ঘর তাহারা ভাঙিয়া দিয়াছে। পঁচাত্তর হাজার হাজং কৃষক আজ গৃহহারা! পনের হাজার মেয়েপুরুষ আজ উদ্বাস্তুর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ত্রিশ হাজার সীমান্তের পারে ভারতে গিয়াছে। পঁচিশজন হাজং নেতার জেলের মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে অথবা তাহাদের পিটাইয়া হত্যা করা হইয়াছে...

মরিয়ম চোখের পাতা বন্ধ করল। সে আর পড়তে পারছে না। মৃত্যু আর মৃত্যু! কোথায় ঐ হাজং এলাকা? ওরা কি শুধু মানুষকে মারতেই জানে, বাঁচাতে জানে না। কে নেবে এত মৃত্যুর প্রতিশোধ? কিন্তু প্রতিশোধ নিলেও কি বুকের জ্বালা জুড়াবে? যারা মরে তারা কি ফিরে আসে! সোনা কি আর ফিরে আসবে!

ফিকে হয়ে এল রাতের আকাশ। হাজারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল মরিয়ম, সোনা আমার ফিরে আয়, তোর মায়ের বুকে ফিরে আয় সোনা আমার!

অতি ভোরে আম চাই, আম চাই, শুনে পাশের ঘর থেকে ইউনুস ডাক দিল, এই আম! এদিকে এসো!

আমওয়ালা প্রবেশ করতেই ইউনুস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, জহুর! তুমি আম বিক্রি করছ!

সে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্য থেকে অতি সাদা দন্তপংক্তি বের করে জহুর উত্তর দিল, শুধু আম কেন, বিড়িও আছে! চাই দু'এক বাণ্ডিল?

সঙ্গে সঙ্গে জহুর পকেট থেকে বের করল কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি।

ইউনুস হেসে ফেলল, কিন্তু বিড়ির চেয়ে বাড়ী বেশী দরকার।

বাড়ী? তাও আছে!

তাও আছে! তুমি দেখছি ম্যাজিক জানো, ভাড়া দেবে?

তা একখানা ঘর ভাড়া দিলে বেঁচে যাই। এখন আর আমার দু'খানা ঘরে বাস করার অবস্থা নয়। দু'দিন পর হয়তো কোনো ঘরই থাকবে না! কিন্তু বাজে লোককে আমি দেব না।

সব কথাই মরিয়মের কানে আসছিল। সে জহুরের সামনে বেরিয়ে এসে অনুরোধ করল, আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই, আপনাকে দিতেই

হবে!

ইউনুস জহুরকে ফিসফিস করে বলল, আনিসের বৌ!

বিস্ফারিত চোখে জহুর তাকাল মরিয়মের দিকে, তার মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে বেরুল, ও!

সে ইউনুসের দিকে ফিরে বলল, তা একটা লোকের মত লোক ছিল বটে! এখন আর শালা দেশে একটা লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। সারা রেল কলোনীটা যেন নিঃঝুম মেরে গেছে! গলা কাটলেও কেউ একটা কথা বলে না। সব যেন ভেড়ির পাল! না, ভাড়া আমি নেব না! আমিই যখন ভাড়া দিচ্ছি না, তখন নেবই বা কেন?

ইউনুস আবার হেসে ফেলল, চিরকাল তোমার মাথা গরম।

জহুর উত্তর দিল, আর তোমার খুব ঠাণ্ডা! ভাড়া দেবে কোত্থেকে শুনি?

ইউনুস চুপ করে গেল। তার ইচ্ছে ছিল দরকার হলে দুই এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে আপদ বিদেয় করা।

জহুর হঠাৎ মরিয়মকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ভাবী, ঘর না হয় পেলে, কিন্তু খাবে কি?

স্পষ্টস্বরে মরিয়ম বলল, যদি বলি আপনারা খাওয়াবেন চাঁদা তুলে? সে তো আপনাদের জন্যেই জেলে গেছে!

জহুর উত্তর দিল, ঠিক কথাই! কিন্তু কে চাঁদা দেবে? এখানে সব এখন মরে রয়েছে! আজকাল কেউ টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে না!

মরিয়ম ম্লান হেসে বলল, আমি মেয়েমানুষ, ভাত রাঁধতে পারি। সেই কাজই আমাকে জোগাড় করে দেবেন।

ইউনুস ঘাড় হেঁট করে রইল। আনিসের বৌ পরের বাড়ীতে ঝিগিরি করতে পারে এ কথা যেন সে এখনো মেনে নিতে পারছে না। অথচ কী করে যে এদের সংসার চলবে, তাও সে ভেবে দেখেনি। সে শুধু চেয়েছিল দীর্ঘকালের প্রতিবেশীর স্ত্রীর হাত থেকে দ্রুত পরিত্রাণ।

জহুর সোৎসাহে বলল, সে রকম কাজ নিশ্চয় জোগাড় করা যাবে।

হালিমা এবং বিশেষ করে ইউনুস অন্ততঃ আর একটা বেলা থেকে যেতে পীড়াপীড়ি করল মরিয়মকে। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হল না।

যত শীঘ্র নতুন জীবন সুরু করা হয় ততই ভালো।

হালিমা দেয়াল থেকে আর্শীটা খুলে এনে মরিয়মের হাতে দিতে গেল, নে মরিয়ম তোর আয়নাটা নিয়ে যা।

মরিয়ম প্রতিবাদ করল, আপা, কেন তুমি রাগ করছ! আমি আসব মাঝে মাঝে! আর ও আয়না রাখার মত ঘর হলে তখন নিয়ে যাব, এখন না।

পথে যেতে যেতে জহুর বলল, জানো ভাবী, যেদিন গুলি চলে সেদিন আমি যাচ্ছিলাম যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে, আনিস ভাই-ই আমাকে ফিরিয়ে দেন! নইলে কে জানে হয়ত বসিরের বদলে আমিই সাবাড় হয়ে যেতাম!

জহুরের এই খোলা মনের পরিচয় পেয়ে মরিয়ম সহজ সুরে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু জহুর ভাই, তোমার কেন চাকরী গেল?

জহুর জবাব দিল, ও কথা বাদ দাও ভাবী! চাকরী যাওয়ার হলে থাকে না!

এত দুঃখের মধ্যেও জহুরের কথার ধরন দেখে মরিয়ম হেসে ফেলল, তাই নাকি।

মাইল খানেক পথ হেঁটে তারা বাসায় এসে পৌঁছল। চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া দু'খানা ঘর, উপরে খড়ের ছাউনি, দাওয়া প্রায় মাটির সমান্তরাল বললেই হয়। একটি মেয়ে বারান্দায় কাঁচি দিয়ে বিড়ির পাতা কাটছিল ক্ষিপ্র হাতে। মুখখানা একেবারেই কচি। এখনো ছেলেমেয়ে হয়নি দেখলেই বোঝা যায়।

বৌকে ঘরে ডেকে নিয়ে জহুর ফিসফাস করে কী সব বলে আবার বেরিয়ে গেল আমের ডালি মাথায় নিয়ে। বৌটি ভয়ে ভয়ে মরিয়মের কাছে এসে বলল, ঘরে চাল নেই, আম বিক্রি করে এলে যদি কিছু হয়।

মরিয়ম হেসে ফেলল। ওকে হাত ধরে বসিয়ে বলল, ভেবো না ভাই, উপোস করতেই তো আমরা এসেছি।

মনি আর কলিকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে পাতা-কাটা কাঁচিটা হাতে তুলে নিয়ে মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, তোমার নামটা কি শুনি? খুশী! ডাক নাম খুশী? খুব ভালো নাম তো। খুশী, আমাকে বিড়ির পাতা

কাটতে শিখিয়ে দেবে ভাই ?

এ আর এমন কঠিন কি, বলে খুশী সত্যিই খুব খুশী হয়ে বিড়ির পাতা কাটা শেখাতে চেষ্টা করল। তখন ধীরে ধীরে জহুরের জীবন কথা জেনে নিতে লাগল মরিয়ম।

সৎমায়ের অত্যাচারে স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় জহুর। আসানসোলে এসে একটা দোকানে বয়ের কাজ পায়। রেলের এক মিস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়, তারই পরামর্শে যুদ্ধের সময় রেলে মেকানিক অ্যাপ্রেন্টিসের বিজ্ঞাপন দেখে কোলকাতায় যায়। সেখান থেকে জব্বলপুর। ট্রেনিংয়ের দু'বছর পার হলে আসাম ফ্রন্টে প্রেরিত হয়। যুদ্ধশেষে জামালপুর ওয়ার্কসপে যায়, সেখান থেকে কাঁচড়াপাড়া, পাকিস্তান হওয়ার পর ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে উপস্থিত। ওয়ার্ক-সপের সবচেয়ে ভালো মেকানিক বলে নাম করে জহুর। সৎমায়ের মৃত্যুর পর বাপ এসে দেশে নিয়ে গিয়ে ছেলের বিয়ে দেয়। বৌকে দেশ থেকে আনার সময় ঝগড়া হয় বাপের সঙ্গে। কী কথাকাটাকাটি হওয়ার পর মাস তিনেক আগে ওয়ার্কসপ ম্যানেজারের মুখে চড় মারার অপরাধে চাকরী হারিয়েছে! বাপ দেশে যেতে লেখে, কিন্তু জহুর বলে সে কিছুতেই গ্রামে যাবে না। সেখানে গেলেই নাকি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। রেলওয়ের আশেপাশে না থাকতে পারলে তার শান্তি নেই। শেষে কৌতুকের সঙ্গে খুশী বলল, মাথায় আম নিয়ে নিয়ে ঘোরে কিন্তু বিড়ি বানাতে বললেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়!

মরিয়ম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন!

খুশী জবাব দিল, আমিও তা বুঝি না! শুধু মাঝে মাঝে শুনি, আমার হাত দিয়ে বানাব বিড়ি!

মরিয়ম বলল, হাত দিয়ে কেবল চড় মারতে বুঝি ভাল লাগে!

খুশী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল, আপা আপনি কী যে বলেন!

এমন হাসি মরিয়ম বহুকাল দেখে নি। তার বুক যেন হাল্কা হয়ে গেল।

খুশী উঠে গেলেও জহুরের কথাই সে ভাবতে লাগল বহুক্ষণ ধরে। জহুর বলেছে রেলওয়ে কলোনী নিঃঝুম হয়ে গেছে। তাই যদি হবে

তাহলে জহুরের মধ্যে কোত্থেকে এল ঝড়ের মত উদ্দাম ঐ ক্রোধ? জ্বালা নিশ্চয় আছে ভিতরে ভিতরে। জহুরের ঘটনাটা সেই ধূমায়িত জ্বালার একটা বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সমস্ত জ্বালাকে একত্র ক'রে কে আগুন সৃষ্টি করবে? কোথায় তারা? কোথায় তার আনিস, আর নারায়ণ, আর কোরবান, আর খলিল, আর ইব্রাহিম, আর ফরিদ, আর সেই আওলাদ। বুড়ো দর্জি আজাহার পর্যন্ত জেলে। একেবারে ছেঁকে নিয়ে গেছে পুলিশ। প্রসন্নদার সেই গল্প মনে পড়ে গেল মরিয়মের—মেরে ফেলতে পার, কিন্তু পতাকা নামাব না। কিন্তু পতাকা যে নেমে গেল, কে ওঠাবে আবার? মরিয়মের শরীরের মধ্যে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। পুরনো দিন কি আর ফিরে আসবে না? বহুদিন পরে মরিয়মের রক্তে যেন দোলা লেগেছে।

১৬

দু'তিন দিন খোঁজ করেও জহুর কোনো কাজের সন্ধান আনতে পারল না! মরিয়ম নিজে যে চাকরী খুঁজতে বের হবে, এখনো ততখানি সঙ্কোচহীনতা আয়ত্ব করতে পারে নি। তাই বিড়ি তৈরীর কাজে লেগে গেল প্রাণপণে। কিন্তু জহুর প্রতিদিনই এসে বলে বিড়ি কিছু বিক্রি হয়েছে বটে, তবে বাকীতে!

শুকিয়ে উঠতে লাগল খুশী, অথচ কিছু বলতেও পারে না মুখ ফুটে। মণি আর কলির মুখের দিকে চেয়ে মরিয়ম একদিন সকাল-বেলা বেরিয়ে পড়ল মাথায় বেশ ঘোমটা টেনে। বড় লোকেরাই যখন ঝি রাখে তখন সে চলল বড় বড় বাড়ী দেখে খোঁজ নিতে।

কয়েকটা বাড়ীতে কাজের বদলে সে মুখের উপর অনুভব করল মানুষের কামাতুর দৃষ্টি। বাইরের জগতে চলাফেরার মধ্যে এ রকম দৃষ্টি গায়ে-না-মাখার মত অভ্যাস হয় নি এখনো, তাই ফিরে আসছিল মন খারাপ ক'রে। শেষে কৃষ্ণচূড়া পরিবেষ্টিত একটি বাড়ীতে কিছু মেয়েকে ঢুকতে দেখে সেও ঢুকে পড়ল সাহস করে। কিন্তু মেয়েরা গিয়ে বসল বাইরের ঘরে, তখন মরিয়মের হুঁশ হল, এটা হয়ত কোনো ডাক্তারের বাড়ী।

অন্দর মহলের দিকে পা বাড়াতেই একজন ষ্টেথিসকোপ ঝোলান লোক তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাঁহা যাতা, ক্যা মাঙতা!

সা'ব আপনারা লোক রাখবেন?

বিশুদ্ধ উর্দুতে জবাব এল, লোক দরকার হলে তোমাকে বরং সাপ্লাই করতে পারি! আর শরীর যদি দেখাতে চাও তা'হলে বিনা পয়সায় তোমাকে পরীক্ষা ক'রে দিতে পারি!

ডাক্তারের শ্লেষোক্তি শুনে রাস্তার দিকে মরিয়ম পা বাড়াল। পেছন থেকে রানিং শেডের ক্লার্ক নূর মহম্মদ তাকে ডাকল, থোড়া ঠাহরিয়ে!

নূর মহম্মদের মুখে পড়েছে বার্দ্ধক্যের ছাপ, যদিও দুই চারটির বেশী চুল পাকে নি এখনো। একটু কাশতে কাশতে নূর মহম্মদ বলল, দেখলেন তো জালাল আহম্মদ কেমন বদমাস আছে! আমার বাড়ীতে বৌ আর মেয়ের অসুখ, তা নিজে তো যাবেই না, কম্পাউণ্ডারকেও পাঠাবে না। ব্যাটা খালি ডুবে আছে ঘুষের মধ্যে।

কিন্তু মরিয়ম বুঝে উঠতে পারল না তাকে ডাকা হল কেন। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মুখের দিকে চাইতেই নূর মহম্মদ বলল, আমার বাড়ীতে সব রুগী, আপনি যদি একটু রান্নার কাজ ক'রে দেন, বেঁচে যাই! কিন্তু আপ-খোরাকী, দশ টাকার বেশী দেওয়ার সাধ্য নেই আমার।

মরিয়ম হাতে স্বর্গ পেল। দশ টাকাই বা আসে কোত্থেকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল সে এবং নূর মহম্মদের পিছনে পিছনে চলতে সুরু করল।

নূর মহম্মদ চিনতে পারে নি আনিসের বৌকে, পারলে এত সহজে হয়ত ডাকতেও পারত না, বলতেও পারত না কাজের কথা।

বাড়ীর সামনে এসে নূর মহম্মদ বলল, এই আমার মোকান! এতে গরু বাছুর ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে? একটুও হাওয়া লাগে না। তবু তো ওয়াগন থেকে এতদিনে এটা জুটেছে।

একখানাই মাত্র বড় ঘর। কেরোসিন কাঠের দু'খানা চৌকি পাতা পাশাপাশি। তাতে দু'জন শুয়ে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। পাশেই একখানা গুদামের মত ঘর, একখানা ছোট চৌকি, ভাঙ্গা চেয়ার আর হাঁড়িকুঁড়িতে ভর্তি। নূর মহম্মদ বলল, ছেলে পড়ে কলেজে, সে

এলে আরো মুস্কিল।

রান্নাঘর বলতে আলাদা কিছু নেই। বারান্দার একপাশে কতকগুলি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র, শিলনোড়া, কাঁচের গ্লাস, চায়ের কাপ প্লেট, মাটির উনুন।

রান্না সেরে রুগীদের পথ্য দিয়ে ঘর পরিষ্কার ক'রে যখন সে বিদায় নিল তখন সূর্য উঠে এসেছে প্রায় মাথার উপর। ক্ষুধাতৃষ্ণায় ঝিমঝিম করছে তার শরীর। নূর মহম্মদ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকল, দাঁড়াও! আমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে আর আপনি বলব না!

মরিয়মের হাতে দু'টো টাকা দিতে গেল নূর মহম্মদ। মরিয়মকে ইতস্তত করতে দেখে বলল, আমি জানি তোমার খুব দরকার।

লোকটার বিবেচনা শক্তি আছে! মরিয়ম হাত বাড়াল, আচ্ছা দিন!

মরিয়মকে ঘরে ফিরতে দেখে একগাদা যন্ত্রপাতির মধ্যে থেকে জহুর প্রায় লাফিয়ে উঠল, ভাবী, এই দেখো! একরকম তালা আবিষ্কার করেছি! যেমন সস্তা তেমনি মজবুত! একটু থেমে ম্লানমুখে বলল, কিন্তু আমার তো পয়সা নেই, প্যাটার্ণ-টা দু'চার টাকায় বিক্রি ক'রে দিতে হবে। হয়ত বিক্রির লোকও জুটবে না।

মরিয়ম ভেবে পেল না, কী বলবে।

জহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ভাবী, আমি যদি কুড়ি পঁচিশটা টাকা একসঙ্গে পেতাম! তা'হলে আর সংসারের ভাবনা ছিল না! এমন সব জিনিষ বানাতাম যা হু হু ক'রে বিক্রি হয়! কিন্তু কাঠ কিনতে পয়সা লাগে যে!

মরিয়ম কৌতুহল চাপতে পারল না, কী কী জিনিস বানাতে?

জহুর উত্তর দিল সে আমি এখন বলব না! কাঠ কেনারই যখন টাকা নেই, তখন—

খুশী এসে দাঁড়িয়েছিল, মুখের অপরূপ ভঙ্গি ক'রে বলল, তা তোমার ঐ যন্ত্রপাতি কিছু বিক্রি ক'রে দিলেই তো টাকা আসে!

জহুর রেগে গেল, খবরদার! আমার এ সবের উপর নজর দিয়ো না! কত কষ্ট ক'রে জুটিয়েছি, মরে গেলেও আমি এর একখানা বিক্রি করতে পারব না।

আরো কী বলতে যাচ্ছিল জহুর, কিন্তু থেমে গেল কী দেখে।

চামড়ার সুটকেশ হাতে ফর্সা জামা কাপড় পরা খুশীর বড় ভাই গেঁদু মিঞা উদয় হলেন অভাবের সংসারে গোদের উপর বিষফোড়ার মত। খুশী বিমর্ষমুখে সালাম করল ভাইয়ের পায়ে। গেঁদু মিঞা অনতিবিলম্বে আগমনের হেতু জানিয়ে বললেন, বর্দ্ধমান থেকে তোদের এখানে আসা কী সহজ, শুধু আলুবীজ কেনার ক'টা টাকার জন্য আসতে হল এতদূর। তোদের তো নগদ পয়সা, আমাদের কি আর আজকাল চাষ ক'রে ফয়দা আছে।

বোঝা গেল জহুরের চাকরী হারানোর খবর এখনো জানে না তার আত্মীয় স্বজন।

গেঁদু মিঞা মরিয়মকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইনি কে ?

মরিয়মই মৃদু স্বরে জবাব দিল, বাসা নেই বলে আমরা এখানে এখন কয়েকদিন আছি!

মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে গেঁদু মিঞা খুশীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এমনিতেই তো বাসায় জায়গা দেখছি নে!

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল মরিয়ম। খুশীও তাড়াতাড়ি তার কামরায় ঢুকে বিড়ি তৈরীর সমস্ত সাজসরঞ্জাম বেশ ভালো ক'রে লুকিয়ে ফেলল চৌকীর নীচে, গেঁদু মিঞার চোখে যাতে না পড়ে।

মরিয়ম কী ভেবে খুশীর ঘরে এসে তার কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপরে দু'টো টাকা বের করে বলল, নাও!

খুশী মরিয়মকে একেবারে জড়িয়ে ধরল, কোথায় পেলেন আপা! আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছিলাম ভাইকে কী খাওয়াই! আপা বাঁচালেন আপনি!

মুষ্কিল হল জহুরের। সে বিকালে আমের খালি ঝুড়িটা নিয়ে গেঁদু মিঞার সামনে দিয়ে কিছুতেই বের হ'তে পারল না রাস্তায়। যেখানে কেউ চেনে না সেখানে কোনো পরিশ্রমেই তার লজ্জা নেই। কিন্তু—

কাজেই একজনের বিড়ি তৈরী বন্ধ, আর এক জনের আম বেচা। প্রায় মরিয়া হয়ে তাই জহুর সারা বিকাল এবং সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াল টাকা

ধারের জন্য। কিন্তু নিরুপায় হয়ে ফিরতে হল তাকে। ফেরার পথে স্কুলের হেডমাস্টার বজলুস সাত্তার ডেকে বললেন, আম কোথায় ?

আপনি যদি বলেন কাল নিয়ে আসব।

হ্যাঁ কাল কিছু দিয়ে যেয়ো! ছেলেটা কলেজ ছুটির পর দু'এক দিনের মধ্যে আসছে। একটু ভালো আম দুধ খাওয়াব যে, তারও উপায় নেই, পাকিস্তানে আমের যা দাম! আচ্ছা, একটা ঝি জোগাড় ক'রে দিতে পারো, বেশ বিশ্বাসী ? খাবেদাবে আর পাঁচ টাকা।

আমি আজই নিয়ে আসতে পারি!

বজলুস সাত্তার হাসলেন, আমার অত তাড়া নেই। কাল সকালে আনলেই হবে। তবে খেয়াল রেখো চুরিচামারির স্বভাব যেন না হয়।

জহুর মুখ লাল ক'রে বলল, আমি তাকে ভালভাবে জানি, সে চুরী করতে পারে না।

বলা যায় না কিছুই! পরপর তিনটে ঝি ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে!

প্রতিবাদ না করতে পেরে জহুর ফিরে এল ম্লানমুখে। কিন্তু হাসিমুখে মরিয়মকে খবরটা দিতে গিয়ে শুনল সে এখনো কাজ থেকে ফেরেনি।

প্রায় রাত ন'টায় বাসায় ফিরে মরিয়ম সংবাদটা শুনে আনন্দিত হতে গিয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। একদিন ঐ স্কুল থেকেই মাইনের অভাবে সোনার নাম কাটা গিয়েছিল যে! আর আজ মাইনে নিয়ে কাজ করতে হবে সেই স্কুলেরই হেড মাষ্টারের বাড়ীতে। উপায় কি! নূর মহম্মদ টাকার বদলে যদি খাওয়ার ভাতটা দিত, তাহলে মাইনের চেয়ে তাতে সুরাহা হত। কিন্তু এখন আর অপেক্ষা করার সময় কই। আর একটা কাজ নিতেই হবে।

পরদিন অতি ভোরে উঠে মরিয়ম বজলুস সাত্তারের বাড়ী গেল জহুরের সঙ্গে।

কাজ না পেলে মৃত্যু, পেলে হাঁপানি ধরে। মরিয়মকে বজলুস সাত্তারের বাড়ীর যাবতীয় কাজ সেরে যেতে হল রেলক্রসিং পার হয়ে নূর মহম্মদের বাড়ী, সেখানে সব কিছু সমাপ্ত ক'রে আবার ফিরতে হল বজলুস সাত্তারের বাসায়, সেখান থেকে ভাত তরকারীর থালা নিয়ে

আঁচলের তলায় ঢেকে যখন বাড়ী ফিরল তখন বেলাও হয়েছে যেমন. তেমনি শরীরের সমস্ত শক্তি যেন এসেছে ফুরিয়ে।

মনি এবং কলি ও-ভাবে মাকে ভাত আনতে দেখে বিস্মিত হল, কিন্তু ছুটে এল ক্ষুধার্ত মুখে। মরিয়ম তাদের ঠেলে দিয়ে খুশীকে ডাকল. খুশী ভাতটা রেখে দে! আর·এই নে, দোকান থেকে ধারে চিঁড়ে কিনে এনেছি। এতেই এ—বেলাটা চলে যাবে, তারপর দেখা যাবে।

খুশীর চোখ ছলছল ক'রে এল। সে ভেবেই আকুল হচ্ছিল ভাইকে কী খেতে দেবে। তবু সে 'না' 'না' করতে লাগল বারবার।

বাইরে থেকে ফিরে গেঁদু মিঞা থালা ভরা ভাত সামনে নিয়ে খেতে বসে বিরক্ত হয়ে বললেন, এত ভাত কেন একসঙ্গে দিয়েছিস? আমি কি একটা কুলি যে আমাকে এই ভাবে খেতে দেওয়া!

খুশী মুখ বুজেই ছিল, গেঁদু মিঞা ভাত নাড়াচাড়া ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, আর ভাতের মধ্যে ডাল দিয়ে রেখেছিস কেন?

খুশী সম্ভাব্য কোনো উত্তর দিতে না পেরে অপরাধ স্বীকার করল. ভুল হয়ে গেছে!

গেঁদু মিঞা ভাত গলাধঃকরণ করতে করতে গোঙানীর সুরে বললেন, এমন ভুল হয় কেন? আদবকায়দা তোরা একদম ভুলে গেছিস!

বেফাঁস কিছু বলে ফেলার ভয়ে খুশী চিঁড়ে ভিজাতে বসল ঘরের মধ্যে গিয়ে।

রাত্রে বারান্দায় গেঁদু মিঞাকে শয্যা পেতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ ক'রে কাটালেন সময়টা। তারপর পৃথিবীর চোখে যখন ঘুম নামল, গেঁদু মিঞা ভেজানো দরজাটা ঠেলে প্রবেশ করলেন মরিয়মের ঘরে। হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোটা সম্পূর্ণ নিবিয়ে দিয়ে মরিয়মের গায়ে হাত দিলেন।

মরিয়ম ধড়মড় ক'রে উঠে বসল—কে! কে!

গেঁদু মিঞা গলার স্বর অতি মোলায়েম ক'রে জবাব দিল, আমি! আমি গেঁদু মিঞা!

উপস্থিত বুদ্ধিতে মরিয়ম চিৎকার ক'রে উঠল, চোর! চোর!

সে শব্দে মনি আর কলির ভেঙে গেল ঘুম। অন্ধকারে মনি

জিজ্ঞাসা করল, মা! মা! তুমি কোথায়!

কলি কী মনে ক'রে জুড়ে দিল কান্না!

ও ঘর থেকে ছুটে এল জহুর আর খুশী। ওরা লণ্ঠন হাতে ক'রে খোঁজাখুঁজি করল এ-দিক ও-দিক। গেঁদু মিঞা একটা বিড়ি ধরিয়েছে বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে।

মরিয়ম উঠোনে দাঁড়িয়ে খুশী আর জহুরকে উদ্দেশ করে বলল, থাক! এবার যাও তোমরা শুয়ে পড়।

গেঁদু মিঞা মুখ গোমড়া ক'রে খানিকক্ষণ বসে থেকে বিছানায় কাৎ হল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সুরু করল নাক ডাকাতে।

পরদিন জহুরের চাকরী হারানোর খবরটা জানতে পেরে গেঁদু মিঞা জহুরের গোঁয়াতুর্মির নিন্দা করতে করতে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

স্বামীর বিরুদ্ধে গেঁদু মিঞার গালাগালিতে ক্রুদ্ধ হয়ে খুশী সারাদিন বিড়বিড় করতে লাগল, অমন ভাইয়ের মুখে ঝাঁটার বাড়ি!

তারপর এক সময় মরিয়মকে জড়িয়ে ধরল, আপা, আমার ভাইয়ের চেয়ে তুমি আমার অনেক আপন।

মরিয়ম খুশীর চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিল, ঈশ! কী অবস্থা হয়েছে তোর চুলের! তোকে এক শিশি তেল কিনে দিতে হবে।

খুশী অভিমানের সুরে বলল, আর তোমার কি হাল হয়েছে! একদম জটা পাকিয়ে গেছে!

১৭

সকাল থেকে মরিয়মের কাজ সুরু হয় আর রাত্রি ন'টা দশটায় শেষ। দু'বারে মরিয়মকে কমপক্ষে মাইল চারেক পথ হাঁটতে হয়। ঘড়ির, কাঁটার মত কাজের চাকা ঘুরতে থাকে বিরামহীন। তবু অভাবের কালো ছায়া দীর্ঘতর হয়। ছোটখাট অসুখ হবেই, পরনের কাপড় ছিঁড়বেই। চিন্তার সুযোগশূন্য দিনরাত্রির মধ্যে মনে মনে চলে দুশ্চিন্তা। কিন্তু, দুশ্চিন্তাও একরকমের চিন্তা।

ছেলেমেয়ের লেখাপড়া যখন হবেই না, পাড়ায় দুষ্টুমী ক'রেই যখন

দিন কাটাচ্ছে, এমন কি নষ্ট করছে ভালো স্বভাব এবং সংসারের টানটাও যখন তীব্র, তখন মরিয়ম অনেক ভেবে চিন্তে মনি এবং কলিকে একদিন রেলক্রসিংয়ের কয়লার গাদার পাশে এনে বসিয়ে দিল! কয়লার কুচি কুড়োলে দু'টো পয়সা আসবে তবু। নানা বয়সের আরো কিছু ছেলে-মেয়েও ওখানে জড় হয়েছে, কিন্তু পরিচিত কাউকে দেখতে পেল না মরিয়ম। কয়লার গাদার উপর মনি এবং কলিকে রেখে সে রেলক্রসিং পার হয়ে এল নূর মহম্মদের বাড়ী।

তখন নূর মহম্মদ পড়াতে বসেছে মেয়ে আসিয়াকে। রোগা মেয়েটার অসুখ থেকে উঠে খাই খাই স্বভাবটা বেড়েছিল অত্যধিক পরিমাণে, মরিয়মকে সে খানিক পরে ডাক দিল, ঝি, একটা কথা শুনে যাও! আমাকে দোকান থেকে এই দু'পয়সার মুড়ি এনে দাও না!

ঝি সম্বোধনে মরিয়মের হাত থেকে পড়ে গেল অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রটা, পায়ের উপর গড়িয়ে এসে পড়ল খানিকটা তরকারীর উত্তপ্ত ঝোল।

নূর মহম্মদ ছুটে এল, আহা, পা'টা পুড়ে গেল নাকি।

তীব্র জালা অনুভব করলেও মরিয়ম উত্তর দিল, না, কিছু হয়নি!

নূর মহম্মদ মেয়েকে তিরস্কার করল, তোকে বলেছি না কখনো ঝি বলবিনে!

ঘরের ভেতর রোগ শয্যা থেকে নূর মহম্মদের বৌ মাজেদা বলে উঠল, ঝিকে ঝি বলবে না তবে কি বাদশাজাদী বলবে!

আহ, কি বলছ, চুপ করো!

কেন, চুপ করব, দেশে একটা পাঁচটাকার ঝি রাখলে এর দশগুণ কাজ করত! কিন্তু এখানে? আর কী রান্নার শ্রী, মুখে দেওয়া যায় না।

নূর মহম্মদ লজ্জায় সঙ্কোচে তাকাতে পারল না মরিয়মের দিকে, কারণ সে ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে কে মরিয়ম।

খানিক পরে মরিয়ম দুধবার্লি জ্বাল দিয়ে নিয়ে গেল। মাজেদা এক চুমুক খেয়ে মুখটা বিকৃত করে বাটিটা নামিয়ে রাখল, দেখো তোম বাঙালী লোক কুছ নেহি জানতা। তোমরা খালি খেতেই পারো।

মরিয়ম বেরিয়ে গেলে নূর মহম্মদ বৌকে বলল, আমার অবর্তমানে তোমার অবস্থা ওরই মত কিম্বা ওর চেয়ে খারাপ হবে, তা জানো!

মুখ ঘুরিয়ে মাজেদা উত্তর দিল, বাঙালী লোক বহুত হারামী আছে।

মরিয়মের কানে গিয়েছিল কথাটা। নূর মহম্মদ ঘরের বাইরে এসে তাকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে এসে বলল, দেখো, তুমি আমার বহিন আছে। রুগী মানুষের কথা ধরতে হয় কখনো ?

খকখক ক'রে কাশতে সুরু ক'রে দিল নূর মহম্মদ। একবার কাশির দমক এলে আর থামতে চায় না। সারা শরীর দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। মরিয়ম বাতাস করতে সুরু করল তাড়াতাড়ি একটা পাখা এনে।

নূর মহম্মদ গালি পাড়তে লাগল, হারামখোর ডি-এম-ও ! আমাকে না করবে চিকিৎসা, না দেবে ছুটী। এক নাগাড়ে কুড়ি বছর দোজখের মধ্যে চাকরী ক'রে আমার ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে রে !

কথাটা সত্যি। রাণিং শেডের ক্লার্ক হিসাবে যেখানে নূর মহম্মদকে চিরদিন বসতে হয়েছে সেখানে ডজন ডজন রেল ইঞ্জিন রাশিকৃত কালো ধোঁয়া ছাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা। তার মধ্যে টেবিল আর চেয়ার পেতে হিসাব রাখার কাজ। মাসের পর মাস বছরের পর বছর নূর মহম্মদের চোখে মুখে নাকে ফুসফুসে ঢুকেছে ধোঁয়ার বিষবাষ্প আর কয়লার গুঁড়ো।

নূর মহম্মদ দম নিয়ে বলল, আর বাতাস করতে হবে না, বহিন, আল্লা তোমার ভালো করবে ! আমাকে পাখাটা দাও।

একটা ফুটফুটে ফর্সা ছেলে সুটকেশ্ হোল্ডঅল ঘাড়ে ঢুকল বাড়ীতে। লাফিয়ে উঠল নূর মহম্মদ, সাবু, বেটা তোর কলেজে ছুটি হল এত দিনে।

সাবু বাপের পায়ে সালাম ক'রে জিজ্ঞাসা করল, আম্মা কৈসা হ্যায় ?

নূর মহম্মদ হেসে উত্তর দিল, এবার তুই যখন এসেছিস তখন তোর মা ভালো হয়ে উঠবে।

আসিয়া এসে ভাইকে শুধাল, আমার জন্য কি এনেছ ?

সাবুর পয়সা ছিল না, প্রায় কিছুই আনতে পারে নি, কিন্তু পরিহাস করল, বাঙ্গাল মুল্লুকে কি কিছু পাওয়া যায় !

নূর মহম্মদ আড় চোখে মরিয়মের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, পয়সা থাকলে সব পাওয়া যায়।

কয়েকটা খেজুর বের ক'রে বোনের হাতে দিতে দিতে সাবু জিজ্ঞাসা

করল; এটি কে? ঝি বুঝি? এই নাও! বলে মরিয়মকেও খেজুর দিতে গেল সাবু। মরিয়ম পিছিয়ে গেল দু'পা, না আমার লাগবে না, আপনারা খান।

সেখান থেকে বেরিয়ে ভাত তরকারী নিতে বজলুস সাত্তারের বাড়ী এল মরিয়ম। বজলুস সাত্তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন উচ্চস্বরে, মরিয়মের কানে এল, আমি রিজাইন করবই!

তাকে দেখে বজলুস সাত্তার ডাকলেন, একটু শোনো। এক গ্লাস পানি নিয়ে এস। আজকাল কথা বলতে গেলেই গলা শুকিয়ে আসে।

মরিয়ম এক হাতে পানি আর এক হাতে সরবৎ নিয়ে এসে দাঁড়াল। বজলুস সাত্তার হাসলেন, দেখো কাঞ্চন, না চাইতেই তোমার মা তোমার জন্য সরবৎ দিয়েছে, আর আমার জন্য পানি।

কাঞ্চন উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসটা নিঃশেষ ক'রে মরিয়মের হাতে ফেরত দিয়ে বলল, কোন অবস্থাতেই আপনার রিজাইন করার প্রশ্ন আসে না!

বজলুস সাত্তার বিমর্ষমুখে জবাব দিলেন, কিন্তু এর চেয়ে দেশে গিয়ে জমিজায়গা দেখা ভালো।

বিস্মিত হয়ে একটু দাঁড়িয়ে গেল মরিয়ম, এমন কি কারণ ঘটল যাতে বজলুস সাত্তার পদত্যাগ করতে চায়! সে জানত না কী ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। বজলুস সাত্তার স্কুলের গ্রাণ্ট বাড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন এই যে স্কুলের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ, নতুন শিক্ষক প্রয়োজন, পুরনোদের মাইনে বাড়ান দরকার, কাজেই সাহায্যও বাড়ানো হোক। কিন্তু আজ কর্তৃপক্ষ এক চিঠিতে জানতে চেয়েছেন, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা যখন ডবল হয়েছে তখন চলতি গ্রাণ্টটা কেটে কেন অর্ধেক করা হবে না!

কাঞ্চন বলল, এর বিরুদ্ধে একটা ম্যাস পিটিশন করা দরকার। তাছাড়া কাগজে লেখালেখি করতে হবে, আন্দোলন চালাতে হবে।

বজলুস সাত্তার জবাব দিলেন, তোমাদের বয়েস আছে বাবা, তোমরা আন্দোলন করো। কিন্তু আমি আর পারব না। নুরুল আমিন গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে কিছু হবে না। করাচী ওদের গিলে খেয়েছে একেবারে। আর ঐ বিহারী পাঞ্জাবীরাই দেশটাকে লুটে খেল! অবাঙালী ফার্মে

একটা বাঙালী দারোয়ান পর্যন্ত রাখে না। পারো তো তোমরা ওদের তাড়াও।

কী কথায় কী কথা এসে গেল! মরিয়ম দু'হাতে দু'টো শূন্য পানির গ্লাস নিয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু এই তর্কের আকর্ষণ সে অনুভব করল খানিক আগের ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত বলে। পরস্পরের বিরুদ্ধে এত বেশী ঘৃণা! কোত্থেকে যেন উঠে আসছে একটা পাগলা ঝোড়ো হাওয়া। গ্রামেও দেখে এসেছিল, আর এই শহরেও দেখছে তারই আভাস।

ভাতের থালা হাতে পথে যেতে যেতে হাসমতের কথা মরিয়মের মনে পড়ল। গ্রীষ্মের ছুটিতে সাবু এসেছে, কাঞ্চন এসেছে, হাসমতও বোধ হয় ফিরেছে বাড়ী। কী ভাবছে সে মরিয়ম সম্বন্ধে। হাসমৎ কি এখানে খুঁজে খুঁজে দেখা করতে আসতে পারে না!

রেল ক্রসিংয়ের পারে একটা গাছের তলায় শূন্য ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনি আর কলি!

মনি কাঁদো কাঁদো সুরে নালিশ করল, মা, একটা ছেলে জোর ক'রে সব কয়লা কেড়ে নিয়ে গেছে!

মরিয়ম প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে বলল, কেড়ে নিয়ে গেল! কয়লার কুচিও কেড়ে নিয়ে গেল!

তারপর মেয়ের গালে সে চুমু খেল, চল মা আমরা বাড়ী যাই! কালকে যাতে কেড়ে না নেয় তাই করব।

মরিয়মের মনে পড়ল বহুকাল আগে একদিন উচ্ছাসভরে আনিস কোরবানকে বলছিল, দেখো কোরবান ভাই, সাধারণ মানুষের ভাগ্যে মেলে শুধু উচ্ছিষ্ট। কেউ কুড়িয়ে বেড়ায় ডাস্টবীণের এ'টো পাতায় বড়লোকের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট, কেউ কুড়োয় বস্তাকাঁধে টুকরো কাগজ, ভাঙ্গা টিন, ছেঁড়া কাপড়, ফুটো পয়সা আর ভাতের ফ্যান কিম্বা তুষের মধ্যে চাল, ছাইয়ের মধ্যে কয়লার কুচি। ছাত্র খোঁজে পুরনো বই, কেরানী খোঁজে চাকরীর উচ্ছিষ্ট। এ যেন উচ্ছিষ্টের সভ্যতা। উচ্ছিষ্ট নিয়েই আবার কাড়াকাড়ি মারামারি। আর মানুষ নিজেরাও যেন উচ্ছিষ্ট, প্রয়োজন মিটলে বড়লোক তাদের রস নিঙড়ানো ছিবড়ের মত ফেলে

রেখে যায় পথের পাশে।

মরিয়মের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল, একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি না আনিসের বৌ ? আনিস কি জেল থেকে ছাড়া পাবে না ?

লোকটা উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই বলল, থাকত যদি তারা, শালা শুয়ারের বাচ্চাদের টেনে ছিঁড়ে ফেলত। থুঃ! থুঃ! এখন যারা আছে তারা সব আস্ত ভেড়া! যত সব ছাগলের পাল!

লোকটার চোখ রক্তাক্ত, মুখ দিয়ে উঠছে ফেনা। মরিয়ম মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কি হয়েছে আপনার!

কী আর হতে বাকী আছে! শালা, ক্লিনারের কাজ করছি দশ বছর, আর আজ এক কলমের খোঁচায় ক'রে দিল গ্যাংম্যান। চাকরী আমি আর করব না! এক শালাকে খুন করে এই রিভার্টের জবাব দেব।

মনের ক্ষোভ জানিয়ে হন হন করে চলে গেল লোকটা। তার অপসৃয়মান মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল মরিয়ম। কলি মায়ের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, মা দাঁড়ালে কেন, চল বাড়ী যাই!

হ্যাঁ চল যাই!

কোত্থেকে একটা ভাঙ্গা পেট্রোম্যাক্স জোগাড় ক'রে এনে জহুর তার মেরামতের কাজে লেগেছিল, মরিয়মকে আসতে দেখে মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করল, আজ এত দেরী কেন ভাবী ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে মরিয়ম কপালের ঘাম মুছে বলল, পথে একটা লোক দেখলাম, রিভার্ট করেছে শুনে ক্ষেপে গেছে একদম।

জহুর তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, শালারা শত শত লোককেই তো আজকাল রিভার্ট করছে!

তাই নাকি!

মরিয়ম গোসল ক'রে ভাত খেয়ে দুপুর বেলা একটু চোখ বুজতে চেষ্টা করল, কিন্তু মাথার মধ্যে চিন্তার দাপাদাপিতে ঘুম এলো না কিছুতেই। চাটাই শয্যা থেকে উঠে পড়ল সে। আনিসের কোনো চিঠি এসেছে কিনা খোঁজ নিতে চলল নিজের সেই পুরনো বাড়ীতে।

আজিজ দরজা খুলে দিয়ে বলল, বেটী তোম!

মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, আমার কোনো চিঠি এসেছে?

আজিজ উত্তর দিল, নহি তো!

তার পরই দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আজ যদি আনিস থাকত!

মরিয়মের বুকের মধ্যে দুলে উঠল, জিজ্ঞাসা করল, কেন চাচা কী হয়েছে?

আর কেন, আজিজ গিয়ে বসে পড়ল ঘরে দাওয়ায় অত্যন্ত অসহায় ভঙ্গিতে। ঘরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল আজিজের বৌ, বলল, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল! সারাদিন আজ উনাকে কিছু খাওয়াতে পারি নি!

অধৈর্য হয়ে মরিয়ম প্রশ্ন করল, কিন্তু কী হয়েছে!

আজিজই উত্তর দিল, দেখো বেটী, তেইশ বছর আগে আমি ফিটারের কাজে ভর্তি হই, তার দশ বছর পরে ক্লিনার, আরো তিন বছর পরে সেকেণ্ড ফায়ারম্যান, আরো দু'বছর পরে ফার্ষ্ট ফায়ারম্যান, তারো আট বছর পরে রিলিভিং মাষ্টার হই। আর আজ? এক কলমের খোঁচায় আবার সেই ফিটার! আমার কুড়ি বছরের মেহনত গেল কোথায়? এই যে আজ আমি বুড়ো হয়েছি, চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, রিটায়ারের সময়, এখন আবার আমি সেই ফিটার!

আজিজের দুই গাল বেয়ে অঝোর ধারে নেমে এল অশ্রুর বন্যা। মুছে ফেলার কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না।

মরিয়ম আস্তে আস্তে বলল, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু এত অধীর হ'লে কি চলে! মুখে দানাপানি দিন!

বেটী, হাম মর জায়েগা, হামারা ডেথ ওয়ারেণ্ট হো গয়া।

ছিঃ কাঁদবেন না!

মরিয়ম ফিরে এল বাড়ী, বিকালে আবার বেরুল কাজে, ফিরল যখন তখন রাত হয়েছে অনেক। ঘুমিয়ে পড়েছে মণি আর কলি। সারাদিন পরিশ্রমের পর মরিয়ম কোনো মতে নাকে মুখে একটু গুঁজে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু চোখে তার ঘুম এল না। মাথার মধ্যে কেবল ঘুরছে সারাদিনের চিত্রগুলি, কানে আসছে আজিজের ঐ কান্না—আমার ডেথ ওয়ারেণ্ট হয়ে গেছে। আর সেই অচেনা লোকটার ক্রোধের মূর্তি। একমাত্র রানিং শেডেই নাকি রিভার্টেড হয়েছে পঁচিশ জন, অথচ

লোকোতে একজনের জায়গায় নিযুক্ত হয়েছে ষোলজন ফ্যোরম্যান! এমন কথা কেউ কোনো দিন শুনেছে! সবাইকে বেশী খাটিয়ে কাজ উসুল করার কায়দা। যেখানে ছাঁটাই এবং রিভার্সনের সংখ্যা বাড়ছে সেখানে নতুন করে অতগুলি ফোরম্যান নিয়োগের অর্থ কি? একমাত্র কারণ হচ্ছে, মজুরদের উপর চোখ রাখা, তাদের আরো বেশী খাটিয়ে নেওয়া। এরা যেন সর্বত্র সব কিছু তচনচ করে দিতে চায়। বহু ড্রাইভারকে রিভার্ট করেছে সাণ্টারে, সাণ্টারকে ফার্ষ্ট ফ্যায়ারম্যানে, ফার্ষ্ট ফায়ার-ম্যানকে ক্লিনারে, ক্লিনারকে ফিটারে, ফিটারকে গ্যাংম্যানে! কিম্বা ক্লিনারকে সরাসরি রিভার্ট করা হচ্ছে গ্যাংম্যানে! রিভার্ট আর রিভার্ট! যেন ঘাড় গর্দান কাটা মানুষের কান্না! আর ঐ বাঙালী অবাঙালী। যেন হিংস্র দুটো অন্ধ পশুর ক্রুদ্ধ গর্জন! কিন্তু কী করা যাবে? প্রতিদিন সে কাজে বেরোয়, প্রায় চার মাইল রাস্তা হাঁটে, লোকে আঙুল দেখিয়ে বলে ঐ আনিসের বৌ যাচ্ছে! আনিসের বৌ তো মেয়েমানুষ, সে কি করতে পারে? লোকে এখন চাইছে আনিসকে! সবাই বলছে আজ যদি আনিস থাকত! আচ্ছা প্রসন্নদা বেঁচে থাকলে কি বলতেন মরিয়মকে? প্রতিকুল অবস্থাকে ভয় না করতে? মানুষের জন্য কিছু একটা করতে? পতাকা উঁচু ক'রে তুলে ধরতে?

মরিয়ম উঠে বসল বিছানায়। হ্যারিকেনের আলোটা উস্কে দিল, একটা কাগজ টেনে নিল, তারপর অতি কষ্টে লিখল, বাঙালী অবাঙালী ভাই ভাই! রিভার্ট করা বন্ধ করো! রিভার্ট শ্রমিকদের আগের কাজ ফিরিয়ে দাও! রিভার্টের বিরুদ্ধে বাঙালী অবাঙালী এক হও! হায়রে, এমনি ক'রে একদিন আনিসও পোস্টার লিখত, পাশে বসে দেখত মরিয়ম।

এত রাত্রে পাশের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ঘুম ভেঙে কৌতুহল বশে উঠে এল খুশী, জিজ্ঞাসা করল, কী করছ আপা এত রাত্রে।

এই দ্যাখ, কী করছি!

চোখ বুলিয়ে খুশী বলল, আপা, তোমার মাথা খারাপ!

ওরে, মাথা অনেক বেশী লোকের খারাপ হয়েছে।

কিন্তু ও দিয়ে কী হবে?

কী হবে দেখিস। তোর তো খুব ভালো হাতের লেখা, লিখে

দিবি অনেকগুলো কাগজে ?

কিন্তু লিখে কী হবে, আগে বলো।

মরিয়ম বিরক্ত হয়ে বলল, আচ্ছা তোকে লিখতে হবে না। শুয়ে পড়গে যা এখন। হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিয়ে নিজেই শুয়ে পড়ল সটান হয়ে।

খুশী অন্ধকারেই অনুযোগ করল, আপা তোমার ভারি রাগ। একটা কথা বললে বুঝিয়ে দাও না।

যা এখন, আমাকে জ্বালাসনে। কাল সকালে হবে।

মুখ ম্লান করে খুশী ফিরে গেল ঘরে।

কিন্তু পরদিন সকালে আলোচনায় ভালই ফল হয়েছিল। কারণ নিয়মিত পোস্টার পড়তে লাগল দেয়ালে দেয়ালে, ওয়াগনের গায়ে, লোকো এবং রানিং শেডের মধ্যে, স্টেশনের ভিতরে। ওরিজিন্যাল কপি মরিয়মের, বাংলায় পরিষ্কার হরফে লেখে খুশী, উর্দুতে আজিজ, আর জহুরের কাজ হচ্ছে সেগুলোকে আটা দিয়ে সেঁটে বেড়ানো কিম্বা চেনা লোকের হাতে লোকো আর রানিং শেডের মধ্যে চালান ক'রে দেওয়া।

আবার কথা কয়ে উঠল নিঝুম রেলকলোনী।

১৮

যে কারণেই হোক পদাবনতির প্রকোপ হ্রাস পেল। কিন্তু আক্রমণ যদি একদিক থেকে বন্ধ হয় তো তিন দিক থেকে এসে অস্থির করে। আগে ড্রাইভার ফায়ারম্যানদের 'কলবুক' হলেই তাকে 'অনডিউটি' ধরা হ'ত, কিন্তু এখন ডিউটিতে রিপোর্ট করার পরও যে পর্যন্ত না ইঞ্জিনখানা ঘষে মেজে রাণিং সেডের বাইরে এনে গাড়ীতে জোড়া হচ্ছে সে পর্যন্ত ডিউটি সুরু বলে গ্রাহ্য করা হবে না। এভাবে ইঞ্জিন বের করতে লাগে দেড় ঘণ্টা, ফিরিয়ে দেওয়ার সময় লাগে আরো দেড়ঘণ্টা। মোট তিন ঘণ্টা বেগার খাটতে হবে। ওদিকে পে কমিশনের রায় অনুযায়ী ট্রাফিকের লোকদের এগারো আনার বদলে এক টাকা দু'আনা ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স ধার্য হয়েছিল, কিন্তু সেটা তো কারো বরাতে জুটছেই না উপরন্তু অফিসের মর্জিমত টি-এ বিল কাটাকুটি ক'রে এবং যতদিন খুশী

দেরী ক'রে পাশ হয়ে আসছে, কিম্বা আসছেই না একেবারে! লোক অসুস্থ হলে আগে সরাসরি হেড কোয়ার্টারে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারত, এখন হুকুম জারী হ'ল এলাকার মেডিকেল অফিসারের কাছে 'সিক' রিপোর্ট করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে ঘুষ না-দিলে মেডিকেল অফিসারের কাছ থেকে ছুটীর সার্টিফিকেট্ জোগাড় করা অসম্ভব।

তথ্যগুলো কেন যেন অতি সহজেই এসে পেঁছিতে লাগল মরিয়মের কাছে। কিন্তু যেখানেই সে যায় আগের চেয়ে তিনগুণ জোরে এসে কানে বাজে একটা কথা, টাকায় কুলোয় না! টাকায় আগেও কুলোত না। কিন্তু এখন যেন তুফান উঠেছে অভাবের দুস্তর সাগরে। কেন? কেনর উত্তর ভাবতে ভাবতে চলেছিল মরিয়ম। পথ চলতে চলতেই ভাবনাটা যেন ভালো আসে তার মাথায়। ছাইয়ের গাদার পাশে মনি আর কলিকে বসিয়ে দিয়ে সে চলল বজলুস সাত্তারের বাড়ী।

আচ্ছা, চীপ রেশন শপটা উঠে যাওয়ার পরে ওদের পৌনে নয় টাকার চাল কিনতে হচ্ছে একুশ টাকায়, আট আনার তেল তিন টাকায়, চার আনার ডাল এক টাকায়, তিন আনার গুড় বারো আনায়, দশ আনার সাবান এক টাকায়। ষোল টাকার রেশনে যা পাওয়া যেত এখন তা কিনতে কত লাগে? পঞ্চাশ টাকার বেশী! শ্রমিকেরা দাবি তুলেছিল রেশন শপের দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা দূর করতে হবে, কিন্তু পে কমিশনের রায়ের পর ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স চব্বিশ থেকে ত্রিশ করা হ'ল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রেশন শপটাই উঠিয়ে দেওয়া হ'ল! লাভের গুড় তাই পিঁপড়েয় খেয়ে গেল। আর চীপ গ্রেনশপের মজুত চাল আটা গম স্থানীয় ক'জন ব্যবসায়ী পানির দামে কিনে নিয়ে এখন সেটাই বিক্রি করছে দ্বিগুণে তিনগুণে দামে!

তাহ'লে রেশন শপের দাবিটাই প্রধান দাবি, যদিও পে-স্কেল বাড়ানোর কথাও উঠছে এবং উঠাত উচিত। ধরা যাক, ঐ নিয়েই পোস্টার দেওয়া গেল। কিন্তু রিভার্টের মত রেশন শপ তো স্থানীয় অফিসারদের হাতে নয়। দূরে থেকে যারা কাঠি নাড়ছে তাদের নাড়া দিতে না পারলে এ-ক্ষেত্রে কিছু করা অসম্ভব। সে জন্য সমস্ত লাইনব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন। কিন্তু যারা বিভিন্ন স্থানের সেই যোগাযোগ করতে পারত

তারা নেই। মরিয়ম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ সব ভাবতে গেলে তার ভারি খারাপ লাগে। অথচ এক সময় আনিস তাকে এ-সব জিনিস নানা-ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেদিন সে শুধু শুনত আর হাসত। কিন্তু আজ যদি আনিস কাছে থাকত? তা হ'লে কী যে হ'ত মরিয়ম স্পষ্ট ক'রে তা ভাবতেও পারে না।

কাঞ্চন ইজিচেয়ারে বসেছিল। তার হাতে বাংলা কাগজ দেখে মরিয়ম এগিয়ে গেল, কি খবর লিখছে কাগজে?

কাঞ্চন আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, কী খবর চাও তুমি? আর খবরে তোমার দরকারই বা কী?

মরিয়ম চুপ করে রইল।

কাঞ্চনই তখন বলল, জানো ওরা উর্দু করবেই, আমাদের বাংলা ভাষা কিছুতেই দেবে না। তোমাকে ওরা কথা বলতে দেবে না জানো? ওরা তোমার মুখের ভাষা কেড়ে নেবে।

ওরা কারা!

ব্যাটা পাঞ্জাবীরা আর বিহারীরা।

কিন্তু সব মানুষ কি একরকম? ওদের উপরও তো কম অত্যাচার চলছে না।

কাঞ্চন উষ্মা প্রকাশ করল, তুমি কিছু জানো না, আর জানবেই বা কি ক'রে।

উদার গাম্ভীর্য নিয়ে কাগজে মনোনিবেশ করল কাঞ্চন. মরিয়ম তখন কাজের কথা পাড়ল. কিছু পুরনো কাগজ দেবেন আমাকে?

কাগজ থেকে চোখ না তুলেই কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল, কেন, কাগজ দিয়ে কি করবে তুমি! চুলো জ্বালাবে?

না।

তবে কাগজে তোমার কী দরকার।

দরকার না থাকলে চাইব কেন!

কাঞ্চন মরিয়মের দিকে তাকিয়ে তার ছিন্নপ্রায় শাড়ীখানা লক্ষ্য ক'রে বলল, কাগজের বদলে তোমার একখানা কাপড় দরকার। আচ্ছা মাকে বলে দেব যদি কোনো পুরনো কাপড় থাকে।

মরিয়ম কাজে গেল। এদের শ্রদ্ধা নেই, দরদ আছে।

মরিয়ম পোস্টার লেখার কাগজের বোঝা নিয়ে বাড়ী ঢুকতেই জহুরের গর্জন শুনতে পেল, মার দিয়া কেল্লা।

মরিয়মের চোখের সামনে সেই পুরনো পেট্রোম্যাক্সটা তুলে ধরল জহুর, আপা, এমন আবিষ্কার তোমার নিউটনও করতে পারেনি।

কেন, কী করেছ।

আমার কৌশলটা নিলে পেট্রোম্যাক্সে অল্প তেল লাগবে, অথচ বেশী আলো হবে।

তাই নাকি। তুমি দেখছি সবাইকে বেশী আলো দিতে চাও।

পেট্রোম্যাক্সটা নামিয়ে রেখে জহুর হতাশ স্বরে বলল, কিন্তু কোনো শালাই এর জন্য টাকা দেবে না। হয়ত দু'চারটে দিয়েই ভাগিয়ে দেবে।

ড্রাইভার মতিউর, ক্লিনার তোহা এবং আজিমুদ্দী বসেছিল ঘরে, তাদের দিকে মরিয়মের নজর পড়েনি এতক্ষণ। সে মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। এরা সবাই নতুন। মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, মতিউর ভাই আপনার না আজ ডিউটি ছিল।

মতিউর জবাব দিল, সকাল থেকেই যে আজ গাড়ী বন্ধ। কয়লা নেই। ভারত থেকে নাকি দিচ্ছে না। মেল ট্রেন পর্যন্ত বন্ধ। সব কলাপস মেরে আসছে। আর শালা যত দোষ আমাদের।

তোহা হাত নেড়ে বলল, অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আসছে। সেই আশাতেই থাকো! ভারত আর পাকিস্তানের লড়াইতে মানুষের দুর্ভোগের একশেষ। কিন্তু বলবে কে সে কথা!

আজিমুদ্দীর মুখে ঘন চাপ দাড়ি, একটু হাত বুলিয়ে নিল, শোনো, আমি গিয়েছিলাম দেশে! একমণ সুপারী বিক্রি ক'রে এলাম পঁচিশ টাকায়, আর ভারতে একসের সুপারীর দাম কত জানো, পাঁচ টাকা! একখানা কাপড় ওখানে চারটাকায়, এখানে কিনতে যাও বারো চৌদ্দ টাকা হেঁকে বসবে। গরীব কী ক'রে বাঁচবে বলো! ব্যাটারা দেশটাকে জাহান্নমে না পাঠিয়ে ছাড়বে না! আর নুনের দাম যে আরো কত বাড়বে কে জানে। এই অভাবে মানুষ বাঁচবে কি ক'রে?

মতিউর জুতো শুদ্ধ একটা পা উঁচু করল, এই দেখো আমার জুতোর

হাল! শালা ইঞ্জিনের গরমে পায়ে ফোস্কা পড়ে যাওয়ার জোগাড়। তিন দিন জুতো কিনতে গিয়ে ফিরে এলাম। তারপর মেল ট্রেণের রব্বানীর কাছে কিনতে দিলাম এক জোড়া।

মরিয়ম কাগজের বোঝা নামিয়ে রেখে বলল, এই নিন, ছুটী যখন তখন বসে বসে কাজ করুন। ভালো ভালো ক'রে লিখুন দেখি!

আজিমুদ্দী জিজ্ঞাসা করল, কিসের উপর লিখা হবে?

মরিয়ম হাসল, তা' আমি কি করে বলব! আপনারাই তো কত কথা বলছেন! সেই সবই লিখুন না!

জহুর এগিয়ে এল, আজিমুদ্দী ভাই, আমি বলছি লেখ, মতিউর রহমানের একজোড়া জুতো চাই!

আজিমুদ্দী মাথা নাড়ল, না জহুর ঠাট্টা রাখ, ভারতের সংগে আমাদের ভালো বাণিজ্য চাই!

জহুর খোঁচা দিল, সব তাতেই তুমি গম্ভীর! আমি বলছি লেখ, আজিমুদ্দী ভাইয়ের সুপুরীর দাম চাই একশ' টাকা, আর তার দাড়ি কামানোর জন্য চাই সস্তা ব্লেড!

তোহা আজিমুদ্দীর দাড়িতে হাত দিয়ে বলল, পুলিশে তাড়া করলে তোমার দাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকব! আচ্ছা, বৌ কিছু বলে না তোমাকে? সত্যি করে বলো!

মরিয়ম মুখ ফিরিয়ে হাসি লুকোল। তারপর তরকারীর থালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। খুশী এখনো ওদের সামনে বের হয় না, মরিয়মের কাছে এগিয়ে এসে অভিযোগ করল, দেখছ আপা, আমার ঘরখানা তোমাদের ইউনিয়ন অফিস বানিয়ে ছাড়ল, আমি এখন কোথায় যাই?

মরিয়ম হেসে উঠল, কেন ওটা তো জহুরের ফ্যাক্টরী! যন্ত্রপাতির জ্বালায় অস্থির। এত অগোছালো ক'রে রাখে, তুমি সহ্য কর কী ক'রে!

খুশী হাসিতে যোগ না দিয়ে বলল, জানো আপা কাল থেকে বিড়ির পাতাও আসেনি, সুখাও ফুরিয়ে গেছে।

কেন বল তো!

ওকে বললে বলে আর বিড়ি বানাতে হবে না, ফয়দা নেই।। কিন্তু এভাবে চলবে কি ক'রে আমি ভেবে পাইনে।

মতিউর ভাই তো সেদিন বলছিল, ওয়েল্ডিং সপে খোঁজ করলে নাকি চাকরী পাওয়া যায়। জহুরকে একটু খোঁজ নিতে বল না!

খুশী জবাব দিল, রোজই তো ফিরে এসে বলে কিছু পাওয়া গেল না। আর তুমি ওর মাথায় যা ঢুকিয়ে দিয়েছ, এখন সংসারের দিকে একদম ওর নজর নেই।

মরিয়ম একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু না পেলে কী করবে!

সকলে পায়, ও পায় না কেন?

সকলে তো পায় না খুশী!

চেষ্টা করলেই পায়! আসলে আমার দিকে ও ফিরেও তাকায় না, আছে সুধু নিজের হুজুগ নিয়ে, তা সংসার দেখবে কি।

খুশী উঠে চলে গেল।

মণি আর কলি কয়লার ঝুড়ি নিয়ে ঢুকল। একটা পাখা এনে মরিয়ম ওদের বাতাস করতে লাগল স্তব্ধ মুখে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পোস্টার লাগানোর আটা বানিয়ে রেখে যাওয়া সত্বেও ঘর থেকে বের হ'ল না জহুর। কোত্থেকে খানিকটা কাঠ জোগাড় করে এনে চেয়ারের পায়া তৈরী করতে বসেছে।

মরিয়ম রাত্রে ফিরে দেখল, একটা পোস্টারও পড়েনি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই জহুর ফেটে পড়ল, নিজে খেতে পাই না, পরের কাজ করতে পারব না! উপোষ করে কেউ কাজ করতে পারে?

কিছুক্ষণ কথা জোগাল না মরিয়মের মুখে, শেষে জিজ্ঞাসা করল, বিড়ির দামগুলো আদায় করতে পারো না কেন?

না দিলে আমি কি করব? মারামারি করব দোকানদারের সঙ্গে?

তোমাকে মারামারি করতে তো কেউ বলে নি! আসলে তুমি আদায় করতে জানো না।

বেশ তুমি তো জান, তুমিই চলো আমার সঙ্গে। দেখবে কত ধানে কত চাল।

মরিয়ম বলল, এত রাত্রিতে যেতে বলছ! তোমার মাথা খারাপ!

কেন, এখনই তো সময়। দোকান বন্ধের আগেই ওরা হিসেব নিকেশ করে।

অগত্যা মরিয়ম বেরিয়ে পড়ল জহুরের সঙ্গে। একটাও সদর রাস্তার দিকে গেল না জহুর। যেখানে আলো প্রায় নেই, যেখানে গলির সংকীর্ণতা এবং দুর্গন্ধ পাল্লা দিয়ে চলেছে পরস্পরের সঙ্গে, সেই সব জায়গা দিয়ে হেঁটে জহুর একটা দোকানের সামনে দাঁড় করালো মরিয়মকে।

দড়িতে ঝুলছে একটা কালিপড়া লণ্ঠন। তারি অস্পষ্ট আলোয় চোখে পড়ে কয়েকখান মলিন ক্যালেন্ডারের ছবি। আর চোখে পড়ে দুখানা ফ্রেমে বাঁধানো নীতিবাক্য। একটিতে লেখা—আজ নগদ কাল ধার। অন্যটাতে—বিশ্ব যদি চলে যায় কান্দিতে কান্দিতে, আমি একা বসে রব উদ্দেশ্য সাধিতে।

মরিয়ম গলায় জোর এনে জিজ্ঞাসা করল, বাকী শোধ না করলে একটা মানুষ কি খেয়ে থাকবে শুনি?

বুড়ো দোকানদার হ্যারিকেনটা মুখের পাশ থেকে সরিয়ে ঝাপসা দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করতে চেষ্টা করল, এ আবার কে জহুর?

জহুর জবাব দিল, আমার বোন। অন্তত অর্ধেক টাকাটা দিয়ে দাও আব্বাস চাচা, খেয়ে বাঁচি!

আব্বাস বলল, কতবার তোমাকে বলেছি না, আমি না পেলে দেব কোত্থেকে। তাছাড়া তোমাকে আরো বলেছি আমার দোকানে চাই না তোমার বিড়ি, তবু খোসামোদ করে রেখে গেছ।

মরিয়ম প্রশ্ন করল, বিক্রি যখন হয়েছে তখন দাম দেবে না কেন?

সাদা দাড়ির মধ্য থেকে আব্বাসের ফোকলা হাসি দেখা দিল, মা, তুমি ভাইয়ের হয়ে ঝগড়া করতে এসেছ দেখছি। আচ্ছা তুমি তো বলছ বিক্রি হ'লে দাম দেবে না কেন, কিন্তু ঐ সব অন্ধকার গলির মধ্যে কারা বিড়ি কেনে তা কি তোমরা জানো না! যারা বাকীতে কেনে, তারাই এখানে আসে। কিন্তু মাস গেলেও পয়সা দিতে পারে না। লোককেই বা কি বলব, পয়সাও যেন মানুষের হাত থেকে উড়ে গেছে একেবারে। আর পয়সাই যদি থাকবে তা'হলে তারা তো ভালো দোকানের বিড়িই কিনত, এখানে আসবে কেন?

মরিয়ম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন এ দোকানের বিড়ি ভালো নয়! খারাপ বিড়ি রাখেন কেন!

আব্বাস হাসল আবার, রাখি কেন? মা, তুমি জহুরকেই সে কথা জিজ্ঞাসা করো না কেন। বিড়ির পাতা আর সুখা ওকে ধারে কিনতে হয় বলে সব চেয়ে ওঁচা মাল কিনে আনে, তার থেকে খাসা বিড়ি হয় কি করে! ওকেই বা দোষ দেব কি, আজকাল বিড়ির মশলার যেন আগুনের দাম, তাও মাঝে মাঝে মেলে না! ভারত থেকে বেশী না আসার জন্যই এ রকম! ভালো সুখা কিনে ভালো বিড়ি যারা বানায় তারা বড় রাস্তার দোকানে দিয়ে আসে! আমি যা পাই রাখি, কি করব!

মরিয়ম একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। জহুরকে ধারে কিনতে হয় বলে ভালো মশলা পায় না, পায় না বলেই ভালো বিড়ি হয় না। হয় না বলেই জৌলুশওয়ালা দোকানে সে বিড়ি দিতে পারে না, আর পারে না বলেই নগদ দাম পায় না!

মরিয়ম আবার তাকাল ফ্রেমে বাঁধানো নীতি বাক্যের দিকে, ধারে এই বুড়ো আব্বাস ডুবে আছে, তবু আজ নগদ কাল ধার! আর, বিশ্ব যদি চলে যায় কান্দিতে কান্দিতে, আমি একা বসে রব উদ্দেশ্য সাধিতে—ওতো বড়লোকের কথা, গরীবের দিকে ভ্রুক্ষেপেও না চেয়ে দেখার সংকল্প, ওটা কেন নিঃস্ব আব্বাস টাঙিয়ে রেখেছে! আনিস সত্যি বলত, বড়লোকের আদর্শ গরীব গ্রহণ করে বলেই বড়লোকের রাজত্ব চলে!

বিনা বাক্যব্যয়ে মরিয়ম হাঁটতে সুরু করল বাড়ীর দিকে। পথ ভালো দেখা যায় না বলে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে। জহুর নীরবতা ভংগ করে জিজ্ঞাসা করল, আর কোনো দোকানে যাবে না?

না।

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। জহুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, গোটাকয়েক টাকা পাওয়া গেলে একটা ভালো কারবার করা যেত।

কী কারবার?

কিছু কাঠ আর সামান্য লোহা কিনতে পারলে আমি তুরপুন বানাতাম। আর বানাতাম রুটি তৈরীর বেলুন।

কে কিনত তোমার তুরপুন আর বেলুন?

কেন, এখানে কাঠের কাজ তো কম হচ্ছে না, তুরপুন বিক্রির ভাবনা কি। আর বেলুনের দাম বাজারে কি, তুমি জানো না! যত ব্যাটা রুটি

খোর পশ্চিমা এসেছে, বেলুনের চাহিদা! দেবে গোটা কয়েক টাকা জোগাড় করে?

ভালো লোক ঠাওরেছ, আমি টাকা পাব কোথায়? মতিউর ভাই, আজিমুদ্দী ওদের কাছে চাও না কেন?

চাইতে বাকী আছে নাকি? কত ধার হয়ে গেছে তুমি জানো! আচ্ছা, মাষ্টার সাহেবের কাছে তুমি তো ধার করতে পারো।

মরিয়ম ভেবে বলল, দেখো মানু মিঞার কাছে আমি টাকা পাই। আমার সিংগার মেসিন নিয়ে একটা পয়সা আজো দেয় নি। দেখা হলেই দেব দেব করে। আমি জোর ক'রে চাইতে পারিনে, তুমি দেখ না একবার চেষ্টা করে!

আচ্ছা কাল একবার যাব।

তারপর দু'জনেই চুপচাপ হাঁটতে লাগল। সমস্ত অবস্থা জেনেও জহুর যে মরিয়মের প্রতি এই নির্ভরতার ভাব দেখিয়েছে তাতে খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এসব কথা তুমি এতদিন এমন করে বল নি কেন?

জহুর কোনোই উত্তর দিল না।

মরিয়ম আবার প্রশ্ন করল, কী কথা বলছ না কেন?

কী বলব, অনেক কথাই তো বলা হয় না, হবেও না, বলবও না।

বিস্মিত মরিয়মের মুখ দিয়ে বেরুল, তার মানে?

একটা দোকানের আলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল দু'জন। মরিয়মের চোখের উপর দৃষ্টি ফেলে জহুর বলল, তার কোনো মানে নেই, মানে হয়ও না!

মুহূর্তের মধ্যেই জহুর চোখ নত করল। কিন্তু মরিয়মের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। চোখের এ ভাষার কী অর্থ তা তো তার অজানা নয়।

মরিয়ম আর একটি কথা বলল না জহুরের সঙ্গে। দু'জন একসঙ্গে বাড়ী ফিরল। ঘরে এসে দেখল মণি আর কলি ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাতের থালা টেনে নিয়ে মুখে দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠেলে রেখে দিল। কেমন বিস্বাদ লাগছে সব কিছু! এ সংসারে কিছুই কি ভালো থাকবে না? বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে ভাবতে লাগল। তার মনে পড়ল খুশীর দুপুর বেলার কথাগুলো। সে কথার একটা তাৎপর্য

ফুটে উঠল এখন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল মরিয়মের। অথচ কিছুতেই কান্না আসছে না। আবার কান্না যখন এল তখন বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত আর থামতে চায় না। কেন তার মনে ঘৃণা হল না জহুরের প্রতি? অথচ ইসরাইলকে তার অসহ্য মনে হয়েছিল, বিজাতীয় ক্রোধও জন্মেছিল। কিন্তু জহুরের প্রতি তেমন মনোভাব হচ্ছে না কেন? এ কেনর উত্তর সে কেন খুঁজে পাচ্ছে না কিছুতেই? শুধু মাথার উপর একটা অসম্ভব চাপ দিয়ে উত্তর বের করার চেষ্টায় মাথা যেন ফেটে যেতে লাগল। শেষে ঘণ্টা খানেক অশ্রুবিসর্জনের পর ক্লান্ত হয়ে যখন সে শূন্য মস্তিষ্কে অসাড় হয়ে পড়ে রইল তখন আস্তে আস্তে একটা চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হল ধীর গতিতে। বিগত দিনের নির্মম ঘটনাগুলি একে একে ছায়াছবির মত উদয় হল চোখের সামনে। এই নিষ্ঠুর অবস্থার মধ্যে যদি কোন অকৃত্রিম মমতা দিয়ে কাউকে সত্যি সত্যি সাহায্য করে, বাড়ীতে স্থান দেয়, নিজেও অতি দারিদ্রের মধ্যে থাকে, আর তারপর সেই ব্যক্তির মনে যদি ভালবাসা কিম্বা ভাললাগার অঙ্কুর দেখা দেয় এবং দেখা দিলেও লুকাতে চায় সঙ্গোপনে, তা'হলে তার প্রতি রাগ করা কি খুবই সহজ! কিন্তু আনিসের প্রতি কেন ঐ জহুরের গভীর শ্রদ্ধা নেই। হয়ত কিছু আছে, কিন্তু যতটা থাকলে হৃদয়বৃত্তির ধারাই অন্য খাতে বয়ে যায় ততটা নেই। শুধু আনিসকে নয়, মানুষ ও আদর্শকে পুরো শ্রদ্ধা করতে এখনও শেখে নি। ওরও দোষ নেই, সে রকম সুযোগও পায় নি। কিন্তু দোষ কার? জানি না দোষ কার, শুধু জানি আমার কাছে আনিস নেই! নেই বলেই এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেন আনিস আমার কাছে নেই? লীগ সরকার তাকে কেড়ে নিয়েছে বলে। হায়রে, এই সরকারের নিষ্ঠুরতার মোটা কাহিনীটাই শুধু উপর থেকে দেখা যায়, মনের গভীরে অপ্রত্যাশিত মোচড় দিয়ে সে কত বর্বরতার ছাপই না রেখে যায়। এই আঘাতের কেউ তো কোনদিন প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে পারবে না।

এই সব ভেবে মনে যতই সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করুক না কেন মরিয়মের মনে হতে লাগল, আমি অশুচি হয়ে গেছি। আনিস তুমি আমার কাছে এস। তোমাকে ছাড়া আমি আর বাঁচব না।

ভোর রাত্রির দিকে ঘুমিয়ে পড়ল মরিয়ম।

কিন্তু ঘুমের সুযোগ বেশীক্ষণ জুটল না তার। অতি ভোরে একদল পুলিশ এসে জহুরের বাসা ঘেরাও করে ঘরে ঢুকে জিনিস-পত্র বাইরে ফেলে দিতে লাগল টেনে টেনে। কাচের গ্লাস, প্লেট, চায়ের কাপ্ ভেঙেগ গেল, টিনের সুটকেশটা দুমড়ে রইল, চৌকি দু'টো কাৎ হয়ে পড়ল, বিছানাপত্র ধুলায় গড়াগড়ি গেল। জহুর চিৎকার করতে লাগল, প্রাণ গেলেও আমার ঘর আমি ছাড়ব না।

দারোগা টিটকারী দিল, তোমার চাকরী আছে যে তোমার ঘর! রেলের কোয়ার্টারে থাকে তারাই যারা রেলে চাকরী করে। আর আমাদের কী দায় বলো, এ সব কী আমাদেরই ভালো লাগে?

তোমরা ঘুষ খেয়েছ!

খেয়েছি বেশ করেছি, তাতে তোমার কি হে! তোমায় খেদিয়ে আমার বুঝি খুব আনন্দ লাগছে না?

রেলের লোকজন এসে জড় হল অনেকে, কিন্তু সন্ত্রস্ত সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যে সরে পড়ল তারা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নীচু করে তালেবুল্লা নামক রেলের আর একজন মেকানিক ঢুকে পড়ল ঘরে।

দারোগা জহুরকে ডেকে বলল, সাবধান গোলমাল করলে জেলে গিয়ে পচতে হবে, তখন আমাদের দোষ দিয়ো না।

মরিয়ম ছেলেমেয়ের হাত ধরে রাস্তার পাশে খুশীকে নিয়ে বসেছিল, জহুর এসে বলল, দেখলে তো, আমার চোখের সামনে দিয়ে তালেবুল্লা গিয়ে আমারই ঘরে ঢুকল। আর এদের জন্যই তুমি আমাকে কাজ করতে বল! আর ঐ যে একদল লোক এসেছিল, তারাও কেমন সরে পড়ল! একটু রুখে দাঁড়ালে পুলিশ সাহস করত কখনো? আর যেই হোক আমি এই অমানুষদের জন্য কিছু করতে পারব না।

মরিয়ম ধীর স্বরে বলল, এত অধৈর্য হলে কি চলে, ক'জন আমরা মানুষ হতে পেরেছি, অমানুষদের মানুষ করাই তো আমাদের কাজ।

তোমার ধৈর্য থাকে, তুমি করো! আমি এখানেই ইস্তফা দিলাম।

মালপত্র নিয়ে আপাতত সবাই উঠল মতিউরের বাড়ীতে। তার-পরেই প্রশ্ন এল কে কোথায় যাবে। জহুর বলল, আমি খুশীকে দেশে

রেখে আসব। কিন্তু আমি এ জায়গা থেকে নড়ছি নে!

খুশী বলে বসল, তা'হলে আমিও যাব না!

খাবে কি? থাকবে কোথায়?

তোমার যে ভাবে চলে আমারও সেই ভাবে চলবে।

জহুর রেগে গেল, ঐ সব কথা ছাড়, তোমাকে কালই দেশে রেখে আসব। আমি আর চালাতে পারছি না।

খুশী জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু মরিয়ম আপা কী ভাবে চালাচ্ছে শুনি!

মরিয়ম সায় দিল, সেই ভালো, এক রকম চলে যাবেই।

জহুর বলে বসল, তা'বলে আমি বেঁচে থাকতে বৌকে ঝিগিরি করতে দিতে পারব না। আমি মরে গেলে ও যা ইচ্ছে তাই যেন করে।

এক নিমেষে মরিয়মের মুখের রক্ত যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। এত সহজে যে এত বড় অপমান জহুর তাকে করতে পারে এ সে স্বপ্নেও ভাবেনি। কত লোকই তো তাকে ঝি বলে ডাকে, কিন্তু জহুর আজ যখন নিজের বৌয়ের মর্যাদার সংগে তাকে তুলনা করে নীচে নামিয়ে দিল, তখন তার চোখ ভরে এল অশ্রুতে। আর সব চেয়ে ব্যথা বাজল এই জন্য যে, জহুর সব কষ্টই সহ্য করেছে তারই মত এতদিন, মায়া-মমতাও দেখিয়েছে, মনের মধ্যে হয়ত খানিক আবেগও পুষে রেখেছে, অন্যের জন্য স্বার্থও কিছু ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সম্মান দিতে ভুলে যায়। অথচ মরিয়মের মনে এতদ্‌সত্ত্বেও জহুরের প্রতি রাগ হচ্ছে না! মানুষের কোন দুর্বলতাতেই তার মনে যেন আজকাল সহজে রাগ আসে না। শুধু মনে দুঃখ হয়, ব্যথা লাগে, কিন্তু ক্ষমা করতেও ইচ্ছে করে। যত দেখছে যত শুনছে ততই যেন এই প্রবৃত্তিটা বেড়ে উঠছে তার নিজের অজান্তে।

চোখ মুছে মরিয়ম বলল, দেখ ভাই, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো! আর এ কথা তো সত্যি, সহজে যেন কাউকে ঝিগিরি করতে না হয়।

জহুর কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল, ছিঃ ছিঃ কথাটা যে আমার মুখ দিয়ে কী করে বেরিয়ে গেল। আমার নিজের উপরই ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। কিন্তু তোমাকে ব্যথা দেওয়ার জন্য আমি ও-কথা বলিনি, বিশ্বাস করো।

খুশী মরিয়মকে জড়িয়ে ধরল, আপা, তুমি রাগ করো না!

রাগ করব কেন, আমাদের যে রাগ করতে নেই!

জহুর বলল, কিন্তু যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই, তোমরা যতই কাজ করার চেষ্টা করো না কেন, কিছুই করতে পারবে না। মানুষের কেউ কোনদিন ভালো করতে পারেনি, তোমরাও পারবে না। যে পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে খায়, সে চিরকালই তাই খাবে। বাধা দিতে গেলে মরবে তোমরা, কিন্তু ফল কিছুই হবে না!

মরিয়ম কিছু বলার আগেই জহুর বেরিয়ে গেল রাস্তায়। তারপর কিছু না বলেই খুশীকে নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় রওনা দিল দেশের দিকে।

১৯

রান্না শেষ করে মাজেদাকে পথ্য দিয়ে মরিয়ম যখন বেরিয়ে আসছিল সেই সময় নূর মহম্মদ কাশির দমকে প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ বাতাস দেওয়ার পর একটু সুস্থ হলে মরিয়ম বলল, আজ না হয় কাজে নাই গেলেন। একটু চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

সে নসিব নিয়ে আসিনি, চাকরী গেলে খাব কি!

তাই বলে এই অবস্থায় কেউ অফিসে যেতে পারে?

পারতেই হবে। যতক্ষণ ঐ ডি-এম-ও আছে ততক্ষণ ঘুষ ছাড়া ছুটী মিলবে না। আর ঘুষের টাকা আমি পাব কোথায়?

তবু মরিয়মকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নূর মহম্মদ বলল, যাও বহিন। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার মত বহিন একটা যদি আমার কাছে থাকত, প্রাণটা জুড়াতো।

স্নেহের কথা শুনে মরিয়ম জানাল, আমাদের তো বাড়ী ছাড়া করেছে আজ। প্রায় পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছে।

নূর মহম্মদ সব কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আমার যদি একটা ঘর থাকত, তোমাকে ডাকতাম।

মরিয়ম বলল, আপনি যদি এই বারান্দায় থাকতে দেন, তাও থাকতে পারি।

খানিক আগেও মরিয়ম এমন কথা চিন্তা করেনি, ভেবে রেখেছিল বজলুস সাত্তারকে বলে দেখবে সেখানে একটু ঠাঁই মেলে কিনা। কিন্তু

এখন নূর মহম্মদের আন্তরিকতায় তার মুখ দিয়ে বেরুল অন্য কথা।

নূর মহম্মদ বিস্মিত হয়ে বলল, সে কী, ঐ খোলা জায়গায় কখনো মানুষ থাকতে পারে। তাতে আবার বর্ষাকাল! না, সে হয় না।

আমার যা অবস্থা তাতে মাথা গুঁজতে পেলেই বাঁচি।

বেশ, যদি তাই চাও, তুমি চলে এসো, কিন্তু দেখো আমাকে দোষ দিয়ো না পরে।

নূর মহম্মদের আশঙ্কা দেখে এত দুঃখের মধ্যে মরিয়ম না হেসে থাকতে পারল না, দেখুন ভাইয়া, আপনি সারা জীবন রানিং সেডের মধ্যে থেকে এসেছেন কী করে? অবস্থার গতিকেই তো।

আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার হয়ে এসেছে।

মরিয়ম চলে গেলে মাজেদা বেঁকে বসল, আমি ঐ বাঙ্গালী মাগীটাকে থাকতে দিতে পারব না। তোমার আক্কেল কী রকম তাই ভাবি, এই পায়রার খোপের মধ্যে দু'টো বাচ্চা নিয়ে ও যদি আসে তা'হলে নড়ার জায়গা থাকবে কিনা শুনি?

নূর মহম্মদ রাগ করে সময়ের আগেই কাজে বেরুল এবং যেতে যেতে বলে গেল, কথা আমি ফেরত নিতে পারব না।

সেইদিন রাত্রে নূর মহম্মদের দাওয়ার উপর ছেলেমেয়ে নিয়ে মরিয়মের কেবল তন্দ্রা মত এসেছে, সেই সময় বৃষ্টি নেমে এল যেন প্রতিশোধের মত। পানির ছাঁট এসে সব ভিজিয়ে দিয়ে গেল। নূর মহম্মদ ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে ডাকল, তোমরা সব ভিতরে এস।

কিন্তু মাজেদা মেয়েকে হুকুম করল, আছিয়া দে তো দরজাটা বন্ধ করে। আমি তখনি বলেছিলাম জঞ্জাল এনো না বাড়ীতে।

নূর মহম্মদ না বলে থাকতে পারল না, তুমি কি মানুষ, না আর কিছু। একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা, সাবুর ঘরের চাবিটা দাও।

মাজেদার কাছে চাবি থাকা সত্বেও সে জবাব দিল, সাবু তো চাবি দিয়ে বেরিয়েছে, তার কাছেই চাবি।

মরিয়ম নূর মহম্মদকে উদ্দেশ করে বলল, আপনি ব্যস্ত হবেন না, বৃষ্টি থেমে গেল বলে।

সত্যিই একটু পরে বৃষ্টি থেমে গেল। কিন্তু মনি এবং কলি

দু'জনেই কাঁপতে কাঁপতে বলল, মা খুব শীত লাগছে।

ঘুমোও, ঘুমোলেই শীত চলে যাবে।

মনি অনুযোগ করল, এই শীতের মধ্যে ঘুম আসছে না যে।

তবু দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে।

আকাশ পাতাল কত কি ভাবতে সুরু করেছিল মরিয়ম। এতদিনেও আনিস কেন আর চিঠি দিল না। অসুখ বিসুখ করেনি তো! তা'হলেও তো মানুষকে জানাতে হয়। একা একা এই ভাবে মরিয়ম কতদিন বাঁচবে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সারা দেশে ওরা কি একটাও লোক খুঁজে পায় না। অথচ যোগাযোগ না হলে কী করে কী হবে। তোহা, মতিউর, আজিমুদ্দীর মত কত নতুন লোক এসেছে, কিন্তু বাইরের সংযোগ ছাড়া এদের দিয়ে কী কাজ করানো যাবে, তাতে ওরা ক'দিন টি'কে থাকবে? জহুর ছিল, সেও চলে গেছে দেশে, তার ঘরখানা ছিল তাও আর নেই, ওরা যে পাঁচজন একসঙ্গে বসে কথা বলবে তারও জায়গার অভাব।

হঠাৎ কলি চিৎকার করে উঠল, উঃ মা-গো!

এখানে কারা কুত্তার পাল শুয়ে আছে! সাবুর কণ্ঠ শোনা গেল। সিনেমা ফেরত সাবু অন্ধকারে কলির গায়ের উপর পা তুলে দিয়েছে।

ও রে মা, আমাকে মেরে ফেলেছে রে, বলে কাঁদতে লাগল কলি।

কুত্তার পালকে বাড়ী থেকে দূর করে দিতে হবে। দেখ সব কী ভাবে শুয়ে আছে—সাবু যেন গর্জাতে লাগল, মরার আর জায়গা পায় না, এই বাঙ্গালী মাগী বহুত হারামী আছে!

নূর মহম্মদ ওদের বারান্দায় রেখে ঘুমুতে পারেনি, সব কথাই তার কানে যাচ্ছিল। হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সে ছেলের গালে বসিয়ে দিল এক চড়, চুপ রহো হারামজাদা।

সাবুর সিনেমার নেশা সম্পূর্ণরূপে ছুটে গেল। এই অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে নির্বিবাদে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। বেয়াদবির জন্য মাঝে মাঝে বাপের কাছে তার এই রকম চড়চাপড় খাওয়া অভ্যাস ছিল, তেমনি অভ্যাস ছিল মুখে প্রতিবাদ করলেও মার হজম করার।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে আস্ফালন করতে লাগল, কাল আমি যদি ঐগুলোকে না তাড়াই, নাম ফিরিয়ে নাম রাখব।

এই ঘটনার পরে নূর মহম্মদের কাশির বেগ আবার বেড়ে গেল, মরিয়মকে পাখা এনে বাতাস করতে বসতে হল। নূর মহম্মদের সমস্ত শরীরটা কাঁপছে থর থর করে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কাল আমি ডি-এম-ওর কাছে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ব না।

পরদিন সকালে উঠে মরিয়া হয়ে নূর মহম্মদ জালাল আহম্মদের বাসার দিকে রওয়ানা দিল। সে যে ভিতরে ভিতরে কতখানি অধৈর্য হয়ে উঠছিল তা নিজেও হয়ত জানত না।। মাজেদা তাকে সুখী করতে পারেনি। ছাত্রাবস্থায় এক আত্মীয়ের মেয়ের প্রেমে পড়েছিল সে, বিয়েটা যখন পাকাপাকি হয়ে আসে তখন হঠাৎ নূর মহম্মদের বাপ মারা গেল, তারপর থেকেই উলোটপালট হয়ে গেল তার জীবন। পাওনাদারের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল সহরের পাকা বাড়ী এবং গ্রামের জমিজমা। ছেলের বাপের ঋণের বোঝা মেয়ের বাপের চেতনাকে এমন আঘাত দিল যে, নূর মহম্মদের কাকুতিমিনতিতে কান দিতে পারলেন না, মেয়েকে তুলে দিলেন এক চামড়াব্যবসায়ীর হাতে। উদাস মনে নূর মহম্মদ কাল কাটাতে লাগল। আশা ছিল প্রেমিকার এক সময় মনোবেদনা জাগবে। রেলের চাকরী পেল, বহু ট্রান্সফার ঘটে গেল, কিন্তু অন্যপক্ষ থেকে সাড়া শব্দ এল না। বন্ধুরা তাকে রোমান্টিক বলে ঠাট্টাও করত, ভালোও বাসত। বিয়ের বয়স যখন পার হয়ে যায় যায়, তখন একদিন মাজেদাকে ঘরে এনে বাস্তব জীবনবোধের হিসাব নিকাশ করতে বসল নূর মহম্মদ। কিন্তু খারাপ মেজাজ এবং স্বাস্থ্যহীনতা মাজেদার দেহে মনে ফুটে বেরুতে লাগল এক সঙ্গে। ছেলে সাবু, বাপের বিনা আদরে কুসঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগল। আছিয়া বাপকে ভালবাসতো, কিন্তু বাংলাদেশে এসে বছরখানেক ওয়াগনবাসের পর তারও স্বাস্থ্য গেল ভেঙ্গে, পড়া-শোনাও হল বন্ধ, মায়ের মতই হল খিটখিটে। এই অবস্থায় এক সময়ের রোমান্টিক নূর মহম্মদ অসাধু উপায়ে টাকা রোজগারের কথাও ভেবেছে। সে পথেও তার না ছিল জ্ঞান, না ছিল ক্ষমতা। রেলের যে সব জায়গায় ঘুষের খুদকুড়ো মেলে, সেখানে যাওয়ার সুযোগ ছিল না,

তদাবিরেরও লোক ছিল না। আমি কোনো কাজেরই নই, এমন একটা ধারণার ফলে ক্রমে নিজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিল নূর মহম্মদ। ঘরে বাইরে দেহ মনে কোথাও সান্ত্বনার জায়গা ছিল না। সামনে পিছনে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে কেবল যেন ধোঁয়ার কুন্ডলী।

নূর মহম্মদ আবার সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়াকীর্ণ পথে প্রবেশ করল জালাল আহম্মদের বাড়ী। রুগীর অন্ত নেই, ঘরের বাইরে এবং ভিতরে ভীড় করেছে তারা। সৌভাগ্যক্রমে একজন কম্পাউন্ডার নূর মহম্মদকে চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করল, আপ আচ্ছা হ্যায় তো আভি?

আর আচ্ছা হ্যায়! কবরে যেতে পারলে বাঁচি! একটু বিষ দিতে পারবেন আমাকে?

কেন রাগ করছেন? এখানকার নিয়ম তো আপনার জানা আছে।

তা আছে! কিন্তু আপনি আমার জন্য একটু বলবেন দয়া করে?

ক্ষেপেছেন! মারা পড়ব না।

কিন্তু ঘুষ দিতে না পারলে কি একটা লোক বাঁচবে না?

কম্পাউন্ডার হাসল, সব জেনেও কেন আপনি এ-রকম করেন!

নূর মহম্মদ একটু ইতস্তত করল, শেষে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আপনিও চোর! চোর নন, বাটপাড়!

কম্পাউন্ডার প্রথমে ভ্রূকুঁচকে তারপর হেসে ফেলল, দেখুন, দুনিয়া শুদ্ধ সবাই চোর। কেউ চুরি করার ইচ্ছে থাকলেও পারে না, কেউ পারে। কেউ কাজেকর্মে চোর, কেউ চোর মনে মনে। খারাপ হ'তে পারে না বলেই কেউ কেউ ভালো থাকে! সংসারের জ্বালা তো সকলেরই আছে। সুযোগ পেলে আপনিও চুরি করতে ছাড়তেন না!

লেকচার না শুনে নূর মহম্মদ সুইংডোর ঠেলে প্রবেশ করল ভিতরে।

জালাল আহম্মদ এক শায়িত রুগীর পাশ থেকে স'রে এসে বলল, একটু পরে। ও আপনি। আপনাকে না বারণ করেছি এখানে আসতে! আপনি ভালো আছেন, দেহের চেয়ে আপনার রোগ মনের।

আপনার বাড়ী না আদ্রায়?

হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে?

দেশের লোক কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি!

বেশ, হয়েছে তো জিজ্ঞাসা করা, এবার যেতে পারেন।

দেশের লোকের একটা কথা শুনবেন না হুজুর?

কী জ্বালা, কি চান আপনি?

আমি চাই রিভার্টেড হতে।

তার মানে!

তার মানে আমি চাই রিভার্ট।

কী বলছেন আপনি! সবাই চায় রিভার্ট বন্ধ করতে, আর আপনি চান রিভার্টেড হতে! আগেই বলেছি আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু যাই হোক, প্রোমোশন আর রিভার্সানের মালিক তো আমি নই। ডি-এম-ই'র কাছে যান।

নুর মহম্মদ বলল, অন্তত আমাকে এমন একটা সার্টিফিকেট দিন যাতে আমি অসুস্থতার জন্য বর্তমান কাজের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হ'তে পারি, যাতে নীচের কোনো একটা পোস্টে নামিয়ে দেয় আমাকে, ফুসফুসে একটু হাওয়া খেয়ে বাঁচি।

ও সব আবোল তাবোল শোনার আমার অবসর নেই! সার্টিফিকেট আমি দিতে পারব না।

নিস্তেজ নুর মহম্মদ আস্তে আস্তে সুইংডোরটা ঠেলে বাইরে এল।

মেঘ কেটে গেছে আকাশে। আলোয় আলোময় পৃথিবী। কৃষ্ণচূড়া আর ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে ঝিরঝির করে বইছে হাওয়া। ঘুঘুর ডাক যেন ভেসে আসছে কোত্থেকে। কান পেতে নুর মহম্মদ কী যেন শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে, কিছুই ঢুকছে না তাতে, আর কপালের ঘামও শুকোচ্ছে না কিছুতেই। বাগানের খোয়াঢালা পথটা এসে পড়েছে পীচের রাস্তায়। সেটা চলে গেছে ইয়ার্ডের দিকে। কালো রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলল নুর মহম্মদ।

ইয়ার্ডের কাছে এসে থামল একবার। দম নিয়ে আবার এগুতে লাগল সামনে। একবার রানিং শেডের দিকে দৃষ্টি পড়তেই নামিয়ে নিল চোখ। সমস্ত শরীর কাঁপছে তার। বুঝতে পারছে উঠে আসছে একটা প্রচণ্ড কাশির দমক। আবার তাকাল সে ঐ ছাউনিটার দিকে। একটা ইঞ্জিন এগিয়ে আসছে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

হয়ত মাথাটা ঘুরে গিয়ে, হয়ত মনের আবেগে, হয়ত কাশির দমকে নূর মহম্মদ হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইঞ্জিনের সামনে। তাকে দু'ফাঁক করে দিয়ে বেরিয়ে গেল ইঞ্জিনটা।

মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ল, যেমন ছড়িয়ে পড়ে এ ধরনের খবর। রেলের লোক কাটা পড়েছে শুনে ছুটে এল অনেকে।

মরিয়ম বজলুস সাত্তারের বাড়ী থেকে ফিরছিল ভাত তরকারী নিয়ে। রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় লোকের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য দেখে একটু দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কী করে তার কানে এল নূর মহম্মদ মারা গেছে এ্যাক্সিডেন্টে। কিছুক্ষণ তার পা দু'টি অবশ হয়ে গেল। ভাবতেও পারছে না কিছু, অসাড় হয়ে গেছে চিন্তার ক্ষমতা। কখন যে সে চলতে সুরু করেছে, কখন যে সে এসে দাঁড়িয়েছে ভীড়ের মধ্যে কিছুই বুঝতে পারেনি। হঠাৎ তার হুঁশ হল একটা কথা শুনে, লাস কেন ওরা নিয়ে যাবে ?

তাকিয়ে দেখল তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আজিজ। ততক্ষণে স্টেশন প্রাঙ্গনে জড় হয়েছে প্রায় হাজার খানেক মানুষ। আর এসেছে পুলিশ, রেলের কর্তারা, জালাল আহম্মদ। লাস নিয়ে যেতে চায় ওরা।

আজিজ মরিয়মকে দেখে বলল, লাস আমরা মাটি দেব, দাফন কাফন আমরা করব, কিছুতেই ওদের নিয়ে যেতে দেব না!

কোথায় ছিল মানু মিঞা মরিয়মকে দেখে এগিয়ে এল, ভাবী, জানাজা পড়া দরকার, লাস নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলতে দেব না।

মতিউর, তোহা, আজিমুদ্দিন এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে মরিয়মকে। বহু-দিন পরে এরসাদও এসে উদয় হয়েছে, মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় তুমি ছিলে এতদিন ভাবী, আমাকে খবর পাঠাও নি কেন ?

মরিয়মের কোনো কথাই কানে যাচ্ছিল না। সে কাপড়ে ঢাকা লাসটার দিকে গেল এগিয়ে। ভীড়ের মধ্যে মানুষ পথ করে দিল তাকে, অনেকেই জানত সে নূর মহম্মদের বাড়ীতে থাকে। কাপড়টা তুলে মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে আবার ঢেকে দিল মুখটা। উঠে দাঁড়াল পাষাণ মূর্তির মত। আগে হলে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিত হয়ত, কিন্তু এখন শুধু বুকের মধ্যে জ্বালা করছে তার।

এমন সময় কোত্থেকে ছুটে এল সাবু। ঝুঁকে পড়ল বাপের মুখের উপর। তারপর হঠাৎ ভেঙেগ পড়ল কান্নায়, আব্বা! আব্বাজী! তুমি আমাকে আর চড় মারতে পারবে না আব্বা! আর তুমি গালাগালি দিতে পারবে না আব্বা!

এতক্ষণে নরম হয়ে এল মরিয়মের বুকের ভিতরটা। কথা বলার জন্য মনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করতে লাগল তীব্র একটা আবেগ। কী যেন বলতে চায় সে। চারপাশে ভীড় করেছে যারা তাদের মনেও প্রবেশ করিয়ে দিতে চায় সেই উত্তাপ। পুলিশ একটু পরেই নিয়ে যাবে ঐ লাস, আর মানুষ যে যার বাড়ী ফিরে যাবে নিরুত্তাপ মন নিয়ে। না, এ হ'তে পারে না!

কী একটা সম্মোহনের মধ্যে সে স্টেশনের একটা বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়ালো—ভাই সব, আমার একটা আরজি আছে!

সবাই যেন আশা করছিল কিছু একটা হোক! কিছু একটা হওয়া যেন উচিত। তারা ভীড় করে এসে দাঁড়াল চারপাশে। আনিসের বৌকে তারা চেনে, কিন্তু মরিয়ম যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়াবে এ তারা কল্পনাও করেনি।

কিন্তু মরিয়মের গলার স্বর থেমে গেছে। কিছুই মনে আসছে না তার। কী বলতে গিয়েছিল ভুলে গেছে। সম্মুখের জনতাকে এক ঘূর্ণায়মান বস্তুপিণ্ড বলে তার মনে হল। আজিজ পাশ থেকে জরা-জীর্ণ মুখখানা তুলে বলল, বোলো বেটী, জোরসে বোলো!

আজিজের দিকে একবার তাকিয়ে মরিয়মের সুতীক্ষ্ণ গলা ভেঙেগ পড়ল আর্তস্বরের মত—ভাইয়ো, রেলওয়াইকে মজদুর আদমী নেহি, কোরবানীকে জানোয়ার হ্যায়...ভাইয়ো, রেলওয়াইকে মজদুর আদমী নেহি, কোরবানীকে জানোয়ার হ্যায়...ভাইয়ো...

থেমে গেল মরিয়ম। আর কিছু বলতে পারল না সে। শুধু চোখ দিয়ে তার পানি পড়ছে নিজেরই অজান্তে। আঁচল দিয়ে যত মোছে ততই ব্যাকুল হলে ওঠে সে কান্না। আজ ভাইয়ের জন্য কাঁদছে বোন। বৃদ্ধ আজিজ থেকে সুরু করে অনেকের চোখেই উৎসারিত হয়েছে রুদ্ধ অশ্রুর বন্যা। এমন করে কাঁদতে তারা ভুলে গিয়েছিল বহুকাল।

জানোয়ার বলে তিরস্কৃত ক'রে মরিয়ম যেন তাদের মনের সুপ্ত বেদনা-প্লুত মানুষটাকে জাগিয়ে তুলেছে।

মরিয়মের পাশে বেঞ্চিতে লাফ দিয়ে উঠল আজিজ—ভাইসব, নুর মহম্মদ মরেনি। ঘুষের লোভে তাকে ছুটী না দিয়ে মেরে ফেলেছে জালাল আহম্মদ। ভাইসব, সাহেবদের পায়ে সালাম দেওয়া আমাদের বন্ধ করতে হবে। বল ভাই, দুনিয়ার মজুর এক হো!

মজুরের কণ্ঠস্বর বহুকাল পরে বেজে উঠল সর্বশক্তি নিয়ে। মরিয়ম নেমে পড়ল বেঞ্চি থেকে। গা দিয়ে তার দরদর করে ছুটছে ঘাম! কয়লার ঝুড়ি নিয়ে মানুষ ঠেলে কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল মনি আর কলি। মায়ের আঁচল টেনে কলি জিজ্ঞাসা করল, মা, ও মা, কে মরেছে মা?

ছেলেকে কোলে তুলে নিল মরিয়ম, আস্তে আস্তে বলল, না কেউ মরে নি, চল আমরা বাড়ী যাই!

বাড়ী যাওয়া মরিয়মের হ'ল না। কর্তৃপক্ষ রাজী হয়েছে লাসটাকে রেলের লোকদের হাতে দিতে। কিন্তু দাফন কাফনের খরচা তারা দিতে পারবে না, স্যাংশন নেই!

কিন্তু কিছুতেই আটকাল না। মুহূর্তের মধ্যে কোত্থেকে এল টাকা। আশপাশের দোকানদারেরা কিনে দিল আতর, গোলাপ, ফুল, বাতাসা।

গোরস্তানে যাওয়ার আগে মতিউর এগিয়ে এসে বলল, ভাবী, আমি ছেলেমেয়ে দু'টোকে আমার বাড়ী নিয়ে যাই, ওদের খাওয়াদাওয়া হয় নি।

বেশ তাই যাও!

কাটা লাসকে সেলাই করবে কে, গোছল করাবেই বা কে। কোনমতে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল গোরস্তানে। সন্ধ্যার মুখোমুখি সমাপ্ত হল মাটি দেওয়ার কাজ।

এরসাদ অবসন্ন মরিয়মকে বলল, ভাবী, তুমি আমার বাড়ী চলো, এখন তো আমি স্বাধীন!

কেন! কি হয়েছে!

আমি স্বাধীন হয়েছি! আমার আব্বা মারা গেছে যে! তা বোধহয় তুমি জান না!

কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তির জন্য এর চেয়ে বোধহয় ভালো পরিবেশ এরসাদের জানা ছিল না! এত দুঃখের মধ্যে মরিয়মের একবার ইচ্ছে হল এরসাদকে তিরষ্কার করে, কিন্তু চেপে গিয়ে শুধু জবাব দিল, ভাই তোমার বাড়ীতে আর একদিন যাবো। আজ নয়! নূর মহম্মদ ভাইয়ের বাড়ী তো এখন আমি ছাড়তে পারব না!

সাবুর সঙ্গে মরিয়ম যখন ঘরে ফিরল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। যেন ভুতুড়ে বাড়ী, একটা আলো জ্বালে নি কেউ। স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল অসুস্থ মাজেদা। মাকে ফেলে নড়তে পারছিল না আছিয়া। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিল মাজেদা।

মরিয়ম হ্যারিকেন লণ্ঠনটা খুঁজে এনে আলো জ্বালল। ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখল টেবিলের উপর। মাজেদা খাট থেকে হঠাৎ কী এক বিপুল শক্তিতে উঠে এসে জড়িয়ে ধরল মরিয়মকে। মাজেদার গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না, এতক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে কান্নার শক্তিও লোপ পেয়েছে তার। মরিয়মও কথা বলল না, সান্ত্বনা দেওয়ারও চেষ্টা করল না। শুধু হাত বুলাতে লাগল মাজেদার পিঠে।

বাঙালী মেয়ের বুকে মাথা রেখে গভীর শ্রান্তিতে মাজেদা চোখ বুজল।

২০

একদিন মরিয়ম লোকো শেডের গেটে দাঁড়াল আঁচল পেতে।

প্রথমে ইতস্তত ভাব ছিল। আজিজ তাকে বুঝিয়ে বলল, মা, তুমি তো নিজের জন্য সাহায্য চাইতে যাচ্ছ না! আমরাই সব করব, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে। দেখবে মানুষ সাহায্য করবে দুহাত দিয়ে।

আপত্তি করতে পারল না মরিয়ম। একদিন সে জহুরকে বলেছিল, যদি বলি আপনারা খাওয়াবেন চাঁদা তুলে, সে তো আপনাদের জন্যই জেলে গেছে। জহুর উত্তর দিয়েছিল, কে দেবে চাঁদা? মানুষ এখন তো সব মরে রয়েছে। কিন্তু আজ স্টেশনের ঘটনার পরে আর সে কথা বলা চলে না। নূর মহম্মদের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য নিশ্চয়ই তারা সাহায্য করবে।

আর অবস্থাও হয়ে উঠেছে সঙ্গীন। স্বামীর মৃত্যুর পর মাজেদার অসুখ আরো বেড়ে গেছে। অনেক লেখালিখি করেও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আসার লক্ষণ দেখা গেল না। কবে আসবে তারও ঠিক নেই। এদিকে বন্ধ হয়ে গেছে সাবুর লেখাপড়া। সারাদিন টো টো করে ঘোরে সে, জিজ্ঞাসা করলে বলে খেয়ে এসেছি। মরিয়মের নিজের মাইনের দশটা টাকাও বন্ধ হয়েছে দু'মাস। এক অভাবের জ্বালায় জহুর ছেড়ে গেছে সাধের রেলকলোনী, আর এক অভাবের মরুভূমিতে দু'দিন যেতে না যেতেই মিলিয়ে গেছে প্রিয়জন বিয়োগের শোকাশ্রু।

সেদিন ছিল মাইনের তারিখ। আবেদন মাত্রই লোকো শেডের চেনা-অচেনা লোক ভরিয়ে দিয়ে গেল মরিয়মের ছেঁড়া আঁচল। আজিজের কথাই সত্যি হল।

ফিরতি পথে আজিজকে মতিউর বলল, ইউনিয়নের চাঁদা সহজে দিতে চায় না লোকে, অথচ আজকে দেখলেন তো ব্যাপারটা।

আজিজ জবাব দিল, আভি তক আদমীকো দিলকো ডর নেহি টুটা। কিন্তু নুর মহম্মদের জন্য তারা ব্যথা পেয়েছে, তাই দিয়েছে।

মতিউর জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি মনে করেন এর পরও নুর মহম্মদের পরিবারকে সাহায্যের জন্য মানুষ এত টাকা দেবে? আজ প্রথম দিন বলেই কি তারা এত বেশী দেয় নি!.

মরিয়ম কপালের ঘাম মুছে বলল, সে কথা ঠিক। ইউনিয়ন ভালো না হ'লে সাহায্যও ভালো আসে না। কয়দিন মানুষ এই ভাবে দেবে? দানখয়রাত মানুষ বেশী করতে পারে না।

আজিজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কিন্তু ইউনিয়নই তো ভালো হচ্ছে না।

আলোচনা করতে করতে কখন তিনজন এসে দাঁড়িয়েছিল নুর মহম্মদের বাড়ীর সামনে। আজিজ এবং মতিউর বিদায় নিলে মরিয়ম ভিতরে ঢুকে দেখল, আছিয়া বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে ফুলে ফুলে।

মাজেদার দিকে তাকিয়ে মরিয়ম জিজ্ঞাসা, আপা, কি হয়েছে।

হবে আবার কি, যত অভাব বাড়ছে, ততই মেয়ের খাই খাই বাড়ছে।

মরিয়ম আঁচল উজাড় করে দিল বিছানার উপর। সেদিকে তাকিয়ে আছিয়া প্রহারের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে উঠে এল। চোখ মুছে হাসি

মুখে গুণতে লাগল আনি, দু'আনি, সিকি, আধুলি, টাকা।

মাজেদা মুখ অন্ধকার ক'রে বলল, টাকা তুমি নাও মরিয়ম. ভিক্ষের পয়সা আমি নিতে পারব না! না খেয়ে উপোস ক'রে মরি সেও ভালো! আল্লা আমার কপালে এতও লিখেছিল!

ভিক্ষে কেন হবে আপা, মানুষ ভালবেসে দিয়েছে!

তা হোক, ও আমি নিতে পারব না! মান সম্মান খোয়ানোর চাইতে উপোস করাই ভালো।

মরিয়ম রেগে গেল এবার, আপা, ঝিগিরি ক'রে খাই বলে আমাদের কোনো মানসম্মান নেই, না? আমি কালই তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। থাক তুমি তোমার মানসম্মান নিয়ে।

আহ, চটিস কেন। অসুখবিসুখে আমার মন মেজাজ ভালো থাকে না মরিয়ম, তুই কি বুঝিস না। দে আছিয়া আমাকে দে।

বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ শুনে মরিয়ম গিয়ে দরজা খুলে দিল। আবার ফিরে এসেছে আজিজ। মুখ কাচুমাচু করে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে বলল, এই দেখ, বুড়ো মানুষ সব মনেও থাকে না। দুই দিন ধরে পকেটে ঘুরছে চিঠিখানা। রোজই ভুলে যাই!

মরিয়ম চিঠি খুলল ঘরে এসে। হাসমৎ লিখেছে, খালা, তোমাকে খান দুই পত্র লিখেও উত্তর পাই নি, শেষে জানতে পারলাম তুমি চলে গেছ বাড়ী থেকে। কী ভাবে তোমার দিন কাটছে জানি না। বাপজানের উপর আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। তাঁর টাকায় আমি আর পড়াশোনা করতে পারলাম না। অনেক ভেবেচিন্তে এয়ার ফোর্স অর্থাৎ বিমান বাহিনীতে ঢোকা ঠিক করি। চেষ্টা-চরিত্রির ক'রে ঢুকতেও পেরেছি। এতে সুবিধে এই, ট্রেনিং পিরিয়েডে পয়সা তো লাগবেই না, মাসে দেড়শ' টাকা ক'রে দেবে। শীঘ্রই আমাদের ট্রেনিংয়ের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিলাসপুর নিয়ে যাবে। কবে ফিরব জানি না...কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করা হল না, ইতিমধ্যে এক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছি...

একমাত্র স্নেহের বন্ধন ছিল যার সঙ্গে, সেও চলল দূরদেশে! মাজেদার চৌকির একপাশে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল মরিয়ম। ব্যস্ত হয়ে

মাজেদা জিজ্ঞাসা করল, কী লিখেছে চিঠিতে!

মরিয়ম শুধু জবাব দিল, না, কিছু না।

তবে কি শরীর খারাপ লাগছে?

না!

পরদিন কাজ সেরে বাড়ী ফিরে মরিয়ম মাজেদার গলা শুনতে পেল, অমন ছেলে কেন মরে না! আমার হাড় জুড়োত।

কী হল, অত চেঁচাচ্ছ কেন?

কোনো জবাব দিল না মাজেদা। সাবু তার বাক্স থেকে গতকালের সমুদয় অর্থ নিয়ে গেছে লোপাট ক'রে!

হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না মরিয়ম।

বাড়ী আসা প্রায় ছেড়েই দিল সাবু, এলেও এড়িয়ে চলতে লাগল মরিয়মকে। রাত্রে সিনেমা দেখে, হোটেলে গিয়ে খায়, শোয় কোনো বন্ধুর বাসায়। প্রায় উপোস ক'রে দিন কাটতে লাগল মাজেদার। উপায়ান্তর না দেখে মরিয়ম এরসাদের বাড়ী গেল।

সব কথা শুনিয়ে হাত পেতে বলল, দাও ভাই এবার তোমার টাকা।

ব'সো না ভাবী, তাড়া কিসের। অমন ছেলেকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয় না কেন?

মরিয়ম হাসল, তাড়াতে হবে কেন, ও নিজেই স'রে গেছে দূরে।

দশটা টাকা মরিয়মের হাতে দিতে দিতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে এরসাদ বলল শুনেছ ভাবী, ঢাকায় গুলি চলেছে!

রক্তশূন্য মুখে মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, জেলের মধ্যে?

না এবার জেলের বাইরে, ছেলেদের উপর! ভাষা আন্দোলনে চালিয়েছে গুলি! মরেছে যে কত তার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।

ধক ক'রে উঠল মরিয়মের বুক। হাসমৎ চিঠিতে লিখেছিল এক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে! আনিস জেলে যাওয়ার পর কোনো খবরের কাগজের মুখ দেখেনি মরিয়ম। বজলুস সাত্তারের বাড়ীতে কাগজ সামনে থাকলেও সংকোচে সে তুলতে পারে নি হাতে। আজ যখন হঠাৎ গুলি চলার খবর এল তখন সে বুঝতে পারছে বৃহত্তর দুনিয়ার সঙ্গে সে কত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নইলে হাসমতের চিঠি থেকেই সে বুঝতে

পারত কোন আন্দোলনের কথা লিখেছে সে।

মরিয়মের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে এরসাদ জিজ্ঞাসা করল, কী হ'ল ভাবী? মুখটা অমন শুকিয়ে গেল কেন?

একটু চুপ করে থেকে মরিয়ম জবাব দিল, না ভাই, ও কিছু নয়। আমি উঠি।

রাস্তা দিয়ে প্রায় টলতে টলতে বাড়ী ফিরল মরিয়ম। মাজেদা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে মরিয়ম?

না কিছু হয় নি। এই নাও টাকা।

মরিয়ম, কয়দিন থেকেই দেখছি তোর শরীর খারাপ হয়েছে। একটু শুয়ে থাক না চুপচাপ।

সত্যিই গিয়ে শুয়ে পড়ল মরিয়ম। ঐ যে এরসাদ বলেছে, মরেছে যে কত তার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না, সেটাই ঘুরতে লাগল তার মাথার মধ্যে। মনে পড়ল হাসমৎ বলেছিল, আমার মা বেঁচে থাকলে তুমি না করতে পারতে না। সে স্নেহের তো কোনই প্রতিদান দেওয়ার সাধ্য ছিল না মরিয়মের। যতই হাসমতের ছোট বেলা থেকে সুরু করে সেদিনের নানা চিত্র মনে পড়তে লাগল ততই দপদপ করতে লাগল মাথা।

উঠে পড়ল মরিয়ম। এবার যেতে হবে কাজে। কাজের মধ্যে ভুলে থাকা সহজ। কিন্তু বজলুস সাত্তারের বাড়ীতে গিয়ে সে আর একবার হতচকিত হ'ল। কাঞ্চনের মা ভাত খায় নি। সকাল থেকে পড়ে আছে জায়নামাজের উপর। কাঞ্চন যে সব কাজেই আগে আগে থাকে। বজলুস সাত্তার ঢাকায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। কিন্তু কোনো খবর নেই।

কাজ সেরে যখন বাড়ী ফিরছে মরিয়ম তখন লোক জমেছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। উত্তেজিত আলোচনা চলছে সর্বত্র। দেখতে না দেখতে দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেল যেন কোনো এক যাদুমন্ত্রে। মতিউর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, তোমাকেই খুঁজছিলাম আপা!

কেন, কী ব্যাপার!

পূবদিকের কলোনীতে দোকান বন্ধের ব্যাপার নিয়ে বাঙালী অবাঙালীদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। লোক মারা গেছে না কি! যেতে হয় সেখানে!

লোক মারা গেছে!

হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম।

মণি আর কলি ছুটতে ছুটতে এলো। মণি বলল, মা, রেলগাড়ী সব বন্ধ হয়ে গেছে!

বন্ধ হয়ে গেছে!

হ্যাঁ মা, অনেক লোকজন শুয়ে পড়েছে লাইনের উপর।

একটু পরেই শহরে টহল দিতে লাগল পুলিশের লরী। মতিউর আর মরিয়ম যখন পূর্বদিকের রেল কলোনীতে পেঁাছল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দুই একটা দোকানের ঝাঁপ ভাঙ্গা দেখা গেল। তবে মারা যায় নি কেউ, একজন সামান্য আহত হয়েছে, কিন্তু পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে বহু বাঙালী অবাঙালী দোকানদারদের।

উত্তেজনার মধ্যে রাত্রি জাগরণের পর খুব ভোরবেলা উঠে বজলুস সাত্তারের বাড়ী কাজে গেল মরিয়ম। এক রাত্রিতেই হেডমাস্টারের চোখের কোনায় পড়েছে কালির রেখা, চুল উস্কোখুস্কো, উদ্‌ভ্রান্তের মত বজলুস সাত্তার বলল, জানো মরিয়ম কাঞ্চনের আজো কোনো খবর নেই! পারো তো তুমি কাঞ্চনের মার মুখে কিছু দিয়ে এস! কাল থেকে না খেয়ে আছে।

মরিয়মের হাতে খাবারের থালা দেখেই কাঞ্চনের মা তাকে অনুরোধ করল, ক্ষুধাতৃষ্ণা আমার কিছু নেই। কাঞ্চনের বাপ কাল রাত্রে কিছু খায় নি, ওকে কিছু খেতে বলো!

মরিয়ম কাকে কী বলবে, তার নিজের দুঃখ তো গা-সওয়া হয়ে এসেছে, কিন্তু দুনিয়ার চেহারাও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, কাল যেখানে এতটুকু দুশ্চিন্তা ছিল না, শান্ত নদীর মত জীবন ধারা বয়ে চলেছিল নিরুদ্বেগে আজ সেখানে এক রাত্রির মধ্যে কে নিয়ে এল এত অশান্তি এত চাঞ্চল্য এত দুর্ভাবনা।

বজলুস সাত্তার ঘরে ঢুকে বলল, জানো কাঞ্চনের মা, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে!

খোদার কাছে মোনাজাত করো, অমন উতলা হয়ো না, আমার কাঞ্চন ফিরে আসবে, বলে স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কাঞ্চনের মা নিজেই

কাঁদতে লাগল উতলা হয়ে।

বজলুস সাত্তার ঘুরে দাঁড়াল, শোন মরিয়ম, লোভের বশবর্তি হয়ে আমি নিরীহ রামতারণবাবুকে কমিউনিষ্ট বলে তাড়িয়ে ছিলাম স্কুল থেকে। সেই পাপের ফলেই বোধ হয় আমার এই দুর্দশা। আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানো? তাঁর পা ধরে মাপ চেয়ে আসি! দেখা হ'লে বলতাম, দাদা, ক্ষমা করো, তোমার স্কুলে ফিরে এস তুমি!

নিজের যন্ত্রণা ভুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মরিয়ম। কোনো কথা ফুটল না তার মুখে। কোন এক অদৃশ্য শক্তির আঘাতে আজ যেন মনের মানুষ দ্বার খুলে সত্যের সম্মুখীন হ'তে চলেছে নত মস্তকে। এক সত্য বুকে নিয়ে আনিস গেল জেলে, আর এক সত্যের আত্মপ্রকাশের সামনে তীব্র দহনে জ্বলছে বজলুস সাত্তার। আর ঐ কাঞ্চন, তার মত নিরীহ ছেলেও কেন আজ দাঁড়িয়েছে সামনের সারিতে গিয়ে! চাকরীতে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তে হাসমৎ কেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আবর্তের মধ্যে!

মরিয়ম ভাবতে ভাবতে এল সারাপথ। রাস্তার দুইদিকের দেয়াল-গুলো ছেয়ে গেছে পোস্টারে! কারা লিখেছে এত পোস্টার? কোথায় ছিল তারা এতদিন? মাটির মধ্যে লুকিয়ে থাকে ভূমিকম্প, আর মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকে প্রতিরোধের অভাবনীয় শক্তি! সেই বিশ্বাসেই ওরা বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারে জেলখানায়।

ঘরে ফিরতেই মাজেদা জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে মনির মা, দোকান-পাট নাকি আজো বন্ধ?

মরিয়ম বুঝিয়ে বলল, লোকে বাংলা ভাষা চায়, কিন্তু লীগের মন্ত্রীরা গুলি চালিয়েছে। যতদিন বাংলা ভাষা না দেবে, ততদিন ছাড়বে না লোকে।

মাজেদা একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল, তব উর্দু নেহি রহেগা, বাংলা মে বাতচিত বল্‌নে পড়েগা?

তা কেন, সবাই নিজের নিজের ভাষা ব্যবহার করবে! লোকে তো তাই চাইছে।

এ তো খুব ভালো কথা। কিন্তু তা'হলে এত গণ্ডগোল কেন? গবর্ণমেণ্ট দিয়ে দিলেই তো পারে। আর মানুষেরও বলিহারী, ভাষা ধুয়ে কি মানুষ পানি খাবে। রুজি রোজগারের জন্য মানুষ যদি একসঙ্গে

দাঁড়াত তা'হলে এদ্দিন কত ভালো কাজ হত, তা করেনা কেন ?

মাজেদাকে বোঝাবার সময় ছিল মরিয়মের। আজো সারা অঙ্গে কয়লার গুঁড়ো মেখে এসে দাঁড়ালো মনি আর কলি। যেখানেই যা হোক, এদের কাজের বিরাম নেই।

মরিয়ম দু'জনকে গোছল করিয়ে ভাত খেতে দিয়ে ভাবতে লাগল। নানা উল্টোপাল্টা চিন্তা ঘুরতে লাগল মাথার মধ্যে। হাসমৎ আর কাঞ্চনের মত কত নিরীহ ছেলেরা বুকের রক্ত দিতে ছুটছে আজ! নিশ্চয়ই কোনো গভীর কারণে। অথচ বাংলাভাষা হ'লে আমার মনির আর কলির কী সুবিধে। তাদের তো স্কুলের পড়াই বন্ধ হ'য়ে গেছে। ছাইয়ের গাদার উপর আমার ছেলেমেয়ে বসে বসে দিন কাটায়। আর ঐ সাবু, টাকার অভাবে থেমে গেছে ওর লেখাপড়া। আছিয়া মেয়েটা বাপ মারা যাওয়ার পর বাড়ীতে পড়ার সুযোগটুকু হারিয়েছে। ওয়াগনের ঐ তো শতশত ছেলেমেয়ে দিন কাটায় দুর্গন্ধের মধ্যে, তাদের জন্য একটা উর্দু স্কুলও তো করে দেয়নি উর্দুওয়ালা অফিসারেরা। আর স্কুল থাকলেই বা পড়তে পারত কয়জন? এক মুঠো ভাতের জন্য দিনরাত্রি অস্থির হয়ে উঠছে মানুষ, ভাষা শিক্ষার সুযোগ আর অবসর কই তাদের? আমাদের গ্রামের সাধু শেখ কী ক'রে লেখাপড়া শিখবে? লেখাপড়া শিখেও তো জহুর বেকার হয়ে ঘুরছে পথে পথে! কিন্তু এই সবই যদি সত্যি হবে তা'হলে রাস্তার ঐ যে সব দোকানদার, যারা নিতান্ত গরীব তারাও কেন উৎসাহ নিয়ে বন্ধ করে দোকানপাট? কিসের স্বার্থ, কোন স্বার্থ তাদের? তবে এ ঝড় উঠল কোত্থেকে? বহু বঞ্চনার বিরুদ্ধে তবে কি আজ জেগে উঠল এই সুযোগে বাঙালী জাতি? নইলে রেলকলোনীর হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এত অস্থিরতা কেন?

হঠাৎ মরিয়মের মনে হল, কেমন ক'রে নিঃসঙ্গতা যেন ঘুচে গেছে আমাদের, নিজেদের চলার পথ যেন একটু প্রশস্ত বলে মনে হচ্ছে। যেন নানাদিক থেকে নানাধরনের সঙ্গী এসে জুটল আমাদের কঠিন চলার পথে। নইলে বন্ধ দোকানগুলির দিকে তাকিয়ে মন কেন নেচে উঠবে আনন্দে! অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এত লোককে দাঁড়াতে দেখলে কার না মনে সাহস হয়। দেশের সমস্ত লোক শোনোঃ আমরা আর একা নই!

মরিয়মের চিন্তা ভঙ্গ হল। বাড়ীর মধ্যে এসে দাঁড়াল মতিউর, তোহা আর আজিমুদ্দী।

মতিউর জোর দিয়ে বলল, আজ আমাদের সেকেন্ড শীফটে লোকো শেডে স্ট্রাইক করতেই হবে!

আজিমুদ্দী চিৎকার করে উঠল, শালা অবাঙালীরা ষ্ট্রাইক না করলে আজ পিটিয়ে লাস ক'রে দেব না! ব্যাটারা বাংলাদেশকে লুটে খেল!

মুহূর্তের জন্য দিশেহারা হয়ে গেল মরিয়ম। তারপর শান্ত গলায় বলল, আজিমুদ্দী ভাই, তুমি এখান থেকে চলে যাও!

কেন কী খারাপটা বলেছি। আমার উপর চটছ কেন?

আচ্ছা, আজিমুদ্দী ভাই, ওয়াগনের লোকগুলো কাদের লুটে খাচ্ছে শুনি! কারা মারে আর মরে একবার ভেবে দেখেছ?

আজিমুদ্দী জবাব দিল, তোমাদের আমি আজও চিনতে পারলাম না। তোমাদের সঙ্গে আমার বনবে না! আমি চললাম!

চুপ করে রইল মরিয়ম। আজিমুদ্দীকে চলে যেতে দেখেও ডেকে ফেরাল না সে। আনিস একবার বলেছিল, দেখো মরিয়ম চারপাশ থেকে মিথ্যা যদি এসে মানুষকে ঘিরে ফেলে তা'হলে মানুষ সত্যের পাহাড়ের উপর বসে থাকলেও দেখতে পায় না সত্যকে। সেই জন্যই আমরা প্রচারের উপর জোর দিই এত বেশী। সত্যকেও প্রচার করতে হয়, নইলে মিথ্যার জোরের কাছে হঠাৎ নিজেকে মনে হয় অসহায়। সেদিন মরিয়ম কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারেনি, হয়ত আনিসও বোঝাতে পারেনি ভালো ক'রে। আজ মরিয়মের মনে হল, যে মানুষ রেলকলোনীর মধ্যে নিজে বাস করছে, সুখে দুঃখে নিজে জড়িয়ে রয়েছে ওয়াগনের বাসিন্দাদের সঙ্গে, সেও যদি ঠিক সংকটের সময় আঘাত ক'রে বসে নিকট বন্ধুকে, তা'হলে রাস্তার দোকানদার আর স্কুল কলেজ অফিসের বাঙালী অবাঙালীদের পরষ্পরের প্রতি বিদ্বেষকে দোষ দেব কী বলে।

দল বেঁধে চলল সবাই লোকো শেডের দিকে। দু'একজন করে ঢুকছে তখন। তোহা পথ রোধ করে দাঁড়াল, ঢুকতে দেব না, আজ স্ট্রাইক!

ছোড় বাঙ্গালী! বলে একটা লোক এগিয়ে গেল ধাক্কা দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। ক্রমে দেখা গেল, লোক ভাগ

হয়ে যাচ্ছে প্রায় দুইদলে। কোত্থেকে এসে উদয় হল স্বয়ং ডি-এম-ই এবং এক বিরাট পুলিশবাহিনী! মরিয়ম নিজের অজান্তে এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে গেটের ভিতর এবং মুখে যা আসছে বলে যাচ্ছে।

একটা স্পষ্ট কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, ইয়ে আওরত কো নিকাল দো!

খবরদার! কোত্থেকে আজিজ এসে দাঁড়িয়েছে মরিয়মের পাশে! সে চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করল, জবানকা লিয়ে কোরবান হো রহা হ্যায় হামারা তালবিলিম লোক! ও হামারা ফরজন্দ হ্যায়, ও হামারা ভাই হ্যায়, ও হামারা দোস্ত হ্যায়! আমরা মজুর আছি, দুনিয়ার মজুর সব এক আছে, হামারা এক রহনা চাহিয়ে। আমাদের এক থাকতে হবে আর সকলের ন্যায় অন্যায় দেখে বিচার করতে হবে—

সমর্থনসূচক ধ্বনি এবং টিটকারীর শব্দ, হৈ চৈ, ঠেলাঠেলি সুরু হল এক সঙ্গে। শেষে জিয়াউল হকের আদেশে গেট বন্ধ হওয়া এবং ছুটী ঘোষণার পর ছড়িয়ে পড়ল উপস্থিত জনতা।

মতিউর ফিরে আসতে আসতে বলল, আমরা তো এরকম চাইনি!

আজিজ গালাগালি দিতে লাগল, শালা ঐ নবীবক্সের ক'টা লোকের জন্য এরকম হল। ঐ শালা ডি-এম-ই'র পোষা কুত্তা আছে!

রাস্তা দিয়ে তখন চলেছে স্কুলের ছাত্রদের এক শোভাযাত্রা। রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা চাই! নুরুল আমিন গদী ছাড়! ধ্বনি দু'টো মরিয়ম শুনল এই প্রথম। কিন্তু তারপর দৃষ্টি পড়ল গিয়ে মিছিলের পুরো-ভাগে—সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে চলেছে বজলুস সাত্তার। ক্ষণে ক্ষণে হেডমাস্টারের গলাতেও কেঁপে উঠছে, গদ্দী ছাড়, গদ্দী ছাড়!

কোত্থেকে এসে আজিমুদ্দী ছুটে গেল মিছিলের মধ্যে। হারিয়ে গেল মতিউর, মিলিয়ে গেল তোহা। শুধু মরিয়মের পাশে দাঁড়িয়ে আজিজ বলতে লাগল, বহুত আচ্ছা! লীগ সরকারকো হঠানা হোগা!

আনন্দের ঢেউ এসে লাগছিল মরিয়মের মনের মধ্যে। কিন্তু যেন একটা কাঁটা ফুটে রয়েছে তার বুকে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না আজিমুদ্দীর কথা, আর ঐ লোকো শেডের সামনে বিভক্তপ্রায় দুইদল মানুষকে। পথে আসতে আসতে কোথাও সে দেখতে পায়নি অবাঙালীদের মুখে আনন্দের আভাস। একদিকে বুক ভরে উঠেছে উচ্ছ্বাসে, অন্য-

দিকে জেগেছে সন্ত্রস্তভাব। বাংলাদেশে মুক্তির বাতাস যদি এল, সে কেন সঙ্গে নিয়ে এল ঘূর্ণীবায়ু? আনিস বলত, ঝড় এলে ধুলোবালি উড়বেই। একী শুধু ধুলোবালি? যাদের মুখে হাসি নেই, তাদের টানতে না পারলে হাওয়া যে দূষিত হয়ে উঠবে।

শহরে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারী আছে। তবু চলেছে এই মিছিল। মানুষ মানতে চাইছে না বাধা। কয়েকটা পুলিশের লরী ছুটে গেল সামনের দিকে। প্রচণ্ড শব্দ ভেসে এল মরিয়মের কানে। সে বলে উঠল, আজিজ চাচা, গুলি চলেছে!

আজিজ তাকে আশ্বস্ত করল, নহী বেটী, টিয়ার গ্যাস!

ছত্রভঙ্গ জনতা ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। মরিয়মও একটা বাড়ীর গেটের মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিল অনেকের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে। হঠাৎ চলমান একটা খোলা পুলিশ ভ্যানের উপর নজর পড়ল তার। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে—এ কী, পুলিশ বেষ্টিত দাঁড়িয়ে রয়েছে আজিমুদ্দী! তার পাশে বজলুস সাত্তার! তার পাশে আনসার ক্যাপ্টেন হবিবুর! আর তার পাশে তারই ভাই মকসুদ! সেই সঙ্গে যোগেন গাঙ্গুলি!

চলন্ত ভ্যানটা মিলিয়ে গেল ছায়াছবির মত।

রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেতে আজিজ মরিয়মকে বলল, চল বেটী এবার আমরা যাই!

হ্যাঁ চল যাই।

কিছুদূর এসে আজিজ জিজ্ঞাসা করল, এখন কী করবে বেটি? ওরা তো গ্রেপ্তার করতে সুরু করল এখানেও!

জবাব দিতে পারল না মরিয়ম, শুধু বলল, চাচা কাল একবার এসো।

আজিজ তার বাড়ীতে চলে গেল। মরিয়ম পা বাড়াল উল্টো দিকে। কাঞ্চনের মাকে খবর দিতে হবে, এখন সম্পূর্ণ একা পড়ে গেছেন তিনি।

পথ চলতে চলতে মরিয়মের মনে কেবল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল একটি প্রশ্ন, কী করণীয়, কী করতে পারি আমরা। দুনিয়া বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে, কল্পনাতীত ঘটনা ঘটছে। আবার বন্ধুজনের মধ্যে বিরোধ বাধছে। হাসমতের খবরের জন্য বুক জ্বালা করছে। এ

অবস্থার মধ্যে কোন পথে যাব, কোন কাজ করব।

আনমনা মরিয়মের পথ আটকে দাঁড়াল সোনাউল্লা!

এতকাল পরে-এইভাবে পুলিশের লোকটাকে আচমকা সামনে দেখে হতচকিত হয়ে দু'পা পিছিয়ে এল মরিয়ম।

সোনাউল্লা বলল, ভয় নেই, গ্রেপ্তার করব না!

পথ ছাড়ুন!

দেখো, আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারো? তোমার ভাইটা কোত্থেকে এসে মিছিলে জুটে গেল! আর শালা ঐ যোগেন গাঙ্গুলি! ওর মনেই বা এত সখ জাগল কেন! আর ঐ বদমাইশ আনসারটাই বা ছেলে ছোকরার দলে ভিড়ল কী করে!

সেটা ওদের কাছে গিয়েই জিজ্ঞাসা করুন! ওরা তো আপনাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এখন।

আহ চটছ কেন! শালা, মানুষকে বোঝাই মুস্কিল! আমার ছেলেটাই বা এতক্ষণ কি করছে কে জানে! মানুষকে গোমুখ্যু করে রাখাই ভালো। আসলে শালা, লোকগুলোর মাথাই একেবারে খারাপ হয়ে গেছে! যাক চলি! তোমাদেরই তো এখন দিনকাল!

হাসতে গিয়েও ঠিক হাসতে না পারার ফলে সোনাউল্লার মুখটা বিকৃত দেখাল।

২১

সন্ধ্যার পর এরসাদ এল দেখা করতে! সঙ্গের একজন লোককে দেখিয়ে বলল, ইনি উপর থেকে এসেছেন।

গোলাম মওলা পুরু কাঁচের চশমাটা পুঁছতে পুঁছতে হেসে ফেললেন, না, আমি নীচে থেকেই এসেছি!

সমস্ত বিস্ময় এসে জড় হয়েছিল মরিয়মের চোখে। অবশেষে ওরা লোক পাঠিয়েছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে! মরিয়ম ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখল মওলাকে। চুলে পাক ধরেছে, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, চোখের তারা গর্তে বসে গেছে। একে হাসতে দেখলে আশ্বস্ত হওয়া যায়, নইলে কেমন অস্বস্তি বোধ হয়।

গোলাম মওলার হাসিমুখ দেখে আরাম পেল মরিয়ম।

গোলাম মওলা একটা গভীর নিশ্বাস টেনে বললেন, আমরা জেল থেকে অনেকগুলি চিঠি পেয়েছি আপনার সম্পর্কে। কিন্তু এতদিন ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমাদের অবস্থা এবং অসুবিধার কথা আর কি বলব আপনাকে! সবই ধারণা করতে পারেন।

কেন জানি মরিয়মের দু'চোখ ভরে এল জল। সে আঁচলখানা তুলে বারবার ঘসতে লাগল চোখের উপর।

গোলাম মওলা ভুল বুঝে স্বান্তনা দিলেন, দুঃখ করবেন না, দুঃখ সকলের আছে। মরার সময় আমি আমার স্ত্রীকে দেখতে পাইনি। আমার একমাত্র মেয়ে রয়েছে গরীব আত্মীয়ের বাড়ীতে। তারা প্রায়ই জানিয়ে দিচ্ছে, তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও।

মরিয়ম দুঃখের জন্য কাঁদেনি, তার চোখে এসেছিল বহুদিন পর আশ্বাস আর আনন্দের অশ্রু। কিন্তু গোলাম মওলার সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনে তার লোকটাকে ভালো লাগল আরো, অতি অল্প সময়ের মধ্যে মনে হল নিকটের মানুষ বলে। সে এরসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, দাও তো ভাই আনা চারেক পয়সা, চা কিনে নিয়ে আসি।

চা বিস্কুট নিয়ে এল মরিয়ম। বিস্কুট ক'খানা মনি আর কলির হাতে গুঁজে দিয়ে গোলাম মওলা এরসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এদের লেখাপড়া অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে, না? আপনি একটু চেষ্টা করলে এদের ফ্রি ভর্তি করে দিতে পারেন না?

এরসাদ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে জবাব দিল, তা হয়ত পারি।

যা তার ক্ষমতার মধ্যে ছিল তা কেন নজরে পড়েনি আগে? অথচ মরিয়মকে কতরকম ভাবেই না সে শুনিয়েছে সাহায্যের কথা। আজ গোলাম মওলা এসে যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, মাত্র তখনই কেন এরসাদ দেখতে পেল এই দায়িত্বটাকে। হয়ত মানুষের এই রকমই হয়। যখন অনেক কিছু করার আশা যায় হারিয়ে তখন আশেপাশের কর্তব্য সম্পর্কেও অসাড় মন হয়ে পড়ে নিষ্ক্রীয়।

মরিয়ম সোনাউল্লার কথাগুলি উল্লেখ ক'রে শেষে সহর্ষে বলল, জানেন, ওদের মনে পর্যন্ত ভয় ঢুকেছে।

গোলাম মওলা বিশেষ উল্লসিত না হয়ে চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে যদি কিছুদিন গোপনে থাকতে হয়, পারবেন না?

পারব না কেন, কিন্তু কী দরকার।

আপনার উপর ওদের এবার চোখ পড়েছে।

আমার উপর! আমাকে ওদের ভয়ের কি আছে?

ওদের ধারণা তো অন্যরকম ও হতে পারে! ভয় যে ওরা কাকে করে আর কাকে করে না, তা হয়ত নিজেরাই জানে না!

বাড়ীতে ঢুকল আজিজ। আর তার পিছনে তমিজ বিশ্বাস! প্রথমে মরিয়ম ঠাহর করে উঠতে পারেনি অন্ধকারে। তারপর হ্যারিকেনের আলোর নিকটবর্তী হতেই বাপকে দেখে সে চমকে উঠল। ঠিক বর্তমান মুহূর্তে তমিজ বিশ্বাসের আগমন যেন মূর্তিমান তালভঙ্গের মত মনে হল তার কাছে।

বাপকে দেখে মরিয়ম বসতেও বলতে পারল না, সালাম করতেও এগিয়ে গেল না। যেমন ছিল তেমনি বসে রইল নির্বাক হয়ে।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তমিজ বিশ্বাস ধপ করে বসে পড়ল বারান্দায়। আজিজ একপাশে উবু হয়ে বসে হেসে হেসে বিস্ময় প্রকাশ করল, বেটী মরিয়ম তোমার বাপজান আমার ওখানে এসে উপস্থিত! কিচ্ছু খোঁজ রাখে না মেয়ের, কী রকম বাপ তোমার!

কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। অবশেষে তমিজ বিশ্বাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হারামজাদারা তোর ভাইকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

মরিয়ম স্বচক্ষেই তা দেখেছিল, কাজেই কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করল না। তমিজ বিশ্বাসই আবার নীরবতা ভঙ্গ করল, ওরা যাকে খুশী তাকেই ধরছে। মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না! আর আমরা তো মানুষ নেই-ও! পশু হয়ে গেছি! পশুর আবার ভাষা কী।

এরসাদের কাছে কথাটা ভারী ভালো লাগল, সে আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে বলে উঠল, বাঃ আপনি চমৎকার বলেছেন! পশুর আবার ভাষা কী! কিন্তু পশু যদি ভাষা চাইতে সুরু করে সে তো মানুষ হয়ে উঠতে সুরু করে! পূর্ববঙ্গে হচ্ছেও তো তাই। কবি বলেছেন, এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—

বাপের কথায় তাৎপর্য বুঝেছিল মরিয়ম, সে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, এরসাদ ভাই কবিত্ব করো না, ভালো লাগে না।

কেন ভালো লাগে না বুঝতে না পেরে এরসাদ গুম হয়ে গেল। আসলে মরিয়মের জীবনযাত্রার পদ্ধতি খানিকটা চোখে পড়লেও তলিয়ে খোঁজ নেওয়ার স্বভাব তার ছিল না।

তমিজ বিশ্বাস সরাসরি প্রস্তাব করল, তোকে নিয়ে যেতে এসেছি মরিয়ম। আমার সঙ্গে তোকে যেতেই হবে। বারবার তোকে নিয়ে যাওয়ার কথা হাসমৎ চিঠিতে লিখেছে। টাকাও পাঠিয়েছিল গতমাসে। কিন্তু আমি মনের দুঃখে আসতে পারি নি। আজ মকসুদ যখন গ্রেপ্তার হয়ে গেল, তখন আর থাকতে পারলাম না। তুই চল মরিয়ম আমার সঙ্গে।

মরিয়ম হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। আজ যেন তার কপাল খুলেছে। জেলখানা এবং জেলখানার বাইরের ভালবাসা ব'য়ে নিয়ে এসেছেন গোলাম মওলা, তাকে স্মরণ ক'রে হাসমৎ পাঠিয়েছে টাকা, এতদিন পরে বাপ এসেছে মেয়ের সন্ধানে, আর ঐ সোনাউল্লা বলছে, এবার তোমাদেরই তো দিনকাল। তবে কি দুখের নিশা ভোর হ'তে চলেছে!

মরিয়ম শান্ত গলায় জবাব দিল, না, আমার যাওয়া হয় না!

কেন?

এ কেনর কী উত্তর দেবে মরিয়ম। কেনই বা সোনাউল্লার নজর পড়েছে এবার তার উপর, আর কেনই বা গোলাম মওলা বলছেন তাকে গা ঢাকা দিতে। অথচ একদিন কত নিরুপায় হয়েই না তাকে যেতে হয়েছিল বাপের বাড়ী, ছাড়তে হয়েছিল এই রেল কলোনী। পরের জন্য চিন্তা করা তো দূরের কথা, নিজের অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি পড়েছিল সেদিন। আর আজ? মানুষের দুঃখ দারিদ্র তেমনি আছে, রেলের লোকেরা বরং আরো বেশী কষ্টে কাটাচ্ছে দিন, তবু কেন রেল কলোনী ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই এখন অন্যায় ও অবান্তর মনে হয়!

মরিয়ম বাপের প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কার কিছু না বলতে পেরে পুনরাবৃত্তি করল, না, আমার যাওয়া হয় না।

তমিজ বিশ্বাস অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, কেন মা বুড়ো বাপের উপর

রাগ কচ্ছিস!

না রাগ করি নি তো!

আমার সঙ্গে না গেলে বুঝব তোর রাগ যায় নি।

মহা ফাঁপরে পড়ল মরিয়ম। গোলাম মওলার মুখের দিকে তাকিয়ে এরসাদ জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ও'র গ্রামে গেলেই কি আমাদের ভালো হবে না? আপনিই তো বলছিলেন ভাষা আন্দোলনটা গ্রামের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

গোলাম মওলা হাসলেন, কিন্তু ও'র পক্ষে গ্রামে আন্দোলন ছড়ানো কতটা সম্ভব হবে! আর বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করতে কতক্ষণ? বরং ও'র এখানে থাকা দরকার, রেলের লোকেরা ও'কে চেনে। তার চেয়ে ছেলেমেয়ে দু'টিকে যদি ও'র বাপ সঙ্গে নিয়ে যান, তা'হলেই বোধহয় ভালো হবে। অবশ্য আমি কিছু বলছি না। ও'র যেটা ভালো মনে হয়, সেটাই করা দরকার।

সকলেরই মনঃপূত হল গোলাম মওলার কথাটা।

তমিজ বিশ্বাস মেয়ের দিকে চেয়ে এবার হেসে বলল, দ্যাখ মরিয়ম, তোদের আগে তোদের ভাই-ই গ্রেপ্তার হয়ে গেল! অথচ সে কিচ্ছু করেনি। ঝোঁকের মাথায় শুধু গিয়ে যোগ দিয়েছিল মিছিলে।

গোলাম মওলার মুখ দিয়ে স্বগতোক্তির মত বেরুল, এই রকমই হয়!

মরিয়ম শহরের শেষ সীমা পর্যন্ত এল বাপের সঙ্গে সঙ্গে। মনি আর কলির হাত ধ'রে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় তমিজ বিশ্বাস চলে গেল গ্রামের দিকে।

ওরা যখন মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গেল তখন সেখানেই রাস্তার ধারে মাটির উপর বসে পড়ল মরিয়ম। তার মনে পড়ল আর একদিনের কথা। সেদিন বাপ-শ্বশুর একসঙ্গে নিতে এসেছিল তাকে। আজকের মতই সেদিনও সে রাজী হয়নি যেতে। বাপ শ্বশুর দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিল দুইদিকে। সেদিন সোনা গিয়েছিল তমিজ বিশ্বাসের সঙ্গে! আজ সেই সোনা কোথায়? কোথায় সেই সোনা? আঁধারের বুকের মধ্যে মিলিয়ে গেছে আমার সোনা, হাজার ডাকলেও আর ফিরে আসবে না! সোনা, এই দ্যাখ একা পথের ধারে অন্ধকারে বসে ডাকছে

তোর মা. শ‍ুনতে পাস না!

আয় বাবা, তোর মায়ের ব‍ুকে একবার ফিরে আয়!

নিজের উতলা ভাব লক্ষ্য ক'রে চোখ ম‍ুছে উঠে পড়ল মরিয়ম। রাত অনেক হয়ে গেছে। পঞ্চমীর চাঁদ তলিয়েছে আকাশ সম‍ুদ্রে। মরিয়মের গা'টা একবার শিউরে উঠল, একা পথে এত রাতে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি আমি, অথচ ভয়ও নেই, ডরও নেই, বাপও তাকে কত অনায়াসে এই ভাবে পথে ছেড়ে চলে গেল!

বাড়ী এসে মাজেদাকে মরিয়ম বলল, আপা, আমিও কয়েকদিন বাইরে বাইরে থাকব। প‍ুলিশের নজর পড়েছে।

সাব‍ু অনেকদিন পর এসে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে?

মরিয়ম হাসল, তা দিয়ে তোমার কি দরকার, তুমি কোথায় যাও তা কি আমাদের বলে যাও?

মাজেদা বলল, বোন তুই কাছে ছিলি, তব‍ু মনে একটা সাহস ছিল, যা ছেলে আমার, একবিন্দ‍ু ভরসা হয় না।

আপা, আমি কাছাকাছিই আছি! একট‍ু কেবল স'রে থাকছি। আপা শোনো, প্রভিডেন্ড ফান্ডের জন্য এবার সাব‍ুকে হেড অফিসে একদিন পাঠিয়ে দাও।

হ্যাঁ তাই দেব। কিন্তু আমার ভাবনা যায় না বোন; ওটা তো মান‍ুষ নয়, টাকা ক'টা ওর হাতে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না।

সাব‍ু ঝট ক'রে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মরিয়ম স্নেহের স‍ুরে বলল, একেবারে ছেলেমান‍ুষ! ওর উপর রাগ ক'রো না আপা।

মরিয়ম সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে।

গোলাম মওলার অন‍ুমানই ঠিক। পরদিন সকালে প‍ুলিশ এসে ঘেরাও করল ন‍ুর মহম্মদের বাড়ী। সোনাউল্লা সাব‍ুকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তো দেখছি গ‍ুণ্ডার মত দেখতে! মরিয়ম কোথায় গেল?

সাব‍ু তার স্বভাব অন‍ুযায়ী বাহাদ‍ুরী করে জবাব দিল, কোথায় গেল

তা জানলেও আপনাদের কাছে কেন বলব ?

তবে তো বাপু তোমায় একটু থানায় যেতে হবে। থানায় নিয়ে গিয়ে সাবুকে সোনাউল্লা ধমক দিল, ভালোয় ভালোয় বল, নইলে—

সাবু কী বলবে, সে কিছুই জানে না।

সোনাউল্লা ব্যঙ্গ ভরে বলল, তোমার লজ্জা করে না নিজে উর্দু-ওয়ালা হয়ে বাংলা ভাষাওয়ালাদের সমর্থন করছ !

সাবু কাউকে কোন প্রকার সমর্থনই করেনি, কিন্তু গোঁয়ারের মত সোনাউল্লাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধতা কেন করছেন, আপনার লজ্জা করে না !

তবে রে শালা ! বলে সোনাউল্লার মুখ এবং হাত চলতে লাগল এক সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল সাবু। পরে সোনাউল্লার ভেবে চিন্তে মনে হল, হয়ত ব্যাটা সত্যিই কিছু জানে না।

পুলিসের গাড়ী এসে আধমরা অবস্থায় নামিয়ে দিয়ে গেল সাবুকে। মাকে কাঁদতে দেখে সাবু বলল, এতে কাঁদার কী হল ? চুপ করো !

কয়েকদিন পর সে খোঁজাখুঁজি করে মতিউরের বাড়ীতে গিয়ে ধরল মরিয়মকে, জিজ্ঞাসা করল, আমাকে দিয়ে কি কোনো কাজ হয় না ?

সব কথা শুনে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে মরিয়ম হেসে জবাব দিল, কাজে না লাগলে কী ক'রে বুঝব !

বেশ তাই হোক !

তুমি আমাকে একটু একটু উর্দু শেখাবে সাবু ?

এবার সাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেন উর্দু শিখবে খালা !

খালা সম্বোধনে মরিয়ম চুপ হয়ে গেল এক মুহূর্ত, তারপর জবাব দিল, নইলে রেলের লোকদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলব কী করে।

কিন্তু এখন আন্দোলন হচ্ছে বাংলার, আর তুমি শিখবে উর্দু ! লোককে বলছ বাংলা চাই, আর তুমি চাইছ উর্দু !

মরিয়ম সাবুর কথার ঢং দেখে হেসে উঠল, কিন্তু সাবু, আমাকে রেলের লোকের কাছে বাংলাভাষার ন্যায্যতা বোঝাতে হলেও তো উর্দু জানা চাই !

তা'হলে খালা আমাকেও তুমি বাংলা শেখাও ! নইলে আমিই বা

তোমাদের সঙ্গে ভালো করে কথা বলব কী ক'রে?

সাবুর শেষ কথাগুলো মরিয়মের কানে গেল না। আনমনা হয়ে সে ভাবছিল মাজেদার কথা। সাবুর মতিগতির পরিবর্তনে এবার যদি মায়ের প্রাণে একটু শান্তি আসে।

২২

মাস তিনেক পরে জহুরের সঙ্গে মরিয়মের দেখা।

একটা সরু গলির মোড়ে বেগুনি ফুলুরীর গাদা সাজিয়ে নিয়ে বসেছিল জহুর। পাশের মাটির উনুনের উপর জল ফুটছে, একখানা তক্তার উপর কয়েকটা চায়ের বাটি উপুড় করে রাখা। হ্যারিকেনের চিমনির অর্ধেকটা প্রায় কালিতে আচ্ছন্ন। একটি ছোট ছেলে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। দেশ থেকে একে নিয়ে এসেছে জহুর। চা বানানোর কাজে ছেলেটা তাকে সাহায্য করে। মরিয়ম যাচ্ছিল ওয়াগনের দিকে, হঠাৎ পথের পাশে জহুরের দাড়িভর্তি মুখ নজরে পড়তেই এগিয়ে গেল, অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, আরে জহুর যে! তুমি এখানে!

হ্যাঁ আমি! তুমি ভুত দেখলে বলে মনে হচ্ছে যেন।

তা ভূতের মতই হয়েছ দেখছি! কতদিন এসেছ দেশ থেকে?

জহুর পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, তা' শুনে তোমার কী দরকার?

মরিয়ম থমকে গেল মুহূর্তের জন্য। তারপর মুখে হাসি এনে বলল. পয়সা হয়েছে বলে আর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে নেই বুঝি!

তুমি কোথায় লুকিয়েছ, কী ক'রে খুঁজে বেড়াব আমি। তাছাড়া আমার সময়ও ছিল না! খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকতে হবে তো! আর পয়সার কথা বলছ, যন্ত্রপাতিগুলা আমি বিক্রি করে দিলাম পানির দামে।

জহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার সত্যি কষ্ট হল মরিয়মের। সে তো জানত কী অভাবের মধ্যেও জহুর যন্ত্রগুলো আঁকড়ে ছিল।

জহুর জিজ্ঞাসা করল, চা খাবে এক কাপ, বানিয়ে দেব?

না, দরকার নেই।

আচ্ছা, তুমি কেন একটা ঘর ভাড়া নিয়ে দোকান কর না।

করার চেষ্টা করব এইবার। কিন্তু কী করতে হবে-না-হবে সে তোমার কাছ থেকে শোনবার দরকার নেই আমার! তোমার হাতে ওগুলো কি?

একখানা ছোট কাগজ বের করে দিল মরিয়ম। চোখ বুলিয়ে নিয়ে জহুর বলল, এ যে দেখছি রোগের ফিরিস্তি। কারো টি-বি, কারো গ্যাসট্রিক আলসার, কারো প্লুরাইটিস, কারো জনডিস, কারো হাঁপানি, টনসিলাইটিস, অর্শ, হার্টডিজিজ, কালাজ্বর, ক্রনিক কোলাইটিস, ফাইলেরিয়া, টিউমার। এক এক জনের এক এক রোগ! তোমাদের বন্দীরা দেখছি দুনিয়াশুদ্ধ রোগের ডিপো। লোকগুলো এভাবে প্রাণ দেয় কেন, আমি কিছুই বুঝি না।

বুঝে তোমার দরকারও নেই, যা করছ তাই করো।

আহা, চটছ কেন। ক'দিন ধরেই দেয়ালের গায়ে দেখছি তোমাদের বন্দী মুক্তি! কিন্তু ওভাবে কাগজ লাগালেই কি ছাড়বে ওদের? আমার তো মনে হয় না। লোকগুলো সব মরবে। কিছুতেই কিচ্ছু হবে না, আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম।

বেশ করেছিলে, এখন আমি চলি।

পিছন থেকে জহুর কী একটা বলল, মরিয়মের কানে গেল না, এদিক ওদিক তাকিয়ে সে চলতে লাগল ওয়াগনগুলোর দিকে।

অন্ধকারই তার পক্ষে ভালো। কিন্তু এখানে মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে হয় স্লীপারে। চিনতে না পেরে কেউ কেউ ডেকে বসে অশ্লীলভাবে। সেটা খারাপ লাগলেও বিপদের ভয় নেই এখানে, মানুষ তাকে চেনে।

একটা ওয়াগনে উঠে এল সে। এখানে আফসরী মা-বোনকে নিয়ে থাকে। একজন গ্যাংম্যানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার। পাঁকের পঙ্কজ অকালে না ঝরে ফুটে উঠে দেড় বছরেরটি হয়ে আলো করে আছে মায়ের কোল।

অন্যদিন মরিয়ম এলে সাদর অভ্যর্থনা জানায় আফসরী, আজ উঠেও এলো না কথাও বলল না, মুখ গোমড়া করে বসে রইল তাকে দেখে।

আফসরীর ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তার বোন আজগরী চামচ

দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিল, মরিয়মকে দেখে হাসিমুখে বলল, আপা, আজ একটা ভালো খবর আছে।

কিন্তু আফসরীর কি হয়েছে আজগরী?

এই দেখ কী হয়েছে, বলে আজগরী তুলে ধরল আফসরীর পিঠের কাপড়। সারা পিঠে কালশিরা, মাঝে মাঝে চাকা চাকা ক্ষতের চিহ্ন।

কে মেরেছে, তৈয়েব?

হ্যাঁ দুলাভাই, সেই জানোয়ারটা।

কেন, কী হয়েছিল।

একটু দ্বিধাভরে আজগরী জবাব দিল বুবু তাকে দোয়া-ভিজানো পানি খেতে দিয়েছিল। টের পেয়ে গিয়েই মুস্কিল হল।

দ্বিগুণ বিস্মিত হয়ে মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, কেন।

আজগরী মুখ লাল করে বলল, দুলাভাই কোথায় বাইরে বাইরে ঘোরে, আপার দিকে একদম নজর দেয় না, পয়সাকড়ি উড়িয়ে দেয়।

মরিয়ম নিজেই যেন মরমে ম'রে গেল। স্বামী বশ করতে তৈয়েবকে মন্ত্রপূত জল খাইয়েছে আফসরী!

আজগরী বোনের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করল, মরিয়ম আপা, বুবুর কোনো দোষ নেই, মাকে খুশী করার জন্যই বুবুর এই হাল। নইলে বুবু এসব বিশ্বাস করে না।

আম্মা এবার ক্ষীণকণ্ঠে বাধা দিল, খোদার কালামকে অবিশ্বাস করিসনে আজগরী। গুনাহ হয়।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল আফসরী, এবার মাকে বলল, দেখ আম্মা ইচ্ছা না থাকলে দুনিয়ায় কেউ কারো বশ হয় না। শুধু পরকে দিয়ে কেন, নিজেকে দিয়েও কি তা বুঝিনে?

মরিয়ম আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাল, কী বলতে চায় আফসরী!

জিজ্ঞাসা করল, তুমি না একটা ভালো খবরের কথা বলছিলে আজ-গরী? কী ভালো খবর বল তো শুনি।

জানো আপা, মানু মিঞা বলে একজন লোক আমাদের সেলাইয়ের সেণ্টারে তার সিঙ্গার মেসিনটা দান করে গেছে! এবার আমাদের খুব সুবিধে হল, না আপা?

মরিয়ম অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল, সিঙ্গার মেসিন! আশ্চর্য। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল, মানু মিঞা জানে আমি এর মধ্যে আছি ?

এবার হেসে উত্তর দিল আফসরী, কেন জানবে না আপা, তলে তলে সবাই সব কথা জানে।

মরিয়ম চুপ ক'রে বসে রইল। পুরনো দিনের বহু কথাই মনে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে মনে মনে বলল, এ জগতে মানুষকে চেনা দায়।

ক্রমে আশপাশ থেকে আরো কতকগুলি মেয়েপুরুষ এসে জমা হল, ফরিদের মা এলো দুই নাতিনাতনিকে সঙ্গে করে। ফরিদের গ্রেপ্তারের পর কী ক'রে যে বুড়ি চালিয়েছে নিজেই বলতে পারবে না হয়ত। পরের বাড়ীতে কাজ করতে গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দু'টো ছেলেমেয়ে।

ফরিদের মা বলল, আমি যাই কাজে, আর এই দুইজন দুইদিকে দুই বরকন্দাজ হয়ে যায় আমার সঙ্গে। আমি তো এক বুড়ি, আমাকে অত পাহারা দেওয়ার কী দরকার।

হেসে ফেলল সবাই। ফরিদের মার রহস্যপ্রিয়তা ঘুচবার নয়।

মরিয়ম আশ্বাস দিল, হবে হবে, ওদের লেখাপড়ার একটা বন্দোবস্ত আমরা করবই।

বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু হারামখোররা কি ছাড়বে না কাউকেই ?

কেন ছাড়বে না, চেষ্টা করলে নিশ্চয় ছাড়বে।

কোত্থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এল সাবু। দম নিয়ে বলল, আপা ভালো খবর আছে। আজাহারকে ছেড়ে দিয়েছে! বজলুস সাত্তার আর হবিবুরও ছাড়া পেয়েছে! বজলুস সাত্তার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমাদের বাড়ী গিয়ে বসে আছে।

গোলাম মওলার সঙ্গে কথা হওয়ার পর বজলুস সাত্তারের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছিল মরিয়ম।

হাতের কাগজগুলো নামিয়ে রেখে মরিয়ম বলল, আফসরী, এর মধ্যে কিছু পোস্টার আর ইস্তাহার আছে।

সাব্‌র সঙ্গে মরিয়ম গিয়ে উপস্থিত হল ন্‌র মহম্মদের বাড়ী। বজল্‌স সাত্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মা আগে আমি জানতাম না তুমি আনিস সাহেবের বৌ।

আগে জানলেই বা কী হ'ত ভেবে পেল না মরিয়ম।

বজল্‌স সাত্তার বললেন, জেলে গিয়ে ও'র সঙ্গে আলাপ হ'ল, ভারী চমৎকার মান্‌ষ! আরো অনেকের সঙ্গেই আলাপ হ'ল। দ্‌ইদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, কিন্তু আমার মন পড়ে রয়েছে সেই পিছনেই। কিছ্‌তেই ভুলতে পারছিনে তাদের ম্‌খগ্‌লো। কিন্তু কী করা যাবে ভেবে পাচ্ছি না।

মরিয়ম ম্‌দ্‌স্বরে জানাল, কিছ্‌ আন্দোলন স্‌র্‌ হয়েছে এখানে। এখন আপনারা ছাড়া পেয়ে এসেছেন, নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন।

বজল্‌স সাত্তার একট্‌ ভেবে বললেন, কাঞ্চনও ছাড়া পেয়েছে, ও দ্‌ই এক দিনের মধ্যে বাড়ী আসবে, দেখি ও কি বলে। দেখছি তো ছেলে-ছোকরারাই আজকাল আমাদের চেয়ে বেশী বোঝে।

কয়েকদিন পর কাঞ্চন ফিরে এলে তারই উৎসাহে এক বৈঠক ডাকা হ'ল বজল্‌স সাত্তারের বাড়ীতে। সবাইকে খবর দিল এরসাদ।

শেষ পর্যন্ত এসে জ্‌টল ওদিক থেকে হবিব্‌র এবং তাদের দলের কয়েকজন, এদিক থেকে আজাহার, আজিজ, মতিউর, তোহা, সাব্‌, কাঞ্চন এবং এরসাদ। বজল্‌স সাত্তারের বাড়ীতে প্‌লিশের দ্‌ষ্টি নেই দেখে গোলাম মওলার কথামত মরিয়মও গিয়ে উপস্থিত হল।

প্রথমেই হবিব্‌র সোজাস্‌জি আপত্তি ক'রে বসল, না সমস্ত রাজবন্দীর ম্‌ক্তির কথা এখানে উঠতেই পারে না। আমরা শ্‌ধ্‌ তাদেরই ম্‌ক্তির কথা বলব যারা বন্দী হয়েছে ভাষা আন্দোলনে। তাদের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক। অন্যরা জেলে গিয়েছে ভিন্ন কারণে।

এমন কথা যে উঠতে পারে মরিয়মের তা আগে কল্পনারও অতীত ছিল।

এরসাদ বলল, আচ্ছা হবিব্‌র সাহেব এভাবে ভাগ ভাগ ক'রে বন্দী

মুক্তি আন্দোলন করলে কি আপনি সত্যি মনে করেন মানুষকে কখনো উৎসাহিত করা যাবে। আমি যতদূর জানি আপনার দলের নেতারাও এমন কথা বলেন নি।

হবিবুর জবাব দিল, সে যাই হোক, আপনারা আন্দোলন করুন, আমার সহানুভূতি রইল, কিন্তু আমি এর মধ্যে থাকতে পারব না।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা হবিবুর সাহেব, লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যারা সর্বপ্রথম দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানে এবং যাদের উপর সর্ব-প্রথম নেমে আসে সরকারী জুলুম, তাদের বাদ দিলে কখনো সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে পারবেন?

সে যাই হোক, পাকিস্তানে আমি কমিউনিজম চাই না!

বজলুস সাত্তার এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, এবার বললেন, দেখুন হবিবুর সাহেব, আমি মাষ্টার মানুষ, অনুমতি করেন তো আমি একটা কথা বলি। ছেলেদের আমি যখন কবি মিল্টনের কবিতা পড়াই তখন অনেক সময় মনে আমার কষ্ট হয় এই কথা ভেবে যে, দুনিয়ার সমস্ত রূপের পূজারী যে কবি, সেই হল অন্ধ! শুনেছি সুরের রাজা বেটো-ফেনও শেষ বয়সে হয়ে গিয়েছিলেন কালা! তেমনি কদিন জেলে গিয়ে দেখে এলাম পাকিস্তানের সবচেয়ে স্বাধীনচেতা মুক্ত মানুষগুলিই হয়ে আছে বন্দী! তাদের কোনো পার্টি নেই, দল নেই, আমি দেখেছি তারা সবাই চায় মানুষের স্বাধীনতা। তারা সবাই বেরিয়ে না এলে দেশের স্বাধীনতা কী ক'রে থাকবে বলুন তো!

মরিয়মের চোখে প্রায় পানি এসে পড়েছিল। কিন্তু হবিবুর বলল, আপনার কথাগুলো ভালো। তবে আমি মানতে পারছি না সেই আমার দুঃখ। আজকের মত উঠি তা'হলে!

সত্যি সত্যি হবিবুর উঠে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল তার দলের কয়েকজন। তবে তার দলের দু'একজন তখনো রইল বসে।

কাঞ্চন তপ্ত হয়ে বলল, চিরকাল উনি তো করে এসেছেন আনসার বাহিনী, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত সে তো জানা কথা।

বজলুস সাত্তার বাধা দিলেন, ছিঃ মানুষকে গালাগালি দিয়ো না। যারা তোমাদের কথা বোঝে না তাদের বুঝিয়ে না আনতে পারলে কাজ

করবে কী ক'রে।

তাই বলে সবলোক ভালো হয় না বাপজান!

কিন্তু ভালো ক'রে চেষ্টা না ক'রেই মন্দ বলবে?

সভা ভঙ্গের পর বজলুস সাত্তার মরিয়মকে খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। মরিয়মের ইতস্তত ভাব দেখে কাঞ্চন বলল, আপনার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথাও আছে॥

মতিউরকে পাশে ডেকে মরিয়ম বলল, বৌকে বলবেন আমার ফিরতে একটু রাত হবে। খেয়ে নিয়ে যেন শুয়ে পড়ে।

সবাই চলে গেলে একটা ঝাড়ু এনে ঘরখানা ঝাঁট দিতে লাগল মরিয়ম। কাঞ্চন বাধা দিল, আপনি বসুন, অন্যলোক পরিষ্কার করবে।

মরিয়ম হেসে ফেলল, এতদিন তো ক'রে এসেছি! কোনো কাজেই কোনো দোষ নেই। দেখছেন না জুতোর ধুলোয় নোংরা হয়েছে কী রকম।

কাঞ্চন যাই বলুক কাঞ্চনের মা কিন্তু খেতে রাজী হল না একসঙ্গে বসে। সে খাটের উপর থেকে উঠলই না স্বামী ছেলের কাণ্ড দেখে। ক্ষতিপূরণের জন্য কাঞ্চন বলল, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি!

না আমি একাই যেতে পারব, আমার অভ্যেস আছে।

তবু কাঞ্চন নাছোড়বান্দা। যেতে যেতে বলল, দেখুন জেলের মত জায়গা নেই। শিক্ষা পেতে হলে আপনারও একবার জেলে যাওয়া দরকার।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। এই তিন মাসে জেলের মধ্যে যা শিখেছি তার তুলনা নেই। গবর্ণমেণ্ট চায় একরকম, হয় অন্যরকম। জেলের মধ্যে কত যে কনভার্ট হয়েছে তার কি ইয়ত্তা আছে!

মরিয়ম রিভার্ট জানত, কিন্তু কনভার্ট নামক ইংরেজী শব্দটা তার জানা ছিল না, কাজেই সে চুপ করে রইল! এইবার কাঞ্চন আসল কথায় এল। জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপা আপনাকে একটা কথা বলব?

আপা সম্বোধনে খুশী হয়ে মরিয়ম বলল, বলব বলব না ক'রে বলেই ফেলনা ভাই।

আপা, শ্রমিকদের জীবন আমার ভারী জানতে ইচ্ছে করে। কী ভাবে থাকে, কী তারা চিন্তা করে। আপনার তো জানাশোনা আছে, আমাকে নিয়ে যাবেন আপা? তারাই তো এ যুগের অগ্রদূত।

মরিয়মের কেমন হাসি পেল। এ যেন নতুন ভাঁজভাঙ্গা কাপড়ের গন্ধ। এ ধরনের উচ্ছ্বাস সে আগে দেখেনি কারো মধ্যে। হাসি পেল, আবার ভালো লাগল। কাঞ্চনের নতুন যাত্রাপথে নতুন মনের যে সুরভি প্রকাশ পাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এতে কেমন যেন একটা সজীবতার ছোঁয়াচ লাগে প্রাণে।

মরিয়ম উত্তর দিল, ওদের জানতে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই জানতে পারবে। সে জন্য ইউনিয়ন অফিসটা প্রথম খোলা দরকার! কি বলো? সাবু আছে, তোহা আছেন, আজিজও রয়েছেন, তুমি এসে লাগো না একটু ভাই!

হঠাৎ কাঞ্চন বলল, ও একটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম! হাসমতের আপনি খালা। আমার সঙ্গে পড়ত, আবার জেলেও ছিলাম এক সঙ্গে। জানেন, ও আগে ছাড়া পায়? কপাল ভালো, এয়ারফোর্সের চাকরীটা ওর যায়নি, হাজার হাজার লোক জেলে গেছে, ওরা টের পাবে কী ক'রে। যেদিন চলে গেল সেদিনই আমি বেরিয়েছি। আপনাকে ও খবর দিতে বলে গেছে। উঃ ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে!

হাসমতের খবর পেয়ে মরিয়ম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কাঞ্চনকে থামিয়ে বলল, আমরা প্রায় এসে পড়েছি। তুমি এবার এস ভাই।

আরো অনেক কথা বলার ইচ্ছা দমন ক'রে ফিরে গেল কাঞ্চন।

সব কথা শুনে গোলাম মওলা বললেন, এবার বন্দী মুক্তির সভায় তোমাকে বক্তৃতা দিতেই হবে। লোকের মধ্যে নতুন চিন্তার স্রোত বইছে, পুলিশ গ্রেপ্তার করলে ক্ষতি নেই। তুমি বক্তৃতা করলে রেলের লোকেদের মধ্যে আলোড়ন জাগবে।

মরিয়ম ভীত হয়ে বলল, মাগো, সে আমি কিছুতেই পারব না।

কেন স্টেশনে বলতে তো তোমার আটকায় নি!

কিন্তু সে ছিল ভিন্ন ব্যাপার।

তা হোক, তোমাকে বলতেই হবে। তুমি বলবে তোমার নিজের জীবনের কথা! তুমি বলবে কী ভাবে ওরা তোমার সংসারকে ধ্বংস করেছে, কী ভাবে তুমি দিন কাটিয়েছ, নইলে লোক বিচলিত হবে কেন? একজন মজুরের স্ত্রী হিসাবে বলবে তুমি। .

এতে মরিয়ম ভয় পেয়ে গেল আরো বেশী। কিন্তু না পারল গোলাম মণ্ডলার যুক্তি খণ্ডন করতে, না পেল অন্য কোনো পরিত্রাণের উপায়। শুধু তার মন বলছে, এ আমি কিছুতেই পারব না!

এই রকম কথাবার্তার কয়েক দিন পর পুলিশ গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল এরসাদকে।

রেল কলোনীর মাঠে ডাকা হয়েছিল সভা। এ সময়টাতে পূর্ববঙ্গে বিরোধীপক্ষ প্রায় যে কোন সভা ডাকলেই জমা হত হাজার হাজার লোক। এখানেও সামান্য মাত্র প্রচারে ভৌতিক কাণ্ডের মত এসে জুটল হাজার পনের লোক। এত লোক দেখে সব চেয়ে লোকেরাই হল বেশী বিস্মিত! নিজেরাও তারা জানত না নিজেদের মনে কোথা দিয়ে কী হয়ে গেছে। বক্তার চেয়ে তারা তাই চেয়ে রইল নিজেদের দিকেই বেশী।

রোদের তেজ কমে এসেছে। ঘাসের উপর ঠাসাঠাসি ক'রে বসা লোকগুলোর মুখের উপর তাপহীন আলো পড়েছে পাতলা আস্তরণের মত। পাশের নারকেল গাছগুলোর পাতা কাঁপছে মৃদু বাতাসে। আরো বহুদূরে আকাশে সাদা পেঁজা তুলোর মত খণ্ডখণ্ড মেঘের পাশ দিয়ে উড়ে চলেছে একের পর একটি পাখীর ঝাঁক। কিন্তু মরিয়ম না দেখছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য, না শুনছিল কোনো বক্তার বক্তৃতা। নিজের আসন্ন পরীক্ষার ভয়ে স্নায়ুগুলো অত্যধিক উত্তেজনায় বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। অবশেষে তার নাম ডাকা হ'ল! কী এক সম্মোহনের মধ্যে দিয়ে যেন সে চলেছে। রুক্ষ চুলগুলির উপর ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছে সে স্বাভাবিকভাবেই, শরীরও যে খুব কাঁপছে তা নয়, কিন্তু গলার স্বর বেরুচ্ছে না কিছুতেই। হঠাৎ তার কানে এল, আনিস আহম্মদের মুক্তি চাই! রেল শ্রমিকের নেতা আনিস আহম্মদের মুক্তি চাই! কে শ্লোগান দিচ্ছে? জহুর! জহুর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, আনিস আহম্মদের

মুক্তি চাই! যে জহুর গ্যাসের আলোয় একদিন মরিয়মকে মনের কী কথা বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গিয়েছিল! সেই জহুর আজ আনিসের মুক্তি চাইছে! তারপর কে? কাঞ্চন! তারপর আরো অনেকে। মরিয়মের কণ্ঠ থেকে আচমকা মুক্তি পেল আরো গুটি কয়েক নাম। খলিলুর রহমানের মুক্তি চাই! আলি ইব্রাহিমের মুক্তি চাই, ফরিদ হোসেনের মুক্তি চাই! নারায়ণ ব্যানার্জির মুক্তি চাই! আওলাদ হোসেনের মুক্তি চাই! এরসাদ আলীর মুক্তি চাই! মহম্মদ মকসুদের মুক্তি চাই! সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি চাই! তারপর মরিয়ম কী বলেছে, পরে তা কোনদিনই স্মরণ করতে পারে নি।

সভায় যথেষ্ট পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, সোনাউল্লাও অনুপস্থিত ছিল না, কিন্তু কি ভেবে যে তারা মরিয়মকে ছেড়ে দিল তারাই জানে।

রাস্তার পাশে জহুর দাঁড়িয়েছিল মরিয়মের প্রতীক্ষায়। কাছাকাছি আসতেই এগিয়ে গিয়ে বলল, ভাবী, তুমি কি সুন্দর বক্তৃতা করতে পারো। আনিস ভাই নিশ্চয়ই খালাস পাবে কি বল।

মরিয়ম একটু দম নিয়ে মুচকে হেসে জবাব দিল, তা আমি কি ক'রে জানব বল।

না তুমি দেখো নিশ্চয় ছাড়া পাবে। এতলোক যখন দাবি করছে, অগ্রাহ্য করলেই হ'ল! না, এখন আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে!

হাঁটতে হাঁটতে মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, খুশীর চিঠিপত্র পাও?

পাই না আবার! প্রায়ই তো আসে!

আমার কথা কিছু লেখে?

ওরে বাপরে, প্রত্যেক চিঠিতে! কত কথা জানতে চায়, আর এখানে আসার জন্য পাগল।

আর তুমি না আনার জন্য কোমর বেঁধেছ!

না, আপা, শিগগীরই নিয়ে আসব, তা যা থাকে বরাতে। অবস্থা এর চেয়ে ভালো হওয়ার আশা ক'রে লাভ নেই।

জহুরের নতুন দোকানের সামনে এসে মরিয়ম বলল, দাও আজ এক কাপ চা খেয়ে যাই।

২৩

নির্বাচনের মাত্র দুই তিন সপ্তাহ আগে

কৃষ্ণপক্ষের রাত। সন্ধ্যা হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। বারান্দায় লণ্ঠনের সামনে বসে মতিউরের ছেলেমেয়েগুলি মায়ের ঠেঙ্গানির ভয়ে বেশ কলরব সহকারে পাঠে অমনোযোগীতা দূর করার চেষ্টায় রত ছিল। উঠোনে একটি ছায়ামূর্তি এসে ডাকল, খোকা শুনে যাও।

অনেকগুলি খোকা ছিল, সকলেই পড়া থামিয়ে ফেলল সানন্দে। একজন বসে বসেই মাকে ডাক ছাড়ল, মা কে একটা লোক এসেছে!

মরিয়ম রান্নাঘরে ছিল, সেখান থেকে সাড়া দিল, দাঁড়াতে বল!

চেরগাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল মরিয়ম, জিজ্ঞাসা করল, কে? কাকে চান আপনি?

ছায়ামূর্তি আরো একটু এগিয়ে এল কিন্তু জবাব দিল না।

মরিয়ম চেরাগটা উঁচু ক'রে ধরে চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন করে আবার প্রশ্ন করল, কে আপনি?

উত্তর এল, আমি!

গলার স্বর শুনে আনিসকে ঠাহর করা মাত্র মরিয়মের কম্পিত হাত থেকে পড়ে গেল চেরাগটা। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মরিয়ম, না ছুটে যেতে পারল আনিসের বুকে, না তুলতে পারল চেরাগটা।

দু'জনে উঠোনের প্রায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক। সময়ের দিক থেকে হয়ত তার পরিমাণ অতি সামান্য। জীবনের এমন এক একটি মুহূর্ত আসে যখন পরস্পরকে দেখার জন্য দু'টি মাত্র চক্ষুকেই যথেষ্ট বলে মনে হয় না, সহস্র চক্ষুর শক্তির জন্য আঁকুপাঁকু করে মন। কিন্তু মরিয়মের দু'টো চোখেও হারিয়ে গেছে দেখার ক্ষমতা, কখন ভ'রে গেছে অশ্রুজলে। হাতের প্রদীপ নিবেছে তারো আগে। শুধু মাথার উপর স্বচ্ছ আকাশে জেগে আছে লক্ষ কোটি যোজন দূরের তারাগুলি, ওরা বুঝি শূন্য আকাশের লক্ষ লক্ষ চোখ। সূর্য যেন নিজে দেখে না, মানুষকে দেখতে সাহায্য করে আলো দিয়ে। কিন্তু তারারা যেন দেখায় না, নিজেরা দেখে। বহুকালের বহু নরনারীর মত আনিস আর মরিয়মের উপরও তারা মিটিমিটি চাউনির স্নিগ্ধ স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিল।

পকেট হাতড়িয়ে দেশলাইটি বের করে কাঠি জ্বালল আনিস। উবু হয়ে চেরাগটি নিয়ে হাতে কেরোসিন তেল মেখে গেঁথে সলতেয় ধরিয়ে দিল আগুন।

মাটি থেকে মরিয়ম হাত বাড়িয়ে তুলে নিল আলো।

তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি, বলে মরিয়ম ঘরে গেল। মতি-উরের বৌকে বলল, বৌ আমি এখন বেরুচ্ছি, রাত্রে হয়ত ফিরব না।

আপা, খেয়ে দেয়ে যাও।

একটা মানুষ এসেছে জরুরী খবর নিয়ে. এক্ষুনি যেতে হবে।

তোমাদের লোকেরও বলিহারি আপা, রাতবিরেত নেই, যখন তখন এসে হামলা করে, একটা মানুষের শরীরে কতটা সয় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

মরিয়ম হেসে ফেলল, কী করি বল, মানুষ এলে যেতেই হয়!

ঘর থেকে বেরিয়ে আনিসের কাছে এসে ডাক দিল, এস।

ডাক দিল বটে, কিন্তু যাবে কোথায়। পথে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, তুমি খোঁজ পেলে কী করে!

আজিজের কাছ থেকে। বাসায় গিয়েছিলাম যে!

বাসা! দীর্ঘশ্বাস চাপল মরিয়ম। সঙ্কুচিত হয়ে বলল, কোথাও যে নিরিবিলি বসব তার উপায় নেই!

আনিস হাসল, বলল, এমনি ক'রে রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘোরাই যাক না! আমার ভালো লাগছে।

কোথাও তেমন মাঠ নেই, থাকলেও এমন ঘাস নেই যে মানুষ একটু বসতে পারে। পথ নির্জন, আলো কম। দুই একজন লোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েও দেখে গেল।

ছাড়া পেয়েছে আরো অনেকে—কোরবান, ইব্রাহিম, ফরিদ, খলিল, আজিমুদ্দী, মকসুদ, এরসাদ, যোগেন গাঙ্গুলি, সুলতান, নারায়ণ। কিন্তু আওলাদকে ছাড়েনি। কেন তার উপর রাগ কে জানে, হয়ত ওদের খেয়াল খুশী।

খানিক পরে আনিস বলল, চল তোমাকে পোঁছে দিয়ে আসি। আজকের রাতটা না হয় আমি ওয়াগনে গিয়েই কাটিয়ে দিই।

মরিয়ম মৃদুস্বরে জবাব দিল, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে

পারব না, দরকার হলে দু'জনেই ওয়াগনে গিয়ে বসে থাকব।

কথা বলতে বলতে তারা কখন পুরোনো বাসার কাছে এসে পড়েছে। আনিস জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ইউনুস একটা রাত্রির জন্য জায়গা দেবে না।

দেবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ওদের আমি কোনো কথা বলতে পারব না।

কেন বলো তো!

আমার ভয়ানক লজ্জা করবে।

বাধা দেওয়ার আগেই আনিস ঢুকে পড়ল ঐ বাড়িটার মধ্যে। সরাসরি উঠে গেল বারান্দায়। ডাক দিল, হালিমা আপা!

কে?

বেরিয়ে এসে আনিসকে দেখে হালিমা প্রায় দিশেহারা হয়ে বলল, আনিস! তুমি! কখন এলে!

আজই!

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে হালিমা জিজ্ঞাসা করল, বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

পিছনে অন্ধকারের দিকে আঙুল বাড়িয়ে আনিস জবাব দিল, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

লণ্ঠনটা হাতে তুলে হালিমা এগিয়ে গেল, ডাকল, মরিয়ম, এদিকে আয়! দেখ তো কাণ্ড, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে! তোকে নিয়ে আর পারি নে!

মরিয়মকে প্রায় টেনে এনে হালিমা বসাল নিজের ঘরে। তারপর অভিযোগ করল, তোর তো আজকাল দেখা পাওয়াই ভার। সারা মুল্লুক ঘুরিস, আর, এখানে আসতে নেই। আচ্ছা, তোরা দু'টিতে একটু বস, আমি আসছি।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল হালিমা।

সে রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার ঝঞ্ঝাট চুকে গেলে আনিস পরের বাড়ীতে পরের বিছানায় শুয়ে পরের বালিসে মাথা দিয়ে বলল, তোমার এমনি ভাবেই দিন কেটেছে! বলবে না আমাকে সে সব কথা!

মরিয়ম একটু হাসল, সে কী মানুষ ইচ্ছে করলেই বলতে পারে! মানুষ কি নিজেই জানে কী ভাবে তার দিন কাটে।

আনিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, মরিয়ম, জেলের মধ্যে তোমার বাপের সেই চিঠি পেয়ে আমার কী যে হয়েছিল সে আমিই জানি।

থাক ও সব কথা।

থাকবে কেন, জানো মরিয়ম, আমাদের কয়েকজন কৃষক কমরেডের বৌ না খেতে পেয়ে ভিক্ষে করেছে, ভিক্ষে করেও বাঁচেনি। আবার কারো কারো বিয়ে হয়ে গেছে অন্য জায়গায়। সেই সব কমরেডের মুখের চেহারা দেখে আমি তবু একটু দুঃখ ভুলতে পারতাম। জানো মরিয়ম, তবু ওরা কেউ বন্ড দেয় নি!

থাক বাহাদুরীতে আর কাজ নেই! এখন ঘুমিয়ে পড়। পাশের ঘরের ওরা এত রাত্রিতে কথা বলতে শুনলে কি ভাববে!

কিছু ভাববে না, খুব খুশী হবে!

মরিয়মকে টেনে নিয়ে চুম্বন করতে গিয়ে আনিস থেমে গেল, বলল, তুমি কী কাবুই না হয়েছ!

আর তুমি বুঝি খুব ভালো আছ। তোমার মাথার চুল পেকেছে! আমি আস্তে আস্তে তুলে দেব, কেমন?

আবার আনিসের বুক খালি ক'রে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, কী হ'ল!

মরিয়ম, আমি তোমাকে পাশে পেয়েছি, তা হোক না পরের বাড়ী, হোক না মাথার পাকা চুল, হোক না বসে যাওয়া গাল, কিন্তু ইব্রাহিম খলিল ফরিদের কী আছে! ওদের কেউ নেই, অথচ তিনটি বছর আমরা কাটিয়েছি একসঙ্গে!

অসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল মরিয়ম, কোনো কথাই তার মুখ দিয়ে বের হ'ল না।

আনিসই আবার কথা বলল, আর আমাদের সেই আওলাদ, সে পড়ে রয়েছে জেলের মধ্যে এখন প্রায় একা একা।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ দুরন্ত কান্নার আবেগে ফুঁপিয়ে উঠল মরিয়ম।

আনিস দিশাহারা হয়ে প্রশ্ন করল, কী হল!

না, কিছুই হয়নি! তুমি এতক্ষণের মধ্যে একবারও আমাকে সোনার

কথা জিজ্ঞাসা করলে না!

কোনোই জবাব দিল না আনিস। অন্ধকারে শুধু বন্ধ করল দু'টো চোখ।

সাড়াশব্দ না পেয়ে মরিয়মের ডান হাতের আঙুলগুলো নেমে এল আনিসের চোখের পাতার উপর। মরিয়ম জানত আনিস কাঁদছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল। তবু কান্না থামে না।

উঠে বসল মরিয়ম। তারপর আনিসের পায়ের উপর নত হয়ে পড়ল। যে জায়গায় গুলি লেগেছিল সেই ক্ষতস্থানে চুমু খেল।

আনিস ওকে টেনে নিল বুকের মধ্যে।

মরিয়ম ফিস ফিস করে বলল, তুমি ইব্রাহিমের কথা বলছিলে না! আমার মনে হয় ওর উপর থেকে আফসরীর টান এখনো যায়নি! ওকেই আফসরীর বিয়ে করা উচিত।

কী বলছ তুমি! শুনেছি তার বিয়ে হয়ে গেছে!

কিন্তু যাকে ভালবাসে না তার সঙ্গে একটা মেয়ে থাকবে কেন?

আনিসের মুখে জবাব এসেছিল, তা'হলে বিয়ে করতে গেল কেন, কিন্তু সেটা চেপে গেল সে। যাকে যে ভালাবাসে না, তার সঙ্গে তাকে থাকতে বলা অসম্ভব, বিশেষত আজ রাত্রিতে এবং মরিয়মের কাছে!

মরিয়মই আবার মুখ খুলল, দেখো আমার মনে হয়, ফরিদের সঙ্গে আজগরীর বিয়ে দেওয়া যায়! বেশ মানাবে কিন্তু। আর ফরিদের ছেলেমেয়েকে ও ভালবাসে খুব।

আনিস হেসে চুমু খেল মরিয়মের ওষ্ঠে, এবার থামাও তো তোমার ঘটকালি। একটা রাত্রি পার হ'তে দাও।

কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল রাত।

ভোরের পাখী ডেকে উঠল। আলো এসে পড়ল ঘরে। মরিয়মকে উঠতে বাধা দিয়ে আনিস বলল, আর একটু থাকো।

তারপর দেয়ালের দিকে চোখ পড়তেই ধড়মড় করে উঠে বসল, মরিয়ম আমাদের সেই বিয়ের আয়নাটা না!

হ্যাঁ। একমাত্র ঐ জিনিসটাই আছে।

দু'জনে উঠে গেল আয়নাটার কাছে। দু'জনের মুখের প্রতিবিম্ব

পড়ল ওটার মধ্যে। মরিয়ম বলল, দেখ, মুখ না থাকলে আয়নার মূল্য নেই। আমার মুখ এত দিন আমার কাছে ছিল না, আয়নার কথা মনেও পড়ে নি।

আনিস হেসে উঠল, বাঃ কথা বলতে শিখেছ তো বেশ! কিন্তু কাঁচের আয়নায় কতটুকু দেখা যায় মরিয়ম! তোমার মনের আয়নাখানা আমাকে দিতে পারো। রোজ নিজের মুখ দেখব।

তুমিও তো কম কথা বলতে শেখনি আনিস।

নাম ধরে ডাকা মরিয়মের মুখে এই প্রথম। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সে। আনিস ওকে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল, তোমাকে অনেকদিন কাছছাড়া করতে পারব না আমি।

আমিও না!

সকালে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে এসে হালিমাও ওদের কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, দ্যাখ আনিস, কয়দিন তুইও একটু ঘরে থাক, ওকেও একটু বিশ্রাম করতে দে। নতুন বাসাটাসা না করা পর্যন্ত তোদের এখানে থাকতে বলেছে ইউনুস। আর যে কয়দিন পারিস একটু ভালো খেয়ে দেয়ে নে।

আনিসের বলতে ইচ্ছে হল, আপা, তুমি আমার আর জন্মের বড় বোন ছিলে! কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে হালকা সুরে বলল, বাঃ খাসা ব্যবস্থা! এমন হ'লে আমি বার বার জেলে যেতে রাজি আছি আপা!

অলক্ষুণে কথা বলিস নে।

কার গলা শোনা গেল, এখানে আনিস সাহেব আছেন?

হালিমা এগিয়ে গিয়ে বলল, আছে কিন্তু আপনি কে?

আমার নাম কাঞ্চন। উঃ ঘুরে ঘুরে হয়রান! ভাবছি লোকটা গেল কোথায়!

আনিস বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওদিকে কাঞ্চনের পিছু পিছু বাড়ীতে এসে ঢুকল জহুর, সাবু, মতিউর এবং তোহা।

মতিউর অভিযোগ করল, আচ্ছা আপা তোমার কী কাণ্ড বলো তো! আমি বাড়ী আসতেই বৌ বলল, আপা এইমাত্র কার সঙ্গে বেরিয়ে গেল, রাত্রে নাও ফিরতে পারে! আমি তো ভেবে আকুল! আমার বাড়ীতে

কি জায়গা ছিল না, না কি! গরীবের কথা আর এখন মনে থাকবে কেন!

মরিয়ম দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল, মুখ নত করল শুধু।

কাঞ্চন দাবি করল, আনিস সাহেব আপনাকে এক্ষুনি ইউনিয়ন অফিসে যেতে হবে! লোকজন আসতে সুরু করেছে, আমরা মিছিল বের করব শুধু আপনাদের নিয়ে।

জহুর মরিয়মের দিকে তাকিয়ে বলল, আপা, আপনিও চলুন।

মরিয়ম মনে মনে বলল, মরে গেলেও না। মুখে কিছু উচ্চবাচ্য না ক'রে নিরুদ্দেশ হ'ল ঘরের মধ্যে।

অগত্যা আনিসকে নিয়ে ওরা সদলবলে পেঁাছল ইউনিয়ন অফিসে। ইব্রাহিম, ফরিদ, খলিল, আজিমুদ্দী, এরসাদ এবং সুলতান এসে গেছে আগেই। আসেনি শুধু মকসুদ এবং যোগেন গাঙ্গুলি, তারা বাড়ী চলে গেছে গতকাল স্টেশনে নেমেই।

গলায় ফুলের মালা, পাশে কয়েক শ' মানুষ, বাতাসে উড়ছে পতাকা, উপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ, বড় ভালো লাগছিল আনিসের। ইচ্ছে করছে কয়েকদিন শুধু মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে। সব কিছুই যেন তাজা তাজা, সব কিছুই কেমন নতুন নতুন ঠেকছে চোখে।

কোত্থেকে একটা লোক দৌড়ে এসে মিছিলের মধ্যে খবর দিল, এক-জন মজুর ওয়ার্কসপের মধ্যে হাতকাটা অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তাকে হাসপাতালে সরানো হয় নি, মজুরেরা কাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছে সেই সকাল থেকে।

আস্ত মিছিলটা চলল ওয়ার্কসপের দিকে।

এখানে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নেই। ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে হাসপাতালে পাঠানো হল।

আবার সেখানেও ফেলে রাখল কিছুক্ষণ। জালাল আহম্মদের চেম্বারে ঢুকে পড়ল আনিস। ডাক্তার তাকে দেখে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল, হ্যালো, আপনি! কবে এলেন!

ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে যখন আনিস বাড়ী ফিরল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

হালিমা রাগ ক'রে বলল, একদিনের জন্যও কি তোমরা সময় মত ফিরতে পার না! ওদিকে আর একজন একটু আগে বেরিয়েছেন কোথায়,

কারা সেলাই শেখে না কী পড়ে সেখানে।

ঠাণ্ডা ভাত-তরকারী গলাধঃকরণ ক'রে বিছানায় কাৎ হতেই আনিসের দুই চোখে জড়িয়ে এল ঘুম। কখন সন্ধ্যা উতরিয়ে গেছে, লণ্ঠন জেবলে টেবিলে রেখে হালিমা তার পায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকল, আনিস। দেখো আবার কে তোমার খোঁজে এসেছে।

স্কুলের ছাত্র বলেই মনে হল। আনিসের হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল, আপনাদের এক্ষুনি যেতে বলেছে।

আপনাদের তো হবে না ভাই, আমি মাত্র একা আছি!

তা'হলে আপনিই চলুন।

চিঠিখানা উল্টেপাল্টে আনিস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, গোলাম মওলাটি কে!

তা আমি জানি না। এক্ষুনি যেতে বলেছে।

গায়ে জামা চড়িয়ে বেরুতে যাবে এমন সময় হালিমার কণ্ঠস্বর কানে এল, আবার কোথায় বেরুনো হচ্ছে শুনি!

আপা, সামান্য একটু ঘুরে আসছি।

যে বাড়ীতে গিয়ে আনিস উপস্থিত হল সেটা একেবারে শহরের শেষ প্রান্তে।

আনিসকে দেখে দু'বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন গোলাম মওলা, আর আনিস হেসে পিছিয়ে এলো দু'পা—মুরলীদা, আপনি! তাই তো বলি গোলাম মওলাটি কী বস্তু। উঃ, কতকাল পরে দেখা! সেই পাঁচ বছর আগে প্রসন্নদার সঙ্গে আপনি কোন সম্মেলনে যাচ্ছিলেন, তারপর আর দেখা হয়নি।

একে একে হাজির হল আরো কয়েকজন।

গোলাম মওলা বললেন, আমাদের এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে যুক্ত-ফ্রন্ট একজন অবাঙালীকে নমিনেশন দিয়েছে। কিন্তু বিপদ হয়েছে, যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ লোক সরাসরি যুক্তফ্রন্টের নির্দেশ অমান্য করেছে। নির্বাচনে জিততে না পারলে রেল শ্রমিকদের একটা বড় অংশের মধ্যে আসবে হতাশা, বাঙালী অবাঙালী বিভেদ যাবে বেড়ে, আর আমাদের ইউনিয়ন হয়ে যাবে টুকরো টুকরো। হাতে একদম সময় নেই, কাজ

ভাগাভাগি করে নেওয়া দরকার।

সে রাত্রে বাড়ী ফেরার পথে আনিস দেখা করতে গেল হবিবুরের সঙ্গে। হবিবুর হঠাৎ ভীষণ জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। ছটফট করছে মাথার যন্ত্রণায়। আনিসকে দেখে বলল, দেখুন, আমরা যাঁকে দাঁড় করিয়েছি তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হ'লেও আসলে যুক্ত-ফ্রন্টেরই লোক। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নির্বাচনে জিতলে যুক্ত-ফ্রন্টে যোগ দেবেন।

দেখুন. এটাকে তো ঠিক নীতি বলা চলে না।

সে আপনি যাই বলুন, অবাঙালীদের আমি সহ্য করতে পারিনে।

আনিস জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু যে-যুক্তফ্রন্ট সর্ববিষয়ে বাঙালীর নামে কথা বলছে, সেই যুক্তফ্রন্ট কিছু একটা না ভেবেই কি এই রকম নমিনেশন দিয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

হবিবুর জবাব দিল. আমার মনে হয় তারা ভুল করেছে।

কিন্তু আমার মনে হয় এ-ক্ষেত্রে তাঁরা দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

কী ক'রে?

অন্তত এই বোধটুকু তাদের লোপ পায়নি যে, বাঙালী অবাঙালী বিরোধ চরমে উঠলে বাঙালীদের স্বার্থ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না। লীগ তার সুযোগ গ্রহণ করবে।

হবিবুর জিজ্ঞাসা করল, আপনি কী তা'হলে মনে করেন না ঐ অবাঙালীদের মারফতই করাচী পূর্ববঙ্গকে পরাধীন করে রেখেছে?

আনিস জবাব দিল, আমি তার আগে প্রশ্ন করব, করাচীই কী স্বাধীন? কমনওয়েলথের মধ্যে থাকার অর্থ কি করাচীর স্বাধীনতা? আর এখন যে আমেরিকাকে ডেকে আনা হচ্ছে তাতে কি শুধু পূর্ববঙ্গ পরাধীন হবে? বরং যুক্তফ্রন্টের কোনো কোনো লোকের বিরুদ্ধে আমার সমালোচনা এই, তাঁরাও করাচীর পরাধীনতা দূর করার নামে প্রকৃত দুষমণকে লোকের সামনে তুলে ধরতে পারছেন না, সমস্ত বাঙালী-অবাঙালী যদি না চিনতে পারে যে তাদের একই দুষমণ, তা'হলে কি করে তারা এক হবে? করাচীর ডমিনেশনের কথা বলে অবাঙালীকে আপনি বাঙালীর সঙ্গে টানবেন কি ক'রে!

হবিবুর হেসে উঠল, কে আপনাকে বলল আমি টানতে চাই! দেখুন আনিস সাহেব, আপনাদের দুনিয়ার মজুর এক হও ঠিক আছে, কিন্তু এই পূর্ববঙ্গে বাঙালী-অবাঙালী মজুর কিছুতেই এক হবে না।

অসুস্থ ঐ লোকটাকে কী ক'রে আঘাত দেবে আনিস! আস্তে আস্তে সে জবাব দিল, দেখুন তারা যাতে এক না হয় সেজন্য তাদের মাথার উপর যারা আছে তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু তারাই আগে এক হবে এবং এটা জানবেন তাদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া জাতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় নেই।

এক মুহূর্ত মাথার যন্ত্রণায় চুপ করে রইল হবিবুর। নিজের অজান্তেই প্রায় আনিসের ডান হাতখানা উঠে গেল ওর কপালের উপর। টিপে দিতে লাগল আস্তে আস্তে। হবিবুর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দেখুন আনিস সাহেব, আমাদের মনের যন্ত্রণা হয়ত আপনারা ঠিক বুঝতে পারবেন না। যে কোন কারণেই হোক তরুণ বয়সের অনেকেই আমরা মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম লীগের আন্দোলনে, হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা যথেষ্টই ছিল, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করেছিলাম মুসলমান ভাই ভাই। আজ তার সমস্ত ফাঁক ধরা পড়ে গেছে। মুসলমান আজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এর ব্যথা আপনারা কি ক'রে বুঝবেন! আজ দেখছি আমরা বাঙালী, ওরা অবাঙালী। আমার ভাষাকে ঘৃণা করে ওরা, আমার ভাই তোফাজ্জল আজ ছ'মাস বেকার বসে আছে, কোনো অবাঙালী ফার্মে ওকে নেবে না, নিজেও ব্যবসা করতে গিয়ে সুবিধে করতে পারলাম না। আর নিজের দেশে বসে আত্মসম্মানটাও আমাদের আজ বিকিয়ে গেছে। অথচ দেখছি এর মধ্যে একদল বাঙালী বেশ সুখেই আছে। তাদের সাহায্য ছাড়া ওরা বাংলাদেশে রাজত্ব চালাতে পারত না। দেখুন আনিস সাহেব, আজকাল সব কিছু যেন মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে। কেবলই ভাবি যৌবনটা হৈ চৈ করে কাটালাম, কিন্তু কী পেলাম আমরা!

অশ্রু গড়িয়ে পড়ল হবিবুরের চোখ দিয়ে। আনিস বলল, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলব পরে একদিন এসে। তবে দেখবেন মানুষ একদিন এক হবেই।

হবিবুর চোখ মুছে হাসল, তাতে সান্ত্বনা কোথায় আনিস সাহেব! হয়ত আমরা মরে যাওয়ার পর অনেক কিছুই হবে। কিন্তু আজ যে বুকে লাগছে! আজ যে আমি ক্ষমা করতে পারছি নে! অথচ কেউ যদি বলে আমি অবাঙালী বিদ্বেষী, সে কথা আমি মানতে পারিনে! কেন এমন হয় বলতে পারেন?

আনিস উঠে পড়ল ধীরে ধীরে! নেমে এল রাস্তায়। ফিকে জ্যোৎস্নায় ভ'রে গেছে পৃথিবী। মায়াময় এক শান্তির প্রলেপ পড়েছে রাস্তার ধুলোয়, গাছের পাতায়, ইঁট খোয়া পাথরের উপর। হঠাৎ মনে হয় জগতের কোথাও যেন জ্বালা যন্ত্রণা নেই।

জালাল আহম্মদ খাওয়া দাওয়ার পর গেঞ্জি গায়ে রাস্তায় একটু পায়চারী করতে বেরিয়েছিলেন। আনিসকে দেখে ডাকলেন, শুনুন আনিস সাহেব।

আনিস এগিয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করল, কী বলুন!

দেখুন, তখন হাসপাতালে ভীড়ের মধ্যে আপনার সঙ্গে ভালো কথাই হতে পারল না।

বেশ তো, এখনই বলুন না কী কথা আছে আপনার।

আনিস সাহেব, কথা আমার বেশী কিছু নেই। তবে নির্বাচন সম্পর্কে আপনাদের কথাবার্তা যতটা শুনেছি তাতে আপনাদের যেন নতুন ক'রে চিনতে পারছি। আপনাদের চোখে মানুষ, মানুষই। লোকে আপনাদের গালাগালি করে কিন্তু একদিন বুঝতে পারবে।

আনিস হঠাৎ ডাক্তারের এই উচ্ছ্বাস দেখে কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল।

জালাল আহম্মদ বললেন, দেখুন, হয়ত আমাকে আপনারা ঘৃণা করেন, লোকটা ঘুষ খায়, চিকিৎসা করে না। হয়ত তার সবই সত্যি; অন্তত কিছু সত্যি। মাঝে মাঝে আমিও সে কথা ভাবি। কিন্তু কী করব বলুন। যা স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং ক'রে ফেলেছি তা নামাবো কি ক'রে! ছেলে মেয়ে তা সহ্য করবে না, বৌ তা সহ্য করবে না। হয়ত আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনাদের পক্ষে বোঝার কথাও নয়।

কিন্তু নিজে যেটা বোঝেন সেই অনুসারে কেন কাজ করেন না?

ঐ হয়েছে আমাদের বিপদ। যা ভালো বুঝি তা করতে পারিনে। আপনারা এক হিসেবে আমাদের চেয়ে সুখী। আচ্ছা শুনুন আমি আপনাদের ফান্ডে কিছু টাকা দিতে চাই, একদিন আসবেন।

আনিস একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বাঙালী ক্যান্ডিডেট দাঁড়ালে তো আপনি টাকা দিতেন না।

নিশ্চয়ই দিতাম না। কিন্তু এর পরে হয়ত তাও দেব!

আনিস যখন বাড়ী ফিরল তখন হালিমা সত্যি সত্যি রাগ ক'রে বলল, বাকী রাতটুকু বাইরে কাটিয়ে এলেই পারতে। তখনও ঠান্ডা ভাত খেয়েছ, এখনও তাই খাও!

কী করব, কাজ ছিল যে।

কাজ! তোমাদের কাজের আর শেষ হবে না কোনো দিন। জেল থেকে না বেরুলেই পারতে। ঐ মেয়েটা তখন থেকে একা একা বসে আছে।

ঘরে গিয়ে আনিস জিজ্ঞাসা করল, তুমি কিছু বলেছ নাকি আপাকে!

আমি বলব! তুমি আচ্ছা লোক যা হোক!

দেখো, আপা চান আমি তোমাকে ঘরের মধ্যে আগলে বসে থাকি চব্বিশঘণ্টা।

থাকবেই বা না কেন?

থাকলেই তুমি খুশী হও?

পরদিন নির্বাচনের কাজে গ্রামে যাওয়ার সময় মরিয়ম বলল, পারো তো মনি আর কলিকে সঙ্গে ক'রে এনো।

এই সময় ওদের নিয়ে আসতে বলছ? পারবে ওদের সামলাতে।

বাব্বা! আমাকে আবার আজ থেকে ভোটার লিস্ট নিয়ে ঘুরতে হবে বাড়ী বাড়ী। থাক, ইলেকশনটা পার হ'য়ে যাক।

সেই ভালো।

এরসাদের বাড়ী এল আনিস। বৈঠকখানায় লাল সতরঞ্জির উপর ধবধবে সাদা চাদর বিছানো। কয়েকখানা ছবি ঝুলছে দেয়ালে, তাল নারিকেল ধান ক্ষেতের দৃশ্য। কাঁচের আলমারিতে সুন্দর করে সাজানো

বইগুলি। জানলার পাশে পাতাবাহারের সারি দৃশ্যটাকে পূর্ণ ক'রে তুলেছে।

এরসাদ ঘরে ঢুকেই বলল, না আমার তো আপনার সঙ্গে যাওয়া হবে না।

কেন!

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে এরসাদ গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আক্ষেপ প্রকাশ করল, বাপ মা আমাকে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে এমন ফ্যাসাদে ফেলেছে!

হয়েছে কি খুলেই বল না।

কিন্তু আমার দুঃখ আপনি কি বুঝবেন?

দেখো এরসাদ, যত লোক দেখছি তাদের প্রত্যেকের ধারণা তার দুঃখ সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

রাগ করছেন কেন! আপনি ভাবীর মত বৌ পেয়েছেন তাই আপনার পিছু টান নেই। কিন্তু এবার জেল থেকে ফিরে আসার পর আমি তো অস্থির হয়ে গেলাম। কী মহাভুলই যে করেছি।

কিছু ভুল করনি, আস্তে আস্তে মানিয়ে নিতে হবে।

সে রকম মেয়েই নয়।

ছিঃ এরসাদ, পরের সামনে ওভাবে বলতে নেই।

আনিস ভাই, আপনাকে আগেই বলেছি, আমার দুঃখ আপনি কি ক'রে বুঝবেন।

যাক, তুমি আমার-সঙ্গে যাবে কি যাবে না বলে দাও, উঠে পড়ি, বেলা বাড়ছে।

আনিস ভাই আমাকে আপনারা রেহাই দিন, ঘরে অশান্তি সৃষ্টি ক'রে আমি বাইরে রাজনীতি করতে পারব না।

আপাততঃ বাক্যব্যয় বৃথা ভেবে আনিস উঠে পড়ল। পথের মধ্যে কেবল মনের মধ্যে ধ্বনিত হ'তে লাগল একটা কথা, ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করে বাইরে রাজনীতি করতে পারব না। যে বলছে তার ঘরে খাদ্যের অনটন নেই, তবু কেন বলে। এরসাদকে কীভাবে আবার টেনে আনা যায়। মরিয়মের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। এরসাদেরও অবশ্য

দুর্বলতা আছে, কিন্তু দুর্বলতা কার নেই।

তারপর গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে এল নতুন কথা, নতুন ঘটনা, যুক্তিতর্ক. লীগ. আমেরিকা. সোভিয়েট, কোরিয়া, নিগ্রো, জমিদার, বৃটিশ, যুদ্ধ, শান্তি. ধর্ম, স্বাধীনতা, ভারত, কাশ্মীর। কয়েকদিন পর আনিস যখন ময়লা জামাকাপড় উস্কোখুস্কো চুল, একগাল দাড়ি নিয়ে ফিরে এল তখন মরিয়ম বাড়ী ছিল না। রাত গোটা এগারোর সময় ইব্রাহিম পেঁছে দিয়ে গেল মরিয়মকে।

হালিমা তেড়ে গেল, এমন মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি, একেবারে পুরুষের বাবা!

মরিয়ম হালিমার কথায় কান না দিয়ে আনিসকে জিজ্ঞাসা করল. ভোটের কী খবর?

অবাঙালীর জন্য গ্রামের ভোট বিশেষ পাওয়া যাবে না!

কিন্তু মার্কিন সাহায্য সম্পর্কে লোক কী বলছে?

আনিস হেসে জবাব দিল, বুঝিয়ে দিলে লোক বোঝে। দু'এক জায়গায় শুনলাম নিজেরাই বলছে, আমেরিকার সাহায্যের এত গরজ কিসের, বিনালাভে কেউ তুলোর বোঝা বয়?

মরিয়ম হেসে উঠল, বাঃ চমৎকার!

হালিমা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এই বিচিত্র আলাপ শুনে খানিকক্ষণ থ' মেরে থেকে বলল, এমন জিনিস আমি জন্মকালে দেখিনি। কী রকম মানুষ যে তোরা।

হালিমার কথার অর্থ বোধগম্য না হওয়ায় আনিস এবং মরিয়ম দুই-জনেই তার দিকে ফিরে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। হালিমা ত্রস্ত পদে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

নির্বাচনের অভাবনীয় তোলপাড় কাণ্ডের কয়েক সপ্তাহ পরে সাবু এসে একদিন খবর দিল, আপনাদের দু'জনকে মা এক্ষুনি যেতে বলেছে।

মরিয়ম জিজ্ঞাসা করল, কেন?

সাবু মুখ ব্যাজার করে উত্তর দিল, গিয়েই দেখতে পাবেন।

আচ্ছা চল, বলে মরিয়ম আনিসকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মরিয়মকে দেখা মাত্র মাজেদা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

দিশাহারা হয়ে মরিয়ম প্রশ্ন করল, কিন্তু কী হয়েছে আপা! একী বিছানা পত্র সব বাঁধা কেন।

আমরা এখান থেকে চললাম মরিয়ম।

চললাম! তার মানে? কোথায় চললাম?

আদ্রায়।

কিন্তু কেন?

আচ্ছা, মরিয়ম চন্দ্রঘোনা কোথায়?

আনিস এসে দাঁড়িয়েছিল, সে জবাব দিল, চট্টগ্রামে।

মরিয়ম, তোমরা বোধ হয় জান না আমার দু'ভাই সেখানে চাকরী করত, একজন মারা গেছে রায়টে।

কিছুক্ষণ মুখে কথা সরল না কারো।

সাবু রাগ ক'রে বলল, ছোট মামা এসেই যত গণ্ডগোল বাধিয়েছে। মাকে ফুসলে এই কাণ্ড করেছে। যার খুশী সে বাপের ভিটেয় ফিরুক। আমি যাব না।

আছিয়া বলে উঠল, না যাবে তো তুমি মর। ছোট মামা কোনো রকমে জান নিয়ে এসেছে। আমরা আমাদের দেশে যাব।

মরিয়ম বাধা দিল, আছিয়া, এটা তেমাদেরও দেশ।

আমাদের দেশ না ছাই, এটা বাঙালীদের দেশ।

মাজেদা বলল, যাদের চাকরী আর ব্যবসা আছে তারাই কেবল যেতে পারছে না। নইলে অনেকেই তো চলে যেতে চায়।

ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল।

আছিয়া বলে উঠল, ঐ আসছে।

মরিয়ম এবং আনিস শেষ মুহূর্তে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ফল হ'ল না।

মাজেদা বলল, মরিয়ম, তোমাদের এই বাসাটা দিয়ে যেতে চাই। তোমাদের তো বাসা নেই। তোমরা এ বাসা নিলে এমন কেউ নেই যে,

তোমাদের উঠিয়ে দিতে পারে।

আনিস বলল, বাসায় আমাদের দরকার নেই, আপনারা থাকুন।

মাজেদা একটু হাসল, বেশ পারি তো আমরা আবার ক'মাস পরে ফিরে আসব। এই সর্তেই সাবু যেতে রাজী হয়েছে।

সাবু কিন্তু বেঁকে বসল, না আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।

শেষ পর্যন্ত যেতে হল সবাইকে। মাজেদা যাওয়ার আগে বলে গেল, মরিয়ম, কী-ই বা আমার ঘরে আছে, চৌকি দু'টো আর আলনাটা তোমরা ব্যবহার ক'রো। তোমাদের দিয়ে গেলাম। হ্যারিকেন লণ্ঠনটাও রইল। তোমরা আমার জন্য অনেক কিছু করেছ সে ঋণ আমি শোধ দিতে পারব না।

সত্যি সত্যি যখন ঘোড়ার গাড়ীটা ওদের নিয়ে মিলিয়ে গেল, তখন খালি চৌকিটার উপর বসে পড়ে মরিয়ম বলল, আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

স্তব্ধ আনিসের চোখ দু'টো শুধু ঘুরতে লাগল ঘরময়। কিছু ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে মেঝের উপর। দেয়ালে পেরেক পোঁতার দাগ। আলনার একটা দিক ভাঙ্গা। মাকড়সার জাল জমে রয়েছে ছাদের এক পাশে। আছিয়ার ভাঙ্গা শ্লেটটার আধখানা পড়ে আছে চৌকির পায়ার কাছে। একটা জুতোর পুরানো বাক্স সযত্নে তোলা রয়েছে তাকের উপর, তারই পাশে একগাদা ওষুধের খালি শিশি।

গোলাম মওলা কাঞ্চনকে সঙ্গে ক'রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আমি আসার আগেই এরা চলে গেল। খবর শুনেই ছুটে আসছি।

মরিয়ম বলল, আপনি দুঃখ করবেন না, ওদের এখন আপনি রাখতে পারতেন না। আমাকেই ওরা খবর দিয়েছে শেষ মুহূর্তে।

গোলাম মওলা চুপ করে রইলেন, তারপর হাতের কাগজখানা মেলে ধরলেন, এই দেখ আনিস! আমাদের উজিরে-আজম কী ফতোয়া দিয়েছেন দেখ। নারায়ণগঞ্জের বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গার জন্য নাকি দায়ী কমিউনিস্টরা।

আনিস পরিত্যক্ত ঘরখানার মধ্যে আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে দিয়ে

হেসে উঠল, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।

গোলাম মওলা বললেন, আমাদের ওরা খুব বেশী সময় দেবে বলে মনে হয় না। হয়ত প্রকাশ্য কাজের সুযোগ আগামী ছ'মাসের বেশী আমরা পাব না। এমন কি এখন তাতেও ঘোরতর সন্দেহ আছে। কাজেই আমাদের বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই!

মরিয়মের ক্লান্ত কণ্ঠ দিয়ে বেরুল, কিন্তু বিশ্রাম তো আমরা নিইনি।

২৪

শহর ও গ্রামের কর্মীদের এক পরামর্শ সভা ডাকা হয়েছিল তমিজ বিশ্বাসের বাড়ীতে।

বেগুন ক্ষেতে বেগুন তুলতে তুলতে তমিজ বিশ্বাস মণির বেণীতে টান মেরে প্রশ্ন করল, বলতো নাতনি আজ কে আসবে!

নাতনি বেশ গম্ভীর মুখে জবাব দিল, তোমার যম!

তমিজ বিশ্বাস নাতনির গাল টিপে বলল, না তোমার বর।

নাতনি তখন বেণী দুলিয়ে কিল উঁচিয়ে ভয় দেখাল, তোমাকে মারব কিন্তু। আমি বুঝি জানিনে কে আসবে? বা'জান আসবে, মা আসবে।

কি ক'রে জানলি।

তা বলব কেন। এবার এলে মাকে কিন্তু যেতে দেব না।

রাহেলা ডাকল, মণি শুনে যা।

মণি এগিয়ে গেলে তার কাঁধের উপর একগাদা ভিজে চাদর বালিশের ওয়াড় চাপিয়ে রাহেলা বলল, যাও তো মা, ঐ বেড়ার উপর মেলে দাও।

তমিজ বিশ্বাস মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আজ যে এত সব কাচা-কাচি হচ্ছে?

রাহেলা ঘর্মাক্ত মুখটা আঁচলে মুছে বলল, বাঃ আজ রাত্রে লোকজন থাকবে না! আমরা যে ময়লার মধ্যে থাকি তাদের সেই ময়লার মধ্যে রাখা যায়?

তমিজ বিশ্বাস খুশী হ'ল, দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, ভালো কথা

মনে পড়েছে মণি, কেরোসিন তেলের বোতল নিয়ে আয় তো, যে ভুলো মন হয়ত ভুলেই যাব, এই বেলা এনে রাখি, আজ তো আবার তেল পুড়বে অনেকখানি।

রাহেলা শ্বশুরকে নিরস্ত করল, আপনাদের ছেলে কালকেই এনে রেখেছে। কিন্তু আমি যা দেখছি, ঐ দোকান তো আর বেশীদিন নেই। যে রকম রাতদিন কৃষক সমিতি ক'রে বেড়ান হচ্ছে।

তা একটু দেশের কাজ দশের কাজ করতে হবে বৈকী বৌমা। আর যে রকম রোজ রোজ গ্রাম থেকে লোক এসে তাকে ছেঁকে ধরছে, তাতে তারই বা দোষ কী।

রাহেলা গলায় কৃত্রিম অভিমানের সুর ঢেলে দিল, আর আমরা বুঝি চিরকাল ভাতই রাঁধব।

তা'হলে তুমিও বেরিয়ে পড় মরিয়মের মত। আমি বুড়ো মানুষ একা একা বাড়ী পাহারা দিই।

দুপুরের আগেই মরিয়ম আর আনিস জ্যৈষ্ঠের রোদ মাথায় ক'রে এসে হাজির হল।

রাহেলা পাখাটা নিয়ে এসে বাতাস করতে করতে বলল, আহা, চেহারার কী বাহার হয়েছে দু'জনের।

মরিয়ম পাখাটা কেড়ে নিতে গেল, দাও ভাবী, আমাকে দাও।

রাহেলা মুচকী হেসে বলল, থাক, তোমাদের একটু বাতাস দি, তবু যদি কিছু সোওয়াব হয়, তোমরা হলে দেশকর্মী!

আনিস অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, বাঃ বাঃ, ভাবী তো খাসা কথা বলতে শিখেছ! কিন্তু ও ভাবী, দেশকর্মী তো আজকাল তোমার ঘরেই আছে। তাকে খুব ক'রে বুঝি বাতাস দিচ্ছ?

মরণ আমার!

মরিয়ম রান্নাঘরে ঢুকে জড়িয়ে ধরল মাকে। মা বলল, মরিয়ম জামাইকে একবার ডাক না, বাপের চেহারাখানা কী রকম হয়েছে দেখি

একবার!

আনিস গিয়ে সালাম করল শাশুড়ীকে।

রাহেলা মরিয়মকে পাকড়াও করল, আজ তোমার সংগে চুলোচুলি করব।

সে কী কথা!

এসই না এদিকে, দেখাচ্ছি মজা!

কুয়োর ধারে নিয়ে গিয়ে সোডা দিয়ে মরিয়মের মাথা ঘসতে বসে গেল রাহেলা। চুলে টান দিয়ে বলল, একেবারে আস্ত পেতনি!

কেন ভাবী, ভুতের বৌ পেতনি হ'তে দোষ কী!

তমিজ বিশ্বাস গাই গরুটাকে পিছনের পুকুরে গা ধোয়ানোর জন্য নিয়ে যেতে যেতে এই দৃশ্য দেখে মনে মনে মোনাজাত করল, আল্লা, ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই নাতি নাতনি রেখে আমি যেন মানে মানে যেতে পারি।

খাওয়া দাওয়ার পর এক সময় আনিস শ্বশুরকে বলল, মণি আর কলিকে নিয়ে যেতে চাই। ওদের লেখাপড়া তো কিছু হ'ল না। বজলুস সাত্তার সাহেব বলছিলেন, মাইনে টাইনে লাগবে না, আর ও'র বাড়ীতেই রাখবেন।

তমিজ বিশ্বাস অভিমানের সুরে উত্তর দিল, আমি কি তোমার ছেলে মেয়েকে বেঁধে রেখেছি! নিয়ে যাও না! ওরা কি আমাদের মত মূর্খ হয়ে থাকবে না কি।

রাগ করছেন কেন, ওরা ছুটীতে এখানে এসেই থাকবে।

রাগ করব কেন। বুড়ো বয়সে বাড়ীতে লোকজন না থাকলে মনটা খাঁ খাঁ করে, তাই! তোমাদের বয়স হলে তখন বুঝবে বাবা। মকসুদের ঐ এক ছেলে গফুর সারাদিন টো টো কোম্পানী, আর মকসুদ তো আজ-কাল বাড়ীতেই থাকে না। ওরা দু'টি আছে তাই বুড়োবুড়ি প্রায় একা বাড়ীতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

সন্ধ্যার পর যখন একে একে লোক আসতে সুরু করল তখন তমিজ বিশ্বাসই প্রয়োজন অপ্রয়োজনে ছুটাছুটী করতে লাগল সব চেয়ে বেশী। নিজের হাতে দু'টো হ্যারিকেন জেবলে নিয়ে এল, বদনা ভ'রে পানি এনে

দিল হাত পা ধুতে, তালপাখা এনে হাজির করল কয়েকখানা।

শহর থেকে এরসাদ ছাড়া প্রায় সকলেই এসেছে, গ্রাম থেকে এসেছে মকসুদের নতুন কৃষক আন্দোলনের কিছু কিছু নতুন মুখ।

নারায়ণ পাখা নাড়তে নাড়তে বলল, উঃ কী সাংঘাতিক গরম, একটু বৃষ্টি নামলে বাঁচা যায়।

ইব্রাহিম হেসে উঠল, থোরা বারিস হোনা চাইয়ে, লেকিন জিয়াদা নেই! বাংলায় বহুত দরিয়া আর পানি, হামকো ডর মালুম হোতা হ্যায়। এত পানি ভালো লাগে আপনাদের?

কাঞ্চন খোঁচা দিল তোমাকে বাবা মক্কায় পাঠিয়ে দেব, মরুভূমির মধ্যে থাকবে আর খেজুর খাবে।

মকসুদ বলল, ইব্রাহিম ভাই, পানি ভালো লাগে না, আগুন ভালো লাগে বুঝি তোমার! হাবিয়া দোজখে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য পিটিশন করব।

ইব্রাহিম মিটমিট ক'রে চেয়ে মুচকী হাসল, হ্যাঁ আগুন ভালো লাগে আমার, লেকিন পানি ভি থোড়া চাই। উপরে পানি নীচে আগুন, তব তো স্টিম বনেগা! তব তো ইঞ্জিন চলেগা।

আনিস বলল, ইঞ্জিন কভি নেহি চলেগা, ইঞ্জিন আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে ইব্রাহিম ভাই! তুমি বরং একটি গান শোনাও।

ইব্রাহিম দমবার পাত্র নয়, প্রতিবাদ করল, দিলমে আগ, আঁখমে আঁশু তব তো গানা হোগা!

গোলাম মওলা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আমি কি সুর কেটে দিলাম। হয়ে যাক একখানা ইব্রাহিম ভাই!

মরিয়ম কেটলী ভর্তি চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, বলল, এই যে মুরলীদা এসে গেছেন!

এই সেরেছে! কতবার বলেছি না মুরলী মরে গেছে, জন্ম নিয়েছে গোলাম মওলা! আমরা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করি জানো তো!

হাসির রোল উঠল ঘরে! তমিজ বিশ্বাস এতক্ষণ আশেপাশে ঘুর-ঘুর করছিল, এবার মুখ বাড়িয়ে দিল দরজার পাশ থেকে।

আনিস তাকে ডাকল, আপনি এসে বসুন না ভিতরে!

তমিজ বিশ্বাস মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, না বাবা, আমি তোমাদের দেখছি। চাঁদের হাট বসেছে আমার বাড়ীতে!

তমিজ বিশ্বাসের দুর্ভাগ্য, তার কথা শেষ হ'তে না হতেই ঠিক রাহুর মতই একটি মুখ ভেসে উঠল দরজার সামনে! তার নাম সোনাউল্লা।

আনিস প্রায় তেড়ে গেল, আপনি এখানে এসেছেন কেন! ভালোয় ভালোয় চলে যান বলছি!

সোনাউল্লা নির্বিকার ভাবে ধীরে সুস্থে একখানা রুমাল বের ক'রে মুখের ঘাম মুছে বলল, আমরা তো কুকুরের জাত, মানুষের সমাজে আমাদের স্থান কোথায়। চাকরীর শিকলে আমরা বাঁধা। তবে আমার ছেলেও আজকাল গিয়ে জুটেছে আপনাদের দলে। মন মানে না, তাই একটা খবর দিতে এলাম। জানতাম এখানে আপনাদের পাওয়া যাবে, খবর তো কিছু কিছু আমরা পাই!

আনিস স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার বলুন তো!

এক মুহূর্ত সোনাউল্লা কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলোর উপর হাত বুলিয়ে নিল—দেখুন, বয়সও কম হ'ল না, মানুষ চিরকাল বেঁচেও থাকে না, আপনাদের এ-যাবৎ অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট কিছু করিনি। যাক, আপনারা বোধহয় জানেন না, আজ নাইনটিটু জারী হয়েছে, গবর্ণররাজ কায়েম হয়েছে। আপনাদের নামে ওয়ারেন্ট আছে। ইচ্ছে করলে স'রে থাকতে পারেন, আমাকেই তো আবার ওদের সঙ্গে আসতে হবে আপনাদের খিদমতের জন্য।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ বিরাজ করল স্তব্ধতা। তমিজ বিশ্বাসের চাঁদের হাটের এ নীরবতা ভয়ঙ্কর।

আনিসই জিজ্ঞাসা করল, কার কার নামে ওয়ারেন্ট আছে বলুন তো।

নাম বলে আর কি হবে, আপনারা কেউই বাদ যাননি।

বাইরের কার কার নাম আছে?

হবিবুর, বজলুস সাত্তার আর যোগেন গাঙ্গুলি। আচ্ছা এবার আমি যাই।

মরিয়ম কেটলী থেকে একটি বাটিতে চা ঢেলে সোনাউল্লার দিকে

বাড়িয়ে দিল, একটু চা খেয়ে যান।

উত্তপ্ত বস্তুটা কোনমতে গলায় ঢেলে বিদায় নিল সোনাউল্লা।

হ্যারিকেন দুটো তেমনি ভাবেই জ্বলছে, ঘরের দেয়ালগুলো তেমনি ভাবেই খাড়া আছে, চায়ের পেয়ালা অ্যালুমিনিয়ামের কেটলী আর তাল-পাতাগুলোর কোনো পরিবর্তন হয়নি, বাইরের রাতের আকাশও একই রকম আছে, কিন্তু সোনাউল্লার আসা ও যাওয়ার মধ্যে ঘরের মানুষ-গুলোর জীবনের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পটপরিবর্তন হয়ে গেছে ঝড়ের গতিতে। সমাজ পরিবর্তনের কাজ যারা করে পরিবর্তনের বোধও তাদের বোধহয় সব চেয়ে বেশী। মনের সামনে তাই যেমন ভেসে উঠল আগামী দিনগুলির পায়ে-চলা-পথ, পথের কাঁটা, কাঁটায় বিদ্ধ দেহ এবং মন, ঘটনার জটিলতার অস্পষ্ট ছবি, তেমনি স্মরণ হল অতীতের মাড়িয়ে আসা সেই দীর্ঘ বন্ধুর পথ। একটা যেন আর একটার পরিপূরক।

পরিবর্তিত অবস্থার ধাক্কা এসে লাগবে আন্দোলনে, সংগঠনে এবং জীবনে। মণি আর কলির লেখাপড়ার যে বন্দোবস্ত প্রায় পাকা করে এনেছিল মরিয়ম—এখন সেটা আর সে ভাবে করা যাবে না। মকসুদকে থাকতে হবে এবার বাড়ী ছাড়া হয়ে, রাহেলার জীবনে আসছে নতুন অভিজ্ঞতা। খুশীকে আনার জন্য জহুর বহু কষ্টে বাসা জোগাড় করে-ছিল, এখন সেটা হয়ে দাঁড়াল অর্থহীন। নারায়ণ ঠিক করেছিল নির্বাচনের পর এবার সুদিনে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে খোঁজ নেবে সরমার, এখন মনের ইচ্ছা হয়ত মনেই থেকে যাবে। ইব্রাহিমের হারমনিয়মটায় ধুলো জমবে, আফসরীর মনের টান সুর হয়ে বেরোবার পথ পাবে না। আজগরীর সঙ্গে ফরিদের বিয়ের প্রশ্ন এখন অবান্তর। এরসাদ যতই রাজনীতি এড়িয়ে চলুক, পুলিশ তাকে এড়িয়ে চলবে না। কাঞ্চনের পড়াশোনা হবে বন্ধ। এ অবস্থায় সাবু হয়ত আর ফিরবে না। খলিল আবার ঘুরে বেড়াবে তার ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে। আওলাদই একমাত্র জেল থেকে ছাড়া পায়নি, কবে যে ছাড়া পাবে এখন তা হিসেবের বাইরে চলে গেল।

সোনাউল্লা চলে যাওয়ার পর গোলাম মণ্ডলার মুখ দিয়েই প্রথম কথা বেরুল, আমরা ছ'মাস সময়ও পেলাম না!

মরিয়ম উঠে গেল চায়ের কেটলী আর পেয়ালাগুলো হাতে নিয়ে।

গোলাম মওলা থমথমে আবহাওয়াটা একটু হাল্কা করার জন্য বললেন, শেষে সোনাউল্লা আমাদের খবর দিয়ে গেল! আগে ছিলাম আমরা লোক থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন লীগের সেই অবস্থা! যাক আমাদের এখন কয়েকটা জিনিস চটপট ঠিক করা দরকার।

ইব্রাহিম চৌকীর উপর কিল মারল, শালা আমেরিকা!

গোলাম মওলা বললেন, শালা সুমুন্দি বলে লাভ নেই। এখন একটু কাজের কথা হয়ে যাক। আর কাঞ্চন, তুমি আগেই চলে যাও। হবিবুর আর এরসাদকে খবর দেওয়ার ভার তোমার উপর।

সে রাত্রে আলোচনার পর মানুষগুলো যখন ভাতের থালার সামনে এসে বসল তখন তমিজ বিশ্বাস বারবার বলতে লাগল, আজ আর যেন কেউ লজ্জা করে খেয়ো না বাবারা।

এমন ভাবে একসঙ্গে বসে যে বহুকাল খাওয়া হবে না, এটা অনুভব করছিল প্রত্যেকেই। কিন্তু বিলম্বিত তালে গল্পগুজব ক'রে খাওয়ার সময় ছিল না কারো। রাত বাড়ছে, নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে যেতে হবে প্রায় সকলকেই। নাকে মুখে গুঁজে উঠে পড়ল সবাই।

এমন সময় পুরো সাহেবী পোষাক পরা একটি লোককে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে সবাই বিস্মিত হল।

মরিয়ম অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, হাসমৎ!

হাসমৎ কাছে এসে বলল, খালা, স্ট্রেট স্টেশন থেকে আসছি। পাইলটের লাইসেন্স পেয়েছি জানো!

আয়, ঘরের মধ্যে আয়। তুই একেবারে শেষ সময়ে এসেছিস, আমরা তো চলে যাচ্ছিলাম এক্ষুনি!

কোথায় চলে যাচ্ছিলে?

আবার গ্রেপ্তার সুরু হবে, নাইনটী টু জারী হয়েছে যে!

তাই নাকি!...ঐ রকম কিছু একটা হবে আঁচ করছিলাম। তাই তো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই। নইলে দেশে আসার আমার ইচ্ছে ছিল না। হয়ত বহুবার আকাশ দিয়ে উড়ে যাব, তোমাদের দেখতে পাব না। তা'হলে এসে ঠিকই করেছি।

মরিয়ম একটা পাখা এনে বাতাস করতে লাগল, জামা কাপড়গুলো খুলে ফেলে ঠাণ্ডা হ', তারপর তোর কথা শুনব।

হাসমৎ হেসে জিজ্ঞাসা করল, বাঃ তোমরা সব একে একে চলে যাবে, আর আমি এখানে থাকব একলা একলা!

তুইও এখানে থাকিস নে! কাল এ বাড়ী সার্চ হ'তে পারে।

তবে কোথায় যাব?

কেন, বাপের বাড়ী যা না।

হাসমৎ বলল, খালা, আমি সেখানে মরে গেলেও যেতে পারব না। সেখানে যাওয়ার জন্য আসিওনি। সকালে উঠে আমি তার হাসি সহ্য করতে পারব না। আমি স্ট্রেট স্টেশনে ফিরে যাব।

তোর যা ইচ্ছা তাই কর, তুই এখন সাবালক।

খালা জানো, এক একবার ইচ্ছে করে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ি। অনেক সময় ভালো লাগে না।

মরিয়ম হেসে ফেলল, খবরদার, ঐ কম্মটি করো না। যেখানে যে আছ, সেখানে থাকো।

রাহেলা এসে ডাকল, হাসমৎ এসো, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে।

মরিয়ম বলল, হাসমৎ তুই খেতে যা, আমরা যাই, রাত হয়ে যাচ্ছে। আবার নিশ্চয় দেখা হবে।

নিশ্চয়ই হবে। আচ্ছা একটু দাঁড়াও খালা।

পকেট থেকে একগোছা নোট বের করে হাসমৎ বলল, খালা এগুলো রাখ, আমি জানি তোমাদের এখন এইটেই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন।

খানিক পরে মরিয়মের যাত্রার আয়োজন দেখে মণি আর কলি দু'জনেই বায়না ধরল, মা তোমার সঙ্গে যাব!

এখন না, কয়েকদিন পরে এসে নিয়ে যাব।

সে সান্ত্বনায় অন্তত কলি ভুলল না। চিৎকার ক'রে জুড়ে দিল কান্না। রাহেলা তাকে জোর ক'রে কোলে তুলে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

মণি তখন এসে মায়ের আঁচল চেপে ধরল, মা আমাকে নিয়ে চল। আমি তোমাকে কয়লা কুড়িয়ে দেব। মা আমি তোমার কাছে থাকব। সত্যি বলছি, ভালো ক'রে কয়লা কুড়োব আমি!

এই সামান্য কথায় তমিজ বিশ্বাস আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না, হঠাৎ উপরে হাত তুলে বলল, আল্লা, আমার চাঁদের হাট যারা ভেঙেগ দিল তুমি তাদের শাস্তি দিয়ো আল্লা!

ঘর থেকে কলির দুর্দান্ত কান্না ভেসে আসছে। সহ্য করতে না পেরে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়াল মরিয়ম।

মকসুদের সঙেগ কথা শেষ ক'রে আনিস এসে বলল, একটু পা চালিয়ে যেতে হবে, অনেকটা দূর।

জৈষ্ঠের রৌদ্রতপ্ত আকাশে এখন জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ঝিরঝির ক'রে। গাছের পাতা আলোছায়ার মধ্যে কাঁপছে এমন ক'রে যেন ওদের প্রাণ আছে, আর সেই প্রাণে ব্যথার কাঁপুনি আছে।

কয়েক পা এগিয়েই মরিয়ম আনিসের কনুইটা চেপে ধরে বলল, দাঁড়াও একটু। এদিকে এস!

আনিসকে মরিয়ম পথের পাশের অন্ধকার বেল গাছটার নীচে এনে দাঁড় করালো।

সামনে কিছু ছোট ছোট গাছ জড়াজড়ি করে আছে। বিনা যত্নের সাদা আকন্দ আর ধুতরো ফুল ফুটে আছে চারপাশে। একটু এগোতেই পরিষ্কার জায়গায় সযত্ন রোপিত কয়েকটা বেলফুলের গাছ চোখে পড়ে। তার উপর মেহেদীর ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। নীচের অন্ধকারে অজস্র জোনাকী জ্বলছে।

মরিয়ম মৃদুস্বরে বলল, সোনার কবর।

আনিস বিমূঢ় হয়ে নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেল আর একটু। কিছুই ভালো চোখে পড়ছে না তার। ঝাপসা হয়ে এসেছে দৃষ্টি। অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ল॥

মরিয়ম পাশে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি কেঁদ না, আমাদের কাঁদতে নেই!

আনিস আত্মসম্বরণ করে বলল, জানো মরিয়ম, আর একজনকার কথা আমার মনে পড়ছে!

কার ?

প্রসন্নদার! তাঁর কবর এখন কোন জঙ্গলের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে হয়ত কেউই জানে না। তবু যেন দেখতে পাচ্ছি নিজের সামনে।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে মরিয়ম বলল, তুমি নূর মহম্মদ ভাইকে দেখ নি। আজ তার কবরের কথাও আমার মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে বসিরের কথা। না, চল, আমি আর সহ্য করতে পারছি নে।

আনিস হাত বুলিয়ে দিল মরিয়মের পিঠে, সহ্য করতে হবে, আরো অনেক সহ্য করতে হবে অম্যাদের।

সহ্যই তো চিরকাল ক'রে আসছি। যে মাটিতে ঘুমিয়ে আছে আমার সোনা, প্রসন্নদা, নূর মহম্মদ ভাই, আর বসির, সেই মাটি আমাদের না, সেই দেশে আজ আমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি চোরের মত। আর আমাদের সেই দেশকে ওরা বিক্রি ক'রে দিল আমেরিকার কাছে। আমরা হলাম নিজের দেশে পরবাসী। ঘর ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে, ছেলে ছেড়ে, মেয়ে ছেড়ে তবে আমরা ঘুরছি কার জন্য, কিসের জন্য!

জল ঝরতে লাগল মরিয়মের চোখে।

আনিস কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, আমাদের শক্ত থাকতে হবে মরিয়ম।

তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি সব পারব।

কিন্তু আবার যদি হারিয়ে যাই ?

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মরিয়ম বলল, সে কথা কোনোদিনই তুমি আমার মুখ দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে পারবে না।

রাস্তার পাশ থেকে হাসমতের গলা শোনা গেল, ওখানে কারা কথা বলছে!

আমরা!

হাসমত এসে পাশে দাঁড়ালো, খালা, কী এখানে ?

সোনার কবর।

কিছুক্ষণের জন্য হাসমতের মুখে কথা ফুটল না।

নিজেকে সামলে নিয়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে হাসমত বলল, আমি যেখানেই যাই, যে কাজই করি, মুহূর্তের তরেও তোমাদের কথা ভুলব না!

যেখানেই পারি লোককে বলব তোমরা আছ।

হ্যাঁ, তাই মানুষকে বলো, আমরা আছি। কেউ আমাদের মুছে দিতে পারবে না। দুনিয়ার মানুষ না দেখেও নিশ্চয়ই আমাদের দেখছে। তারা আমাদের ভুলবে না। তারা আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। আমাদের ছেলে মরবে, সংগী মরবে, ভাই মরবে, কিন্তু আমরা আছি।